অর্ঘ্য

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত।

তৃতীয় কল্প।

[আশ্বিন, ১৩১৯ হইতে ভাদ্র, ১৩২০]

মূল্য ১৲ একটাকা।

বর্ষ-সূচী ।

[অর্ঘ্য, ৩য় কল্প, আশ্বিন, ১৩১৯ হইতে ভাদ্র, ১৩২০]

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য।

যখন এদেশে ইংরেজের রাজ্য হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতার স্বাদ বাঙ্গালী পায় নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার সার্থকতা ধর্ম্মপ্রচারে ও রসবিন্যাসেই পর্য্যাপ্ত হইত। রমাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল' পর্য্যন্ত পুরাতন বাঙ্গালায় যতগুলি কাব্য, মহাকাব্য বা খণ্ডকাব্য রচিত হইয়াছিল, সে সকল ধর্ম্মবিশেষের প্রচার বা দেবতাবিশেষের পূজা-প্রচলনের জন্যই হইয়াছিল। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, পুস্তক-প্রচারের পদ্ধতি ছিল না, তাই এই সকল কাব্যপুস্তক পাঁচালির আকারে গীত হইয়া সমাজে প্রচারিত হইত। সজীব সমাজ সেই সকল কাব্য-গাথা গ্রহণ করিতেন এবং উহার ভাষা প্রচলিত রাখিতেন। বৈষ্ণব কবিদিগের গান, তান্ত্রিকদিগের চণ্ডীর গান, কাব্য-গাথা লোকের মুখে মুখে বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত অবধি প্রচারিত হইত। সেকালের বাঙ্গালী কবিগণ বাঙ্গালীর রুচি ও গ্রাহিকা-শক্তির ওজন বুঝিয়া কাব্য-পাঁচালী প্রণয়ন করিতেন। লোকশিক্ষার জন্য যাহা লিখিত হইত, তাহা লোকশিক্ষার কার্য্যে পর্য্যাপ্ত ছিল। এই হেতু সেকালের কবি বাঙ্গালীর ধাতু ছাড়া কিছু লিখিতে পারিতেন না। রমাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণে" বৌদ্ধমতপ্রচারের চেষ্টা ছিল বলিয়াই এবং সে বৌদ্ধমত সমাজের রুচিবিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই উহাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া "ধর্ম্মমঙ্গলে" পরিণত করিতে হইয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গল', ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' 'শূন্য পুরাণের' ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' রাঢ়ের বাঙ্গলীর রুচির অনুকূল হওয়াতে রাঢ়ে এখনও উহার পাঁচালী গান হইয়া থাকে। আমাদের পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য এই হেতু ধর্ম্মপ্রচারের ও সমাজ-সংস্কারেব সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য দ্বারা সমাজের সজীবতা রক্ষিত হইয়াছিল; সে সাহিত্য দ্বারা সমাজের ভাবপুষ্টি ঘটিয়াছিল। এখনও বাঙ্গালী সেই সাহিত্য দ্বারা মুগ্ধ, এখনও সেই সাহিত্যের এক একটা উক্তি বাঙ্গালীকে নূতন ভাবে স্পন্দিত করিয়া

ভুলে। এখনও রামপ্রসাদের গান, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কীর্ত্তন বাঙ্গালীকে মাতাইয়া-মজাইয়া রাখিয়াছে। কেন না, এই সাহিত্যের ভাব বাঙ্গালীর মেদমজ্জার সহিত মিশ্রিত; বাঙ্গালীর রুচি প্রবৃত্তি-নির্দ্ধারণে সমর্থ।

আর আধুনিক ইংরেজী সভ্যতা-জনিত ইংরেজী শিক্ষাজাত বাঙ্গালা সাহিত্য অনুচিকীর্ষার সাহিত্য, প্রতিযোগিতার সাহিত্য মাত্র। উহার সহিত বাঙ্গালীর প্রকৃতির তেমন সম্বন্ধ নাই; উহার ভাষা ও ভাব বাঙ্গালীর সমাজে তেমন প্রচলিত নহে। উহা ইংরেজের সহিত পাল্লা দিবার মানসে রচিত হইয়াছে; উহা ইংরেজী এবং ইউরোপীয় ভাবকে বাঙ্গলাদেশে আনিবার পয়ঃপ্রণালী মাত্র। তাই ইংরেজী শিক্ষিত সমাজেই উহার একটু-আধটু প্রচার আছে, বিশাল বাঙ্গালী-সমাজ উহার পরিচয় রাখে না। সেইজন্য রহস্য-রসিক ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের কুন্তরাশি, উহা রমণী-কক্ষেই শোভা পায়। ইংরেজী শিখিয়া আমরা পেট্রিয়টিজমের মর্ম্ম বুঝিয়াছি। আমাদের দেশে দেশগত জাতীয়তা ছিল না; জাতি-গত জাতীয়তা চিরকালই প্রচলিত ছিল। ইংরেজের কাছে আমরা দেশ-গত জাতীয়তা বা Feeling of territorial ownness শিখিয়াছি। হিন্দুর দৃষ্টিতে সিন্ধুনদের তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষ চাতুর্ব্বণ্যের দেশ ছিল। মুসলমানদের সময়েও বাঙ্গালী বেহারী পাঞ্জাবী বিচার ছিল না। মুসলমানদের কাগজপত্রে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার হিন্দু বলিত। ইংরেজের শিক্ষার বলেই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের সম্বন্ধ হইতে চ্যুত হয় এবং নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে পেট্রিয়টিজমের স্বাদ আমরা পাই এবং সেই পেট্রিয়টিজমের প্ররোচনায় মনে হয়, ইংরেজদের সেক্সপীয়র মিল্টন আছে, আমাদের নাই কেন? এই কথাটা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া যান। সেই উদ্বোধনের ফলে মাইকেল বাঙ্গালার মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্র স্যর ওয়াল্টার স্কট, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ সেলীর আসন অধিকার করিয়াছেন। এই সকল ইংরেজ কবিকে আদর্শ করিয়া ইঁহারা ইংরেজী ভাবে,

ইংরেজী ছাঁদে, কাব্য ও উপন্যাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাই, ইঁহাদের কাব্য-সুধার আস্বাদ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে পারে, সাধারণ বাঙ্গালী এখনও সেই রসে বঞ্চিত। কারণ সাধারণ বাঙ্গালীর ত সে অভাব-বোধ নাই। তাহাদের কাব্য-তৃষ্ণা চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র মিটাইয়া দিয়াছেন। তাই তাহারা এখনও বৈষ্ণব পদাবলী গীত করিয়া তৃপ্তিবোধ করে, কাশীদাস কৃত্তিবাস পাঠ করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করে। তাই তাহারা মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' পড়ে না, 'ব্রজাঙ্গনা' স্পর্শ করে না, 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্রে'র পরিচয়ও রাখে না, 'বৃত্রসংহারে'র খবরও জানে না। যদি কখনও বাঙ্গলা দেশটার ষোল আনা ইংরেজী ভাবে গড়িয়া উঠে, ইংরেজী শিক্ষায় পটু হয়, তবে তখন এই সকল কবি বাঙ্গালী জাতির কবি হইবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের দেবতা হইবে।

একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-প্রচারিত বাঙ্গালা ভাষা কাহার ভাষা ? এ ভাষা বিচারালয়ে চলে না, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর কাছে চলে না, গৃহপ্রাঙ্গণে নারীসমাজে চলে না, এমন কি ইংরেজীনবীশ বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও চলে না। এ ভাষার প্রচলন মাসিক পত্রে, কতকটা সাপ্তাহিক ও দৈনিক সমাচারপত্রে এবং পুস্তক-পুস্তিকাতে আছে। তাহাও ঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা নহে; স্বেচ্ছাচারের ভাষা। এ ভাষার ব্যাকরণ নাই, অলঙ্কার-বিন্যাসপদ্ধতি নাই, শব্দের বিনিয়োগ ও দ্যোতনার নির্দ্দেশ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র যে ব্যাকরণের অধীন-হইয়া বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে ব্যাকরণের অনেকাংশ অবহেলা করিয়া ছাড়িয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আবার যে বিধি-নিষেধ মানিয়া বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে বিধি-নিষেধকে আদৌ গ্রাহ্য করেন না। আর যাহারা ইংরেজী শেখে না, সংস্কৃত জানে না, বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের সহিত পরিচয় রাখে না, বাঙ্গালী সমাজ এবং বাঙ্গালীত্বের মর্ম্ম বুঝে না, সেই সব হারাণে-পরাণে লেখক 'যাচ্ছে-তাই' গদ্য রচনা করিয়া বহি ছাপাইতেছে, তাহা আবার ছাত্র-গণের পাঠ্যরূপেও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর

কলম চালাও দেখি কেহ—কাহার কেমন সাধ্য? রামপ্রসাদের গানের একটি শব্দ বদ্‌লান যায় না; ভারতচন্দ্রের কবিতায় যেখানে কেহ কলমবাজি করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই ধরা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহে'র গীতে যেসকল মহাজন-পদাবলীকে আধুনিক ভাষার ছাঁচে ঢালিয়াছেন, সেইখানেই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সে যে সজীব জাতির সজীব সমাজের ভাষা! সে ভাষার প্রত্যেক শব্দের দ্যোতনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সে ভাষার প্রত্যেক বাক্যই সমাজের সকল বুঝে, এবং তাহার রসাস্বাদ করে। আর তোমার আধুনিক ইংরেজী-নবীশের বাঙ্গালা ভাষা, যেন পূজোবাড়ীর মাখা ময়দা! যে পারে সেই ঠাসিতেছে, ঘাঁটিতেছে, ছিঁড়িতেছে, ছড়াইতেছে। যেন ভাষাকে লইয়া গোটাকয়েক অশান্ত দুরন্ত বালক বন্দুকক্রীড়া করিতেছে। লা-ওয়ারিশ সামগ্রীর ভাগ্যে যাহা ঘটে, ইংরেজী-নবীশের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতেছে। সমাজে সাহিত্য চাহে না, তাই এ ভাষার প্রতি দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার দেখিয়াও রুষ্ট হয় না।

তোমাদের ইংরেজী-নবীশের এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য টেকসহিও নহে। যে রঙ্গলালের কবিতা একদিন শিক্ষিত সমাজের মুখে মুখে চলিত, সে রঙ্গলাল আজ বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন। স্বয়ং মাইকেল কেবল সাজাইবার সামগ্রী হইয়াছেন, পঠন-পাঠন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ীভূত নহেন। যে নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'র এক একটা কবিতা আমাদের মুখে মুখে ঘুরিত, 'পলাশী যুদ্ধে'র এক একটা শ্লোক আমাদের কথায় কথায় বাহির হইত, সেই নবীনচন্দ্র এখন নামমাত্র বাঙ্গালীর স্মৃতিতে জাগিয়া আছে। তালপুকুর নাম আছে বটে, কিন্তু তালীবন নাই! এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সাড়ে পোনর আনা কবিতা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। বরং গিরিশচন্দ্রের অনেক গান সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, অন্যের ভাগ্যে এ সুখটুকু হয় না। এমন কি, স্বদেশী হুজুগের সময় রবীন্দ্রনাথ-রজনীকান্তের গান যতটা না প্রচলিত হইয়াছিল, মুকুন্দের গান তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কাব্যাংশে মুকুন্দকে রবীন্দ্রনাথ বা রজনীকান্তের সহিত তুলনা করা চলে না, কিন্তু

মুকুন্দ যে বাঙ্গালী; সে যে বাঙ্গলায় গান রচনা করিয়াছিল। তেমনই মতি রায় বাঙ্গালী, তাই তাহার রচিত গান এখনও বাঙ্গালীর মুখে মুখে ঘুরিতেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের খাসা খাসা গান ধূলায় লুটিতেছে, উপেক্ষায় অবহেলায় বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। যতদিন পার, উপহার দিয়া সস্তায় বেচিয়া তোমাদের এই ইংরেজী মসলায় গড়া, বাঙ্গালা সাহিত্যকে রক্ষা কর। কিন্তু ইহার মধ্যে যতটুকু ইউরোপের উৎকটতা আছে, ততটুকু কিছুতেই টিকিবে না, কিছুতেই থাকিবে না। যে কথাটা খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাই রহিয়া যাইবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারত পুরাতন বটতলা হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন বটতলা 'বঙ্গবাসী' 'বসুমতী'র উপহার-বিভাগে লক্ষ লক্ষ ছাপা হইল, লক্ষ লক্ষ বিকাইয়া গেল। উহার কাট্‌তির শেষ নাই। এমন কি ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্র সরকার এমন রামায়ণ-মহাভারতের সভ্য 'এডিসন' বাহির করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিয়া খাইতেছে। কিন্তু এইভাবে তোমরা মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ও রবীন্দ্রনাথকে চালাইতে পার কি? ভাগ্যে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের পুস্তক লিখিয়াছিলেন, নিভাঁজ আদিরসেরও পুঁথি গাঁথিয়া গিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পুস্তকের একটু আদর আছে। কিন্তু সে আদরের একটু সীমা আছে। 'বসুমতী'র উপহারের পর এখন আর বঙ্কিমচন্দ্রকে চালান যায়? আমরা ত জানি, বঙ্কিমের বহির আর তেমন কাট্‌তি নাই। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের কাট্‌তির শেষ নাই। উহা ছাপিলেই বিকাইয়া যায়। বৈষ্ণব-পদাবলী ও পদকল্পতরুর কল্যাণে বটতলার শত শত ছাপা খানাওয়ালা অন্ন করিয়া খাইতেছে। মাইকেলের যেসকল বহির কপিরাইট গিয়াছে, তাহা কি বটতলায় এমন ছাপা হয়? না,—কেহ সাহস করিয়া ছাপে?

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন বলিয়া যাঁহাদের মনে শ্লাঘাবোধ আছে, তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলি বলিলাম। তাঁহারা যে এখনও বাঙ্গালীকে চেনেন নাই, বাঙ্গালীর প্রকৃতির পরিচয় রাখেন না, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য এই অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। যে বিস্মৃতির

বন্যায় বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, এমন কি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছেন, সে বিস্মৃতির বন্যাকে রোধ করিয়া জাতিকে সজীব করিবার উদ্দেশ্যে এমন কোন্ সাহিত্যের বাঁধ রচিতে পার, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? নগদ বিদায়ের হিসাবে, শিষ্য-সংঘের স্তুতি-গীতিতে সাহিত্য-সম্রাট সাজিয়া স্পর্দ্ধার কল্পনায় উচ্চ আসন গড়িয়া উচ্চ স্থানে আপাততঃ বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু সে ত অঙ্গদের সিংহাসনের মত;—তোমাদের দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া পচিয়া যাইবে। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই আমি এই সন্দর্ভটি লিখিলাম। কবি ত নগদ বিদায় চাহে না; কবির নগদ-বিদায় নাই-ও। যাহার কাব্যে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, সে ত স্মৃতির নিত্য মন্দিরে দেবতার আসন পাইয়া থাকে। কাব্য আড়াআড়ির হিসাবে হয় না। আমাদের সাহিত্যে মিল্টন নাই বলিয়া মিল্টনের ছাঁচে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করিলে তাহা টিকে কি? মাইকেলের সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অমিত্রাক্ষরের ছড়াছড়ি হইয়াছিল, তাহার কয়টা টিকিল? 'হেক্টার বধ' কাব্য, 'হেলেনা' কাব্য, 'ত্রিদিব বিজয়' কাব্য এসব কাব্যের কথা, আজ-কালকার বাঙ্গালী কেহ জানেন কি? 'বৃত্র-সংহার' আজ-কালকার ছোক্‌রা-দের মধ্যে কয়জন বিদ্যার্থীতে পাঠ করিয়াছে? ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, তোমরা যাহা যোগাইতেছ সমাজ তাহা চাহে না। কাতুকুতু দিয়া সমাজকে সজীব করিতে পার, কিন্তু সে সজীবতা ক্ষণস্থায়ী। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর বিদ্যুৎ-বিকাশ এখন আর কাহারও ভাল লাগে কি? কাজেই বলিতে হয়, তোমরা যাহা যোগাইতেছ, সমাজ তাহা চাহে না। কেন না, তোমরা সমাজের দিক চাহিয়া, সমাজের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিয়া এবং বুঝিয়া মাল সরবরাহ করিতেছ না; তাই তোমাদের মাল পোকায় কাটি-তেছে, মনুষ্যত্বের উন্মেষের পক্ষে তিলমাত্র সাহায্য করিতেছে না। আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া এই কয়টি কথা অর্ঘ্যস্বরূপ তোমাদিগকে দিলাম, তোমরা রাগ-রোষ পরিহার করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবে কি?

শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাত রাজার ধন মাণিক। *

১

ফুলের আদর, চাঁদের আদর, কবিতা নয়—বাতিক।
বাতিল তাহা, বাতিল তাহা, ওরে আমার মাণিক।
তাহার আদর, পাখীর আদর, কেবলি বাড়াবাড়ি ;
মণির আদর, সোনার আদর, কেবলিই ভাঁড়াভাঁড়ি ;
মতির জেল্লা, উষার হাসি, তোর উপমায় বেঠিক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

২

আয় কাটাই দিন তোর সাথেতে বুকভরা আলাপে ;
যেমন, কাটায় দিন মধুকর ফুট্‌ফুটে গোলাপে ;
যেমন, ফাগুনে কোকিল মাতোয়ারা আমের মুকুলেতে,
যেমন, দক্ষিণে অনিল পাগলপারা মলয় পাহাড়েতে ;
সেই গৌরব, সেই সৌরভ, তোর তুলনার বেঠিক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

৩

আয় রে চাঁদ, সোনার বরণ, হরশিরের মৌলি,
আয় রে লাল পারিজাত, দেবের বীরবৌলি,
দেবেন্দ্রের নন্দনের ডাক রে হীরামন,
নব বর্ষায় বৃন্দাবনে নাচ রে ময়ূর নাচন !
রে সুন্দর, সব উপমা তোর তুলনায় অলীক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

৪

তুই রে আমার রতনচূড়, তুই রে শচীর কাঁকন,
কোন্ রমণীর অঙ্গে আছে, এমন মোহন বাঁধন ;
ভোর বেলাতে দেবতার তুই রে সুখ-স্বপন ;
ফুলোৎসবে রতি-চরণে রুণু রুণু রুণু বাদন ;

---

* আমার নাতি নয় মাসের শিশু—অরুণেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল।

সে সব নাচন, সে সব বাজন, তোর উপমায় বেঠিক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

৫

যেমন, বধূ এলে এয়োর দলে উলু উলু উলু ডাক,
যেমন, দুর্গা এলে পূজোবাড়ীতে ঘন ঘন বাজে শাঁক,
তোর দরশে, তোর পরশে, কি আনন্দ-ধ্বনি ;
আমার প্রাণের রঙ্গমহলে একি রণ্‌রণি,
এ সব জাঁক, এ সব ডাক, তোর উপমায় অলীক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

৬

যেমন, পুকুরপাড়ে, চাঁপার আড়ে 'বউ কথা কও' ডাকে,
ডাক্ রে ডাক মজার পাখী প্রাণের হরিৎ শাখে ;
যেমন, সবুজ লাল, সুনীল মাছ নাচে জলের টবে,
আমার প্রাণ সরসে হরষে ভেসে নাচ রে মহোৎসবে,
এ সব ডাক, এ সব নাচ তোর তুলনায় বেঠিক,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

৭

যেমন, প্রভাতকালে জলধি-তীরে নবীন রবির ঘটা,
যেমন, সিদ্ধিকালে যোগীর ধ্যানে বাল-গোপালের ছটা,
লয়ে গরিমা, লয়ে মহিমা আয় রে সোনার চাঁদ,
তোর দরশে, তোর পরশে ঘুচুক মায়ার বাঁধ !
মহাসত্য উঠুক হিয়ায়, ডুবুক তাহে অলীক,
ঠিক হ'য়ে যাক্ বেঠিক যত, ঠিক হ'য়ে যাক্ বেঠিক্,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্কিম-কথা।

"দুর্গেশ-নন্দিনী" আসিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য কেহ ঠিক প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং সমালোচকসমাজে এই নবীন অতিথির আদর-আপ্যায়ন বড় বেশী হয় নাই।

বাঙ্গলা ভাষা তখন পণ্ডিতের ক্রীড়াকন্দুক ছিল। সাগরের গুরু-গর্জ্জনে সকলের শ্রবণ তখন অভ্যস্ত, অতএব তটিনীর কলরাগিণী লোকের ভাল লাগে নাই। তরল ও সরল ভাষা তখন কেহ চাহিত না—সকলেরই রুচি শব্দচ্ছটার দিকে। একটি গল্প হইতে তখনকার সাহিত্যের অবস্থা কতকটা বোঝা যায়।

একবার এক পণ্ডিতসমাজে কোন ব্যক্তির একটি রচনা পড়া হয়। রচনাটিতে ভাষার তৎকালিক 'ফ্যাসান্'—অর্থাৎ বাক্যাড়ম্বর কিছু কম ছিল। কাজেই তাহার রচনাভঙ্গী কাহারও মনঃপূত হইল না। এমন কি একজন প্রকাশ্যভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আরে একি! এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা হয়েছে!"

বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক লিখিতেন। সুতরাং তাঁহার ভাষা কিছু সরল ছিল। সুজনেরা সেটা পছন্দ করিতেন না।

বঙ্কিমের ভাষা আরও সরল—তাই প্রথমটা অধিকতর অনাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু "দুর্গেশ নন্দিনী"র গল্পাংশ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যে সকল আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহাদের আখ্যানভাগ একান্ত অকিঞ্চিৎকর—তাহা উদ্ভট ও ঠাকুরমার রূপকথার মত। ঘটনার বৈচিত্র্যহেতু চিত্তোত্তেজনা তদ্দারা খুব সামান্যই হইত। "হুতোম পাঁচা" বা "আলালের ঘরের দুলাল" খাঁটি রসিকের চিত্তক্ষুধা মিটাইতে পারিত না। অতএব লোকে "দুর্গেশ নন্দিনী"র ভাষা পছন্দ না করুক—তাহার আখ্যানাংশকে অবহেলা করিতে পারে নাই।

এখানে এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। কিন্তু তাহার আগে আর দুটি কথা

বলা চাই। শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "দুর্গেশনন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি (বঙ্কিম) তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন। * * * জানি না কেন দুই বৎসর পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র * অচিরে "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ করিলেন।"

অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, শচীশবাবুর একটি কথাও ঠিক নয়। "দুর্গেশনন্দিনী" যখন প্রথম পড়া হয়, তখন সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, একজন ছাড়া তাঁহাদের আর সকলেই এখন পরলোকে। আমি বাঙ্গলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের প্রথম শ্রোতার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই লিখিতেছি।

"দুর্গেশনন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন প্রথম পাঠ করেন, সে দিন সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র এবং তিন চারিজন পণ্ডিতগোছের ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ কখনও সাহিত্যালোচনার ভিতরে থাকিতেন না—সেদিনও ছিলেন না।

সকালে পাঠারম্ভ হইয়াছিল,—পড়িতে পড়িতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু শ্রোতারা তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন "আহা কি অদ্ভুত বক্তৃতাই হচ্ছে!" যাহা হউক, তখনকার মত পাঠ বন্ধ হইয়া আহারাদির পরে আবার আরম্ভ হইল।

বইখানি সমাপ্ত হইলে সকলেই চমৎকৃত হইলেন; পরন্তু কেহই তাহা "প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন" না।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য একজন রসগ্রাহী লোক ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার সমালোচনশক্তিও ছিল। কিছুদিন পরে এই ক্ষেত্রনাথবাবু, বঙ্কিমচন্দ্র যে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলেন। শুনিয়া, পড়িতে চাহিলেন। পড়িয়া, আনন্দিত হইলেন এবং বইখানি বাজারে বাহির

করিতে বলিলেন। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন, "আগে কিছুদিন ফেলিয়া রাখি, তার পরে প্রকাশ করিব।"

দুই বৎসর পরে সংশোধিত হইয়া "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হইল।

এইখানে একটি হাসির গল্প বলিব। "দুর্গেশ-নন্দিনী" বাহির হইবার পরে, কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের সাধ হইল, তিনিও একখানি বই লিখিবেন। অতএব, লুকাইয়া বই লেখা চলিল। রচনা-কার্য্য যখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন লেখকের ইচ্ছা হইল,—বইখানি কাহাকেও পড়িয়া শুনান। এখন, কাহাকে শুনান? মেজ দাদাকে (সঞ্জীবচন্দ্র) শুনান হইবে না—তিনি যদি নিরুৎসাহ করেন! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখেই বই পড়া হইবে।

ইতিমধ্যে একদিন নাটককার দীনবন্ধুবাবু আসিয়া হাজির। পূর্ণচন্দ্র বইখানির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পকেটে করিয়া গিয়া দেখেন, দীনবন্ধুবাবু একদিকে বসিয়া আছেন—অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র হারমোনিয়ামে "তিলকামোদ" রাগিণী বাজাইতেছেন।

পূর্ণচন্দ্র লজ্জিতভাবে দীনবন্ধুবাবুর কাছে গিয়া বসিলেন—মুখে কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। দীনবন্ধুবাবু পূর্ণচন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "কি, কিছু মতলব আছে বুঝি?"

সলজ্জ পূর্ণচন্দ্র কহিলেন, "আমার একটা লেখা শুনিবেন?"

দীনবন্ধু বলিলেন, "তুমি আবার লিখেছ বুঝি? পড়, পড় শুনি।"

পূর্ণচন্দ্র বই লিখিয়াছে শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও বাজনা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া বসিলেন। তখন পড়া আরম্ভ হইল।

এখন, নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতে বসিয়া পূর্ণচন্দ্র বড় বিপদে পড়িয়াছেন। নায়িকার রূপ কোন রকমেই ফুটিতেছে না,—অতএব লেখক নাচার হইয়া পাঠকগণের উপরে ভার দিলেন, তাঁহারা "দুর্গেশনন্দিনী"র নায়িকার রূপ বর্ণনা পড়ুন—তাহা হইলে আর কোন গোলমাল থাকিবে না; কারণ, তাঁহার নায়িকার রূপ ঠিক তেমনই—একটুকু এদিক্ ওদিক্ নয়!

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া দীনবন্ধু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন,—সে হাসিতে বঙ্কিমচন্দ্রও যোগ দিলেন।

দীনবন্ধু কহিলেন, "দেখ কিরূপে রূপবর্ণনা করিবে জান? সুন্দরী দেখিয়াছ ত? যখন রূপের কথা লিখিবে, তখন সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্য মনে করিয়া যতটা পার, তার সঙ্গে মিলাইয়া লিখিও, তাহা হইলেই সব গোলমাল চুকিয়া যাইবে।"

পূর্ণচন্দ্র বলিলেন, "কৈ নভেলের নায়িকার মত সুন্দরী আমি ত কখনও চোকে দেখি নাই।

"বঙ্গদর্শন" বাহির হইবার পর এক সম্প্রদায়ের লোক বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নানা প্রকারে তাঁহাকে সাধারণের সম্মুখে বিড়ম্বিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। তখনকার কোন কোন কাগজে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণপ্রমাদগুলির একটি তালিকা তৈয়ার করিয়া বাপান্ত বলিয়া গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পেচকের কষ্টকারণ বলিয়া সূর্য্যালোকের প্রতি কোন্ মূর্খ বিরাগ প্রকাশ করিবে? সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্কিম, সেই বঙ্কিমই রাহিয়া গেলেন, নিন্দকদল মিছাই গলা ভাঙ্গিয়া সারা হইল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তোর দান নাই। জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিতেন, "গেঁয়ো কুকুরগুলোর স্বভাব ঐ রকম, খানিক চাঁচায়, তার পর সব চুপচাপ।"

সময়ে সময়ে বিরুদ্ধ সমালোচনায় তিনি যে আঘাত পাইতেন না, এমন নয়। প্রমাণস্বরূপ, আমরা "সাধনা"য় শ্রীশচন্দ্রলিখিত "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ" হইতে স্থলবিশেষ তুলিয়া দিলাম :—

"রাজসিংহ" বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁহার কোন বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, এঁরা বলেন আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না। * * * *

"একদিন * * নবীনবাবু (কবি) কথায় কথায় "আনন্দমঠে"র সুপরিচিত "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিষটিকে আধসংস্কৃত আধবাঙ্গলায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিতস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখিয়াছি। লোকের ভাল লাগ্‌বে কি না ভেবে আমি লিখ্‌ব!"

শক্তিধর পুরুষেরা কখনও মতামতের স্রোতে গা-ভাসান দেন না। সম্মুখে গহন বন দেখিলে আমরা ফিরিতে পারি,—কিন্তু তাঁহারা আপন পথ আপনিই করিয়া লইবেন। অন্যের মুখ চাহিয়া আমরা বসিয়া থাকিব—পরের চোখের একটি ইঙ্গিতে আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে, এ নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। পরন্তু, সাধারণের মত সংগঠন করিয়া, সাধারণের রুচি বদলাইয়া, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র পথের পথিক হন। এই ত প্রতিভা ও শক্তির লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান এবং শক্তিধর।

মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র যখন অন্তিম নিঃশ্বাসের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিতে আসেন। তখন তিনি রমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "বার বৎসরের ভিতরে কেহ যেন আমার জীবনী না লেখে।" শুনিয়াছি এই উক্তির কোন কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বড় সাধ ছিল যে, তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুত পূর্ণেন্দুসুন্দর কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনচরিত রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। দ্বাদশবৎসর পরে তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইবেন। তখন তাঁহার পক্ষে জীবনচরিত-রচনা তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। এই কারণে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি একত্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সে তালিকা এখন কোথায় তাহা জানি না, কিন্তু দ্বাদশবর্ষ বহুকাল অতীত হইয়াছে; তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের—সাহিত্য-সম্রাটের জীবনচরিত রচিত হইল না। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

স্নেহ-পাশ।

ভগবতীর ছেলেটি যখন দুই বছরের, তখন তাহার স্বামী মারা গেল। কলিকাতা সহরে সামান্য একখানি বাড়ীর একটি কক্ষ ও একটি দালান ভগবতীর স্বামী ভাড়া লইয়াছিল। অন্যান্য কক্ষে অপরাপর লোক বাস করিত। দালানটিতে রন্ধন হইত। কক্ষে বাস ও শয়ন।

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে ভগবতী চারিদিক অন্ধকার দেখিল। এই অতি ক্ষুদ্র কক্ষেও বাস করিবার মত অর্থ তাহার নাই। তাহার স্বামীর দেশস্থ বাড়ী ও জমি যাহা ছিল, তাহা অনেকদিন পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ভগবতীর পিতৃকুলেও কেহ ছিল না। এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা ছিল, সেও এই বিপদের সংবাদ পাইয়া, পাছে ছেলে লইয়া ভগবতী গলগ্রহ হয় এই ভয়ে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। প্রতিবেশিনী রমণীগণ আসিয়া সহানুভূতি জানাইল বটে; কিন্তু তাহারা সকলেই গরীব,—সাহায্যের ক্ষমতা কাহারও কিছু নাই।

যে বাড়ীতে ভগবতী বাস করিত, তাহার কিছু দূরেই নিশানাথবাবুর বিশাল নিকেতন। রাস্তার উপর লৌহনির্ম্মিত ফটক। রেলিংএর মধ্য দিয়া বাগান দেখা যাইতেছে। সবুজ ঘাসের উপর ফড়িং লাফাইতেছে। ক্রোটন গাছগুলি কাঁকর দেওয়া রাঙা রাস্তার দুইপাশে শোভা পাইতেছে। মাঝখানে একটি ফোয়ারা সময়ে অসময়ে জল উদ্গীরণ করিতেছে। তাহার চারিপার্শ্বে প্রস্তরগঠিত চৌবাচ্ছা। তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে। ভগবতীর পুত্র নলিনাক্ষ পিতার কোলে চড়িয়া রোজ বিকালে এই বাগানে আসিত ও লাল মাছ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া ঝাপাইয়া পড়িতে যাইত। নিশানাথবাবু ছেলেটিকে নিজে কোলে করিয়া বাগানের চারিদিকে বেড়াইতেন। বড় বড় গোলাপ তুলিয়া হাতে দিতেন। শিশু আনন্দে অস্ফুট কলধ্বনি দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত। নিশানাথ বাবুর হৃদয় গলিয়া যাইত। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

নিশানাথবাবু শুনিলেন, নলিনাক্ষের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে দিন বিকালে আর তিনি নলিনাক্ষকে দেখিতে পাইলেন না। কলহাস্যে অর্দ্ধনগ্ন বালক তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল না। তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিল

না। নাসিকা লেহনের প্রয়াস করিল না। নিশানাথবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

নলিনাক্ষের ক্ষুদ্র শিশু হৃদয়ও বুঝি সেই বৈকালিক ভ্রমণের অভাব অনুভব করিয়াছিল। ভগবতী যখন আকুল শোকাবেগে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধযাতনার প্রবাহের নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন চঞ্চল শিশুটিও মায়ের গায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভগবতীর অশ্রুস্রোত আরও উচ্ছ্বসিত হইল। শিশুকে দেখিয়া মৃত স্বামীর স্মৃতি অনলবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যন্ত্রণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন মাতাপুত্র একত্র অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল।

নিশানাথবাবু সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভোজনে বসিলে তাঁহার পত্নী উমা তাঁহাকে বলিল, "শুনেছ, নলিনাক্ষের বাপ মারা গেছে। আহা, তাদের আপনার বল্‌তে কেউ নেই। তুমি একবার খবর নাও।"

নিশানাথবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, অনেক দিন হ'তে একটা কথা তোমাকে বল্‌ব মনে কর্‌ছি। আজ বল্‌বার সময় এসেছে। নলিনাক্ষের মা আজ আশ্রয়হীনা। ছেলেটির উপরও আমার বড় মমতা হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই। আমাদের ত' আর ছেলেপুলে কিছুই নাই। নলিনাক্ষের মাতাকে মাসিক অর্থসাহায্য দিলে তাঁরও কোন কষ্ট থাকবে না।"

উমার মনে নলিনাক্ষের ছবি জাগিয়া উঠিল। কি সুন্দর ছেলেটি! উজ্জ্বল, বিশাল নয়ন, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, সুগোল অবয়ব—দেখিতে যেন রাজপুত্র। উমার হৃদয়ে যে স্নেহবন্যা এতদিন স্থানাভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, আজ এই বালকটিকে পাইয়া তাহা বাঁধ ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিল। উমা সানন্দে বলিল, "আহা, তাই কর। দিব্য ছেলেটি। তার মায়ের দুঃখু আর দেখা যায় না।"

কিছুদিন কাটিয়া গেল। শতশোকজর্জ্জরিতা হইলেও ভগবতীর দিন কাটিয়া গেল। অতি সামান্য যে অর্থ তাহার নিকট ছিল ও নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইল, তাহাতে কিছুদিন অতি ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিল।

বিপদ্ সাগরের একটি বৃহৎ তরঙ্গ তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। আবার এক বিরাট উর্ম্মি গর্জ্জন করিয়া তাহাকে ডুবাইতে আসিল।

যে বাড়ীতে ভগবতী থাকিত তাহার অন্য একটি কক্ষ ভাড়া লইয়া নগেন্দ্র নামে এক যুবক বাস করিত। তাহার বাড়ী বিদেশে। কলিকাতার কোন রঙ্গালয়ে সে প্রবেশ করিয়াছিল। অভিনয়-বিদ্যা দেখাইবার বড় একটা সুবিধা সে করিতে পারে নাই। কারণ সে নিজে সকল নাটকের নায়কের অংশ অভিনয় করিতে চাহিলেও রঙ্গাধ্যক্ষ তাহাকে সৈন্য, দস্যু, অথবা দূত ও ভৃত্যের অংশ দিতেন। কাজেই এই অহঙ্কৃত অভিনেতা তাহার প্রতিভা কেহ বুঝিতে পারিল না বলিয়া, যাহার তাহার কাছে আক্ষেপ করিত এবং সময় ও শ্রোতা পাইলেই বিরাট গর্জ্জনে অভিনয়ের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে থাকিত। তাহার দৃষ্টি ভগবতীর উপর পতিত হইল। ভগবতীর সে স্থলে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বাড়ী ছাড়িতেও পারিল না। কারণ বাড়ীর যে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, তাহার ভাড়া দিতে পারে নাই। ভাড়া না দিয়া উঠিয়া যাইতে পারিবে না।

এই সময় নলিনাক্ষই তাহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল। কখনও কল্পনার চক্ষে দেখিত, নলিনাক্ষ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃতী হইয়াছে। সম্পদে তাহার গৃহপূর্ণ। নলিনাক্ষের বধূর মূর্ত্তিটিও নয়নপথে যেন ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কল্পনার এ মনোরম দৃশ্যও দীর্ঘস্থায়ী হইত না। সংসারের নিদারুণ জ্বালা এ সুখের স্বপ্নেও বাধা প্রদান করিত ও সংসারের দারুণ অভাব সজীব মূর্ত্তিতে ভগবতীকে অস্থির করিয়া তুলিত।

এইরূপ সময়ে নিশানাথবাবুর একজন দাসী ও একজন সরকার আসিয়া ভগবতীকে জানাইল,—নিশানাথ নলিনাক্ষকে পোষ্যপুত্র লইতে চাহেন। ভগবতীকে নিশানাথবাবু মাসিক যে বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে ভগবতীর আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। সরকার বিবিধ প্রকার বচন-বিন্যাসে নলিনাক্ষের ভাবী সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিল। ভগবতীও পুত্রকে দেখিতে পাইবে। যখন ইচ্ছা নিশানাথবাবুর গৃহে যাইতে পারিবে। তাহার নিজের ক্লেশ থাকিবে না,

নলিনাক্ষেরও উন্নতি হইবে। সুতরাং ভগবতীর আপত্তির কোনও কারণই থাকিতে পারে না। দাসীও বিবিধ কথায় বুঝাইল। নিশানাথবাবুর পত্নী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এটি তাঁহার একান্ত অনুরোধ। ছেলেটির কোন অযত্ন হইবে না। ভগবতী ইচ্ছা করিলে ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন।

ভগবতী প্রথমটা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কে তাহার সন্তানকে তাহার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে? সে কেন তাহার সন্তানকে ছাড়িয়া দিবে? তাহার একমাত্র অবলম্বন, যাহাকে ধরিয়া আজও সে জীবিতা, কি করিয়া তাহাকে ছাড়িবে? নলিনাক্ষই যদি গেল, তবে তাহার জীবন-ধারণের ফল কি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত চিন্তার উদয়, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সুখের জন্য, নলিনাক্ষের সর্ব্বনাশ করিবে? তাহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়াই দায়, নলিনাক্ষকে লেখাপড়া শিখাইবে কোথা হইতে? আর নিশানাথবাবুর গৃহে নলিনাক্ষ যে আদর-যত্নে সম্বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কেন নিজের সুখের জন্য পুত্রের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যচিত্র মুছিয়া ফেলিবে? আর এমনও ত' নয় যে, নলিনাক্ষের সহিত আর দেখা হইবে না। নলিনাক্ষের ভাল হউক, নলিনাক্ষ সুখে থাকুক,—ভগবতীর আর কিছুই প্রার্থনা নাই।

এইরূপ সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মাতা নিজ জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিল। তখন বুঝে নাই যে, কি করিতে বসিয়াছে। তখন বুঝে নাই, ভবিষ্যতের অদৃশ্য রাজ্যে তাহার জন্য কত দুঃখ সঞ্চিত আছে।

নিশানাথবাবুর গৃহে মহোৎসব। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দে, নিমন্ত্রিতবর্গের কোলাহলে, ভিক্ষুকগণের কলরবে পল্লীবাসী সকলেই জানিল, নলিনাক্ষকে নিশানাথবাবু পোষ্যপুত্র লইতেছেন। সকলেই বুঝিল, ভগবতীর কপাল ফিরিয়াছে।

তখন প্রতিবেশিবর্গের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভগবতী যখন দরিদ্র নিঃসহায় ছিল, তখন অনেকেই তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত। আজ তাহারাই তাহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে ঈর্ষান্বিত হইল।

প্রতিবেশিনীগণও হিংসার তাড়নে বলিতে লাগিল, "মরণ অমন টাকার! ছেলে বিলিয়ে টাকা পাওয়ার চেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল।"

কিন্তু ভগবতীর হৃদয়ের বেদনা কেহ বুঝিল না। উৎসবের সময় নিশানাথবাবুর গৃহে সে ছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যাকালে নিজ কক্ষটিতে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। বাধা না মানিয়া অশ্রুপ্রবাহ তাহার উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। স্বামি-বিয়োগে তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার নলিনাক্ষ ছিল। আজ সেই হাস্যমুখ বালকটিও পরগৃহে। শূন্য শয্যায় নলিনাক্ষের মলিন কাঁথাটি ও ছোট বালিশটি বুকে ধরিয়া ভগবতী অধীর হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

সেদিন নগেন্দ্র সুরামত্ত অবস্থায় বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। সে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের সংবাদ সমস্তই অবগত ছিল। তাহার রাক্ষসোচিত প্রকৃতি এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। "ছেলেটা গিয়াছে, ভালই হইয়াছে", এই ভাবিতে ভাবিতে সে ভগবতীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা হইলেও ভগবতী আলো জ্বালে নাই। শোকাবেগে দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই কাঁদিতেছিল। নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া রোদনের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও নাটকার নায়কের দুই চারি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পাইল। তাহার স্বর শুনিয়াই ভগবতী তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ও নিজ অবস্থা বুঝিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা এই চীৎকারে সেখানে আসিয়া পড়িল। ভগবতীর কথা শুনিয়া একজন পুরুষ মদিরামত্ত নগেন্দ্রের গলদেশ ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে গেলেন। দুরাত্মা নগেন্দ্র তখন তীব্র হলাহল উদগীর্ণ করিল। সকলকে বুঝাইল, ভগবতীই তাহাকে উৎসাহ দিয়াছে। সেইজন্য ছেলেটিকে পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহা না হইলে সে এ কার্য্যে অগ্রসর হইবে কেন? রঙ্গালয়ের কত অভিনেত্রী তাহার কৃপা-কটাক্ষ পাইবার জন্য লালায়িত!

কলঙ্কসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহার প্রভাব অসীম। কেহ কেহ ইহা অবিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু অধিকাংশই ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা করিল। নগেন্দ্র দূরীকৃত হইল বটে, কিন্তু তাহার দুই চারিটি কথায় ভগবতীর ভাগ্যে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইয়া রহিল।

পরদিন পল্লীময় এই কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। যাঁহারা ভগবতীর পুত্রের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন শতমুখে নানা অলীক জনরবের সৃষ্টি করিয়া অন্তরের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন। এমন কি নলিনাক্ষের কথা লইয়া দেবোপম-চরিত্র নিশানাথবাবুর নামেও কলঙ্ক আরোপ করিতে লোক সঙ্কুচিত হইল না।

এ সংবাদ গুপ্ত থাকে না। নিশানাথবাবুও এ সংবাদ-শ্রবণে ব্যথিত হইলেন। তিনি ভগবতীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় ভগবতী যেন নিশানাথবাবুর বাড়ীতে না যান। এ পল্লী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার অপর অংশে বাস করিবার জন্য নিশানাথবাবু এক বাড়ী ঠিক করিয়াছেন। সেই বাটীতে ভগবতী গিয়া বাস করুন। প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে খরচ প্রেরিত হইবে।"

ভগবতী কোন উত্তর দিল না। পরদিন হইতে তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

সময়চক্রের আবর্ত্তনে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। নলিনাক্ষ এখন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। নিশানাথবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে বহু সঙ্গী আসিয়া নলিনাক্ষকে ঘিরিয়াছে। প্রত্যহ অপরাহ্নে যুগল অশ্ববাহিত সুসজ্জিত যান নলিনাক্ষ ও তাহার বন্ধুবর্গকে লইয়া কলিকাতার রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিয়া যাইত। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত। চারিদিকে রব উঠিয়াছিল, নিশানাথবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য নলিনাক্ষ দুই হাতে উড়াইতেছে।

একদিন অপরাহ্নে বহুমূল্য বসনে সজ্জিত নলিনাক্ষ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শকটারোহণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক মলিনবসনা বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। নলিনাক্ষ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, "তুমি কে? কি চাও?"

বৃদ্ধা বলিল, "তোমার মাকে মনে পড়ে?"

নলিনাক্ষ। মা? মা ত বাড়ীতে আছেন। কেন?

বৃদ্ধা। সে মা নয়, যার গর্ভে তোমার জন্ম, তাকে মনে পড়ে?

নলিনাক্ষের মনে পূর্ব্বকথার স্মৃতি জাগিল। নিশানাথ তাঁহাকে সকলই

বলিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের ধারণা ছিল, তাঁহার জননী কুলত্যাগিনী হইয়া গিয়াছেন। আজ সহসা তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। তাঁহার মাতার মূর্ত্তি তাঁহার মনে পড়ে না। তিনি অতি শৈশবে নিশানাথবাবুর গৃহে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বৃদ্ধা বলিল "যদি তোমার মাকে দেখিতে চাও, ত' আমার সঙ্গে এস।"

নলিনাক্ষের বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল "নলিন্, এটাকে তাড়িয়ে দাও। নাও, গাড়ীতে উঠে পড়, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

নলিনাক্ষ বলিল, "তোমরা আজ যাও। কাল এস।" পরে বৃদ্ধাকে বলিল, "তুমি এই গাড়ীতে উঠ। কোথা যেতে হবে বল।" বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা অভিমুখে সুসজ্জিত নলিনাক্ষ জীর্ণবসনা বৃদ্ধাকে লইয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিল। রাস্তার লোকে অবাক্ হইয়া এই আরোহীদ্বু'টিকে দেখিতে লাগিল।

নলিনাক্ষের সেই বন্ধুটি বলিল, "কি বিপদ! কোথাকার এক আপদ এসে আমোদটা মাটি করে দিলে। চল যাওয়া যাক্।" তখন সকলেই নলিনাক্ষের বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে সরিয়া পড়িল।

নলিনাক্ষের শকট এমন এক স্থলে আসিয়া পৌছিল, যেখানে গলি অতি সঙ্কীর্ণ। শকট ছাড়িয়া পদব্রজে নলিনাক্ষ বৃদ্ধার অনুসরণ করিল। দুই তিনটি অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলি অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধা এক খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া খুলিল। সম্মুখের ঘর পার হইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া নলিনাক্ষকে ডাকিল। নলিনাক্ষ সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহখানি ক্ষুদ্র। এক কোণে একটি মলিন শয্যা। তাহার উপর এক রমণীদেহ শয়িত। একটি মাটীর কলসী, ভাঁড় ও দুই একটি তৈজস বিশৃঙ্খল-ভাবে নিপতিত। নলিনাক্ষকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধা কহিল, "ঐ তোমার মা।"

নলিনাক্ষ অগ্রসর হইয়া রমণীর উপর মুখ অবনত করিল। রমণীর চক্ষু নিমীলিত। মুখ প্রশান্ত। সর্ব্বাঙ্গ কঠিন। নলিনাক্ষ বুঝিলেন, তাঁহার মাতার প্রাণহীন দেহ তাঁহার সম্মুখে।

কিন্তু নলিনাক্ষের মনে মাতৃবিয়োগ-যন্ত্রণার কোন তীব্রতা অনুভূত হইল না। মনে হইল বটে, এই রমণী তাঁহার গর্ভধারিণী, হয়ত নিদারুণ ক্লেশে অনেক দুঃখ সহিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মনে মনে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু যথার্থ মাতৃহীনের বেদনা অনুভব করিলেন না। বৃদ্ধা তীব্রনয়নে তাঁহার ভাব দেখিয়াছিল। সে বুঝিল, তিনি শোকে বিশেষ অভিভূত নন। তখন সে আর থাকিতে পারিল না। বলিল, "দেখ্‌ছ ত—হতভাগিনীর মৃতদেহ দেখ্‌ছ ত। পৃথিবীতে আসিয়া অবধি বেশী দিন সুখভোগ করিতে পায় নাই। বলিত,—স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই সুখে কেটেছে। স্বামী মারা গেল—দুই বছরের একটি ছেলে, তাকে কি ক'রে মানুষ কর্‌বে এই ভাবনায় আকুল হয়ে পড়্‌ল। ছেলেটিকে একজন বড়লোক পুষ্যিপুত্তুর নিলে। ছেলের ভালর জন্য হতভাগিনী নিজের বুক চিরে দিলে। তার পর—এমন দেবীর নামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হ'ল। হতভাগিনী পালিয়ে এল। ভোর রাত্তির, আমি গঙ্গাস্নান করে আস্‌ছি—অভাগিনী গঙ্গায় আত্মহত্যা কর্‌তে যাচ্ছে। কত বোঝালেম—দুর্জ্জনের কথায় তার কি ক্ষতি বল্লেম। ছেলের মুখ চেয়ে বাঁচ্‌তে বল্লেম। অভাগিনী শুন্‌লে। আমার ঘরে এসে রইল। দিনের বেলা গোবর ঘুঁটে দিত। তাই বেচে খাওয়া চল্‌ত। আর দিন রাত্তির ছেলের কথা। নিজে যেতে পার্‌ত না—আমাকে রোজ পাঠাত, ছেলে কেমন আছে দেখে আয়। ছেলে বড় হ'ল; গাড়ী করে স্কুলে যেতে লাগ্‌ল। অভাগিনী বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। ছেলে গাড়ী চড়ে যেত—অনিমিষে চেয়ে থাক্‌ত—আর ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে চোখ্‌ দিয়ে জল পড়্‌ত। স্কুলের ছুটীর সময় রোজ স্কুলের সামনে দাঁড়াত, ছেলে গাড়ীতে উঠ্‌ত, আর চোখ্‌ বেয়ে জল পড়্‌ত। স্কুলের ছেলেরা পাগ্‌লী বলে ক্ষেপাত, ছেলেও তাতে যোগ দিত। অভাগিনী সব সইত। ভাল খাবার জিনিষ কোথাও পেলে নিজে খেতে পার্‌ত না। গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌ত। ছেলের একবার অসুখ হয়। সামান্য জ্বর। অভাগিনী তিনদিন কিছু খায় নাই। দিনে তিনবার আমার খবর নিতে পাঠাত। আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে বলতেম ভাল আছে। ছেলে বড় হ'ল। নিজে কর্ত্তা হয়ে রোজ বিকালে

গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। অভাগিনী রোজ রাস্তায় সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের শরীরে যত্ন নাই—অসুখ হ'ল। জ্বরে কাঁপছে, তবু রোজ বিকালে তাকে ধরে রাস্তায় নিয়ে যেতে হ'ত। ছেলে যাবে দেখ্‌বে। পরশুদিন কি দুর্য্যোগ মনে আছে ত? মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে অনাগায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। কারো মানা মান্‌লে না। ছেলের গাড়ী সে দুর্য্যোগে এল না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। লোকজনে ধরাধরি করে এইখানে রেখে গেল। সেই রাত্রিতেই বিকার। সমস্ত রাত বক্‌তে লাগ্‌ল। 'নলিনাক্ষ' 'নলিনাক্ষ' ব'লে চেঁচাতে লাগ্‌ল। ছেলেটি যখন ছোট ছিল, তখন সে যে কাঁথা ও বালিসে শু'ত, সেই দুটি বুকে চাপিয়া ধরে আর 'নলিনাক্ষ' বলে ডাকে। কাল রাত চারটের সময় অভাগিনীর সকল যন্ত্রণা ফুরিয়েছে।"

নলিনাক্ষ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িয়া মৃতা জননীর দেহ সিক্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র গৃহের একমাত্র বাতায়ান-পথে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ প্রবেশ করিয়া মৃতা ভগবতীর মুখে পতিত হইল। কি প্রশান্ত স্নেহময় সেই মুখ!

তাহার পরদিন উমা নলিনাক্ষকে ডাকাইয়া বলিল, "বাবা পুরুতমশায় বল্‌ছেন, তুমি এখন আমাদের গোত্র হয়েছ। তোমার অশৌচ হতে পারে না।"

নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, উত্তরীয়ধারী নলিনাক্ষ বলিল, "আমার মা মরেছে। আমি ভগবতীর ছেলে।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

জগৎ-মুকুর।

এ জগৎ মুকুরেরগৃহ, হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
তোমার সকল ভঙ্গি-ভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে।
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন,
প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ গৃহেতে কর বিচরণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

গিরিশ-স্মরণে।

—•—

ঝিঁঝিট—একতালা।

১

ঐ শুন পুনঃ পুনঃ
উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।
কোথায় গিরিশ আজি,
নট-কবি-চূড়ামণি॥
যে ভাবে যে আঁছে যথা, জানায় ব্যথার কথা,
বুকে ব'য়ে মর্ম্ম-ব্যথা,
শোক-বিকল ধরণী।
সে যে শুধু কবি নয়, মানুষ মনীষাময়,
দিগন্তে উজলি' রয়
মহত্ত্ব-রতন-খনি—
বিশ্ব-প্রেম বুকে ব'য়ে, বিশ্ব-প্রেম-বিনিময়ে,
যত কথা গেছে ক'য়ে,
একে একে কত গণি!
এত গান কে গাহিল, এত প্রাণ কে ঢালিল,
পুণ্যে তারে পেয়েছিল,
ঐ জন্মভূমি জননী—
কেন মিছে কাঁদা আর, কেন বা বেদনাভার,
নাইক জীবন তা'র,
আছে তো তার জীবনী॥

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

২

আর কি কহিব, কি কহিব,
তোমরাই বা কি কহিবে।
এ জনমে তার কথা,
কহিলে কি ফুরাইবে॥
প্রতিভা সে নিরমল, কোটিসূর্য্য-করোজ্জ্বল,
চিরদীপ্ত ঝলমল,
চিত-আঁধার বাড়িবে।
তা'র স্মৃতি জেগে রবে, সঙ্গীত সাকার হ'বে
মূক কীর্ত্তি কথা ক'বে,
যা'বে ভেদ জড়-জীবে—
যাও ফিরে ঘরে যাও, যদি বুকে ব্যথা পাও,
গুণ-স্মৃতি ঢেলে দাও,
সব জ্বালা জুড়াইবে॥*

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালা।

হিন্দুশাসনে বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থার সহিত মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাধারণতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) গঙ্গানদীর দক্ষিণে ও হুগলীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূভাগ সাধারণতঃ রাঢ় নামে পরিচিত। এই জনপদ অতি প্রাচীন এবং ইহার ইতিহাস আমরা প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র প্রকাশ করিব। রাঢ় ব্যতীত আরও তিনটি বিভাগের নাম বঙ্গীয় ঐতিহাসিক পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নাই। এ স্থলে তাহা-

---

* স্বর্গীয় নটকবি-চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিরাট স্মৃতি-সভায় গীত হইবার জন্য রচিত।

(১) গৌড়রাজমালা।

দিগের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উক্ত চারিটি বিভাগের সহিত কোন কোন ঐতিহাসিক আরও একটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। (২) মহানন্দার পশ্চিমে এই জনপদ অবস্থিত ছিল এবং সাধারণতঃ ইহা মিথিলা নামে পরিচিত।

যে সময়ে মুসলমান বীর বক্তিয়ার খিলিজির রণভেরী বাঙ্গালার প্রান্তর শব্দিত করিয়া বাজিয়া উঠে, তখন নদীয়া বাঙ্গালার রাজধানী। লক্ষ্মণ সেন মুসলমান আক্রমণে রাজ্য ত্যাগ করিয়া, তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিলে, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহার পরবর্ত্তী কালেও বৃদ্ধ হিন্দু নরপতির বংশধরগণ সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান শাসন করিতেন এবং মুসলমানগণ বাঙ্গালার রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৪০৬ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সময়ে ও পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে যে কয়েকটি স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রায় সে সমুদায় স্থানেও মুদ্রা প্রস্তুত হইত। (৩) এইরূপ স্থানের সংখ্যা দশটি; তন্মধ্যে বর্ত্তমান হুগলী জেলায় তিনটি অবস্থিত ছিল। লক্ষণাবতী, ফিরুজাবাদ, (পাণ্ডুয়া) সপ্তগ্রাম, নূর, গিয়াসপুর, সুবর্ণগ্রাম, মুজামাবাদ, ফতেবাদ, খলিফাবাদ এবং হুসেনাবাদ বঙ্গনৃপতির টঙ্কশালা-ব্যপদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, বাঙ্গালায় যে অন্য প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না, এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

রাজস্ব-আদায়ের সুবিধার জন্য মুসলমান নৃপতিগণ বাঙ্গালা দেশকে কতিপয় মহলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক মহলের রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সিক্‌দার থাকিত। প্রধানতঃ হিন্দুগণই উক্ত পদে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া, আজিও বঙ্গীয় সমাজে সিকদার ও মজুমদার উপাধি-ধারী হিন্দুর

---

(২) See J. A. S. B. (1873) where Blockman says that Bengal was divided into 5 districts.

(৩) Thoma's Chronicles.

সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। (৪) সেই হইতে "মহল" ও "সিকদার শব্দ" বাঙ্গালায় অবাধে চলিয়া আসিতেছে

টোডার মল্ল বাঙ্গালায় নূতন রাজস্বের সূত্রপাত করেন। তিনি সমগ্র বাঙ্গালাকে ১৯টি সুবা ও ৬৮২টি মহলে বিভক্ত করেন।

আমরা হুগলী জেলা বলিতে বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদায় স্থানকে বুঝিয়া থাকি, ঐ স্থানগুলি তিনটি সুবায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। সুবা সপ্তগ্রাম, সুবা মন্দারণ ও এবং সুবা সামিলাবাদ তৎকালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। সুবা সপ্তগ্রাম বলিতে হুগলী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যতীত বর্ত্তমান ২৪ পরগণার বহুস্থান বুঝাইত। বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা ইহারই অন্তর্ভূত ছিল। ইহার অধীনে ৫৩টি মহল ছিল। আইন্-ঈ-আক্-বরীতে লিখিত আছে যে, তৎকালে ইহার রাজস্ব ৪১৮১১৮৲টাকা ছিল। (৫) নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার উত্তরে অবস্থিত মহাল-সমূহ সালিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত ছিল। ইহার অধীনে মাত্র ৩১টি মহল থাকিলেও, প্রতি-বৎসরে ইহা হইতে ৪৪০৭৪৯৲ টাকা রাজস্ব-স্বরূপ আদায় হইত। বর্দ্ধমান, বীরভূম, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ব্যতীত হুগলীর পশ্চিমে অবস্থিত জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানসমূহ সরকার মন্দারণের অন্তর্গত ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সুবাগুলির নাম যথাক্রমে উদ্ধৃত করিলাম :—

লক্ষ্ণৌতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জরা, ঘারাঘাট, রারবাকাবাদ, বাজুহা, সিলহাদ, সোনারগাঁও, চিটাগং, মাহ্দাবাদ, কলিকাবাদ, ফতেবাদ, বাক্লা, তানদা, এবং সরিফাবাদ। উপরি-উদ্ধৃত নামগুলির মধ্যে অনেকগুলির মুসলমান নাম দেখিয়া মনে হয়, ইহার পূর্ব্ব হইতে মুসলমান-প্রাধান্যের ফলস্বরূপ বঙ্গে সামাজিক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

উক্ত উনবিংশটি সুবা বা উপবিভাগ হইতে প্রতি বৎসর ৬৩৩৭০৫২৲টাকা রাজস্ব স্বরূপ আদায় হইত। এতদ্ব্যতীত জায়গীর ভূমির রাজস্ব বাৎসরিক

---

(৪) J. A. S. B. 1870.

(৫) একটাকা প্রায় ৪০দাম অথবা দুই শিলিং তিন পেন্স—আক্বরনামা।

৪৩৪৮৮৯২৲ টাকা ছিল। (৬) মূল বাবদে প্রতি বৎসর ১০৩৪৬৯৪৪৲ বাঙ্গালা হইতে রাজস্ব-স্বরূপ আদায় হইত। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইহার এক অংশও আদায় হইত কি না সন্দেহ। দিল্লীর রাজতক্তে বাৎসরিক রাজস্ব নিয়মিতভাবে পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিতে সম্রাট সাজাহান বিস্তর চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়েই ফতে খাঁ নামক একব্যক্তি ১০ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া সম্রাট কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনিও তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালা অরাজক ছিল, হিন্দুর ধন-প্রাণ রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ উক্তির মূলে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। কোন কোন দুর্ব্বলচিত্ত অদূরদর্শী মুসলমান নৃপতির সম্বন্ধে একথা সত্য হইলেও সাধারণভাবে ইহা মানিয়া লওয়া কখনই উচিত নয়। ফলতঃ গৌড়ের বহু মুসলমান অধিপতির উৎসাহে যে অনেক পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহু মুসলমানও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রকে ভক্তির চক্ষুতে দেখিতেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে কবীন্দ্র-উপাধিধারী পরমেশ্বর ও পরাগল খানের ভনিতা উদ্ধৃত করিলাম :—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণ বলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারতকথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥

(৬) J. A. S. B. 1873.

পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজও মুসলমান রীতি-নীতি অবাধে অনুকরণ করিয়াছিল। বিভিন্ন কুলাচার্য্যগণের কারিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সময়ে বঙ্গসমাজে প্রধান প্রধান মেলী-কুলীনের মধ্যে স্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল। (৭) তৎকালে অনেক হিন্দুসন্তানই অবাধে মুসলমান-পত্নী গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। এইরূপে খড়দহের ভাস্কর ঠাকুরের "যবনী" দোষ ঘটিয়াছিল। আবার হিন্দুকুলবালারাও যে মুসলমান বীরের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বীরভূমের শাসনকর্ত্তা বসন্ত চৌধুরীর পত্নী রাজমন্ত্রী জুনিদ খাঁয়ের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। ফুলেয়ার গুণানন্দ ছোট ঠাকুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যার সহিত সাহস খান নামক মুসলমানের বিবাহ হওয়ায় তাঁহার বংশে "সাহসখানী" দোষ ঘটে। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু সে কলঙ্কের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। ইহাতে পাঠক ও লেখক উভয়ের মনেই ব্যথা লাগে মাত্র।

অনেকেই পাঁচ পীরের উপাসনা প্রভৃতি ম্লেচ্ছ আচার গ্রহণ করিয়া যে, হিন্দুসমাজের হৃদয়ে আঘাত দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই, এ কথা ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে মিলন-ভূমি প্রস্তুত করিবার জন্য সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতাকে হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহাদিগের সাধু উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহারা কেবল অনাচারকে প্রশ্রয় দিবার জন্যই মুসলমান রীতি-নীতির অনুকরণ করিতেন, আমরা কেবল তাঁহাদিগেরই কথা বলিতেছি। প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে এরূপ অনাচার ও যথেচ্ছাচারের কথা শুনা যায়। (৮) এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখা যায় যে, হিন্দুসমাজ তৎকালে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল।

---

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) পৃঃ ২৬৩।

(৮) ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে পাঁচপীরের মোকাম। তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম॥
শুকদেব নমাজ পড়েন নম্র করি শির। বেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির॥ (দোষ তন্ত্র)

যখন এইরূপে অনাচারে ও স্বেচ্ছাচারে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হয়। নবদ্বীপনিবাসী হরিহর ভট্টাচার্য্যের ঔরসে নবদ্বীপে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার আবির্ভাবের কাল লইয়া মতভেদ থাকিলেও চৈতন্ত মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার জন্ম হয়, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। (৯) এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার নির্জ্জীব হিন্দুসমাজ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। তাঁহারই চেষ্টায় রাঢ়ীয় হিন্দুসন্তানগণ আবার বর্ণাশ্রমের অনুরাগী হইয়া উঠেন। (১০) তাঁহার সময়ে হিন্দুসমাজ কত উন্নত হইয়াছিল, বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

(৯) তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থের রবি সংক্রান্তি-গণনায় লিখিত আছে ;—নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা। এতদ্দারা ১৪৮৯শকে জ্যোতিষতত্ত্ব-সঙ্কলনের কাল উপলব্ধি করা যায়। এই গ্রন্থ তাঁহার শেষ জীবনের রচনা। সুতরাং ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের কোন সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। Asiatic Researches দ্রষ্টব্য।

(১০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) পৃঃ ২৯৩।

বাঙ্গালার লেখক।

(১)

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাঁহারা সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারা আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনিয়া থাকেন। কথাটা এই যে, এখন আর বাঙ্গালা লেখকের দুর্ভিক্ষ নাই। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সাময়িকপত্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে; এবং সম্পাদক যতই অর্ব্বাচীন ও অখ্যাতনামা হউন না কেন, প্রায়ই এত অধিকসংখ্যক নবীন লেখক তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করেন যে, অনেক সময় তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা বিব্রত সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেখকের এইরূপ অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকেই হয়ত বাঙ্গালা ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা কে বলিতে পারে? ভয় হয় না কি যে, আমরা যাহাকে ভাষার পরিপুষ্টির সহায় বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে হয়ত তাহা অস্বাস্থ্যকর স্থূলতাবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে? এরূপ আশঙ্কার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা যাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

সে আজ বহুদিনের কথা, যখন বঙ্কিমচন্দ্র নবীন লেখকদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—'কেহ যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি হইবে।'—তখন এইরূপ উপদেশের প্রয়োজনীয়তা কতদূর অনুভূত হইয়াছিল জানি না; কিন্তু আটাশ বৎসর পরে আজ যেন মনে হইতেছে যে, তাঁহার ন্যায় কেহ বজ্রগম্ভীর স্বরে পুনরায় যদি এখন ঐরূপ উপদেশবাণী প্রচার করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কিঞ্চিৎ সুফল আশা করা যাইতে পারিত। কারণ আজকালকার লেখকদিগের 'যেন তেন প্রকারেণ' নামটা বাহির করাই যেন লেখনী-ধারণের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার প্রতি শিক্ষিত সমাজের এখন আর অশ্রদ্ধা নাই; অনেকেই এখন যত্ন ও আগ্রহসহকারে বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

সুতরাং যা-হয়-কিছু লিখিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতে পারিলেই হইল;—আর কিছু না হউক, নামটা ত পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়া যাইবে। অধিকাংশ লেখকের সাহিত্যচর্চ্চার মূলে যে প্রায়ই এইরূপ একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় কি সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি আশা করা যাইতে পারে? কয়জন আর এখন প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া সাহিত্য-সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন? সাধনা নাই, আছে কেবল উৎকট যশোলিপ্সা। যাঁহারা এইরূপ 'যশের কাঙ্গালী' হইয়া 'কথা গেঁথে গেঁথে' করতালি লইবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে সকল সময়ে সফল হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে জননী বঙ্গভাষা তাঁহার এই কুসন্তানগণকে যে অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। জ্ঞানভাণ্ডার অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে; কারণ সাহিত্যিকের যত্ন সেদিকে নাই। কাহারও কিছু বলিবার থাক আর নাই থাক্, শুধু শূন্যগর্ভ কথার সমষ্টি সাহিত্যের নামে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাণী-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইঁহারা খুব আড়ম্বর-সহকারে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া বাহ্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু পূজা হয় 'নমোনমঃ'।

হস্তকণ্ডুয়নের চরিতার্থতায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। নাম কিনিব বলিয়া কোমরবাঁধিয়া যা-তা লিখিতে বসিলে সাহিত্য-ক্ষেত্র কেবল আবর্জ্জনার ভারে প্রপীড়িত হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? বাঙ্গালীর কাব্যকুঞ্জবনে হঠাৎ এত অধিক-সংখ্যক কোকিলের আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহাদের নির্দ্দয় ঝঙ্কারে কাণ ঝালাপালা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবার এত লোক ছোট ছোট গল্প শুনাইয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে যথোচিত ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিতেছে না। ইতিহাসে গতানুগতিকের দলই অধিকাংশ লেখক পুষ্ট করিয়া থাকেন; যদি কেহ কোন বিষয়ে গবেষণা দ্বারা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুমোদন বা সমালোচন

করিতে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকেন কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যের বিষয়, ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি অধিকতর বিষয়ে নবীন লেখকগণ বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন না।

কিন্তু এসব কথা কে তাহাদের মস্তকে প্রবেশ করাইবে? আর ব্যাধি যেরূপ সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আমাদের মনে বড়ই ভীতির সঞ্চার হয়। আমরা গালিসর্ব্বস্ব সমালোচনারূপ তীব্র মুষ্টিযোগের পক্ষপাতী নহি। তাহাতে হয়ত কয়েকজনের লেখক-লীলার অবসান হইতে পারে; এবং 'শতঘাতী-ভবেদ্‌বৈদ্যঃ' এই বাক্যের যথার্থ সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিক বৈদ্য যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন সত্য। কিন্তু ইহাতে রোগ দূরীভূত হইবে না। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।*

নবীন লেখকগণকে নিরুৎসাহ করিয়া সাহিত্যোন্নতির উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাদিগকে ভগ্নোদ্যম করিবার জন্য তাঁহার মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন নাই। আজ যাঁহারা নূতন লেখক, তাঁহারাই ত ভবিষ্যতের আশাভরসা-স্থল। সুতরাং যাঁহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের পৃষ্ঠে কশাঘাত না করিয়া যাহাতে তাঁহাদের মনে দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

---

* অর্ঘ্য, ২য় বর্ষ, পৌষ সংখ্যায় মল্লিখিত 'বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হুগলী জেলার কবিওয়ালা।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে কয়েকজন কবিওয়ালার পরিচয় দিয়াছি, মাতৃ-স্বরূপিণী বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার জন্য তাঁহাদিগেরই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না ; প্রতি পল্লীর নিভৃত পর্ণকুটীরে কত শত সাধক, প্রেমিক ও কবি-ওয়ালা জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। আজ হয়ত তাঁহাদিগের নাম ভুলিয়াছি ; তাঁহাদিগের স্মৃতি অতীতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের বাল্য লীলাভূমিতে তাঁহারা যে কীর্ত্তি-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা লুপ্ত হইবার নহে। আমরা হুগলীর তথ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া ইঁহাদের যে কয়েকজনের সন্ধান পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

১। ৺রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুর সহরের সন্নিকটে অবস্থিত কোন্নগর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কোন্নগর অতি প্রাচীন স্থান ও পণ্ডিতস্থলী বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপ বর্দ্ধিষ্ণু ও পণ্ডিতপ্রধান স্থানেও তাঁহার বিদ্যার প্রচুর খ্যাতি ছিল। ইহাতেই সহজে বুঝা যায়, তিনি কতদূর পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতা প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থানে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কবি-প্রতিভার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তৎকালে কবিগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল। সেজন্য তাঁহার যথেষ্ট পদমর্য্যাদা সত্ত্বেও তিনি কবির গানকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে কখন সঙ্কুচিত হন নাই। গান ব্যতীত তৎপ্রণীত সত্যনারায়ণের কথা ও গঙ্গার পাঁচালী নামক দুই-খানি পুঁথি আমরা তাঁহার প্রপৌত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি-এল মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। "হুগলী জেলার প্রাচীন সাহিত্যিক" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে এই দুইখানি পুঁথির বিষয় আলোচনা করিব।

২। শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর সহরের নিকটস্থ বল্লভপুর গ্রামে তাঁহার বাস। ইনি এখনও জীবিত আছেন। বয়স আন্দাজ ৮০ হইবে। ইনি কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে পেনসন্ লইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন। কবিকুল-কোকিল রসিকচন্দ্র রায়ের ইনি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রসিকচন্দ্র কতবার ইঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, দুই বন্ধু একত্র বসিয়া সঙ্গীত-আলাপ ও ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন। সেই সকল কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। ইঁহার নিজের দল ছিল না, ইনি রসিক রায়ের দলেই গাইয়া বেড়াইতেন। গান রচনা করিবার ইঁহার বেশ শক্তি ছিল। নিম্নে আমরা তাঁহার দুই একটি গান তুলিয়া দিলাম :—

(ও) রাম দেহি দেহি রাঙ্গা চরণম্।
চরণম্ দেহি শরণম্॥
জগতকারণম্ আরাধ্য শ্রীপাদপদ্ম-কৃতান্তভয়বারণম্।
চিত্রক্ষেত্রনেত্রগাত্র, দর্শনে জীব হয় পবিত্র,
গণেশের আর নাই মিত্র, বিনা কাল-বারণম্॥

(ও) মন এই ছিল কি তোমার মনে।
চিন্তে পারিলিনে ভবের সে ধনে॥
(ও) যার বিধি চিন্তা ক'রে, না চিনিয়ে তারে,
চিন্তা ডুবালি জীবনে॥
আশী লক্ষ জন্ম আসি ভবে ভ্রমে,
পাপে পূর্ণ দেহ হ'ল ক্রমে ক্রমে,
কিসে ত্রাণ পাবি যাতায়াত-শ্রমে,
হেলায় হারালি সেই নিত্যধনে॥

বিনে বল্‌বিনে? হরি বল বিনে।
সে বিনে সেবিনে বিনে! গতি নাই রে সে বিনে!
মোক্ষপদ ল'বি যদি চল সে সুরাগে,
মন-রাগ হরি হরি সাধ্‌রে বৈরাগে,

আলাপ কর রে বিনে মনের অনুরাগে,
গান্ধারে গান ধর ডাক সর্ ধর শ্রীরাগে
সেই হরিপদ আগে, রাগে গণেশচন্দ্রের রাখ বিনে॥

৩। গবা ধোপা। নিবাস উত্তরপাড়ায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এল্ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথমে গবা ধোপার নাম শুনিতে পাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে, প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপাড়ায় ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার কবির দল বহু স্থানে গাহিয়া বেড়াইয়াছে। পরে ইনি কবির গান ছাড়িয়া যাত্রার দল খোলেন। ইহাতেই বেলুড়ের দল প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের পালা শুনিয়া, সেকালের লোকে ধন্য ধন্য করিত। দুঃখের বিষয়, আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পালার খাতাখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার গান বাঁধিবার ক্ষমতা মন্দ ছিল না। আমরা এই স্থানে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিলাম :—

হরি শ্রীচরণের ভার
দিনের উপায় নাহি আর
তব কৃপাবল বিনা নাই সম্বল
ভরসাস্থল করুণা তোমার॥
এ ভার কি ভার ওহে গিরিধারি!
কাল-বারি হরি তুমি ভূভারহারী
(ভার যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ কর হে সম্পূর্ণ)
তুমি পাণ্ডু-সখা ব্যাপ্ত সংসারে॥

শুনিতে পাওয়া যায় ইনি নিরক্ষর ছিলেন। ইঁহার বংশের কেহ জীবিত নাই।

৩। রসিকচন্দ্র রায়। ইঁহার সবিশেষ সংবাদ লইবার জন্য আমরা একদিন বৃদ্ধ গণেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, উপরে অনন্ত আকাশে তারকার মালা, সম্মুখে কলনাদিনী জাহ্নবী, চারিধারে অন্ধকার। বসিয়া বসিয়া বৃদ্ধ সেকালের অনেক গল্প করিলেন, তার পর আমরা রসিকচন্দ্রের কথা তুলিতে তিনি

বলিলেন,—"আমার বয়স যখন অল্প, তখনই রসিকের নাম দেশ বিদেশে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে কে একজন লিখিয়াছিলেন,—'তাঁহার কবিতা-কামিনীতে ফিরিঙ্গিভাব নাই, কোন রকম ভেজাল বা বিজাতীয় ভাবের সম্মিলন নাই। সেই কবিতা-কামিনীর গায়ে বডি নাই, পরিধানে গাউন নাই, মুখে পাউডার নাই, অথচ সতী অনির্ব্বচনীয় সুন্দরী'।—কথাটা সত্য। কিন্তু তোমরা সব কলেজে পড়া ছেলে হয়ত বিশ্বাস করিবে না। আজকালকার নাকি সুরের কবিতা ও থিয়েটারী সুরের গান শুনিয়া ইচ্ছা হয়, রসিকের গানগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু আবার ভাবি, আজকাল সাহিত্যের বাজারে কিছু চালাইতে যাইলেই ছাড়পত্র বা অনুরোধপত্র চাই। তাহা ত আমার নাই। শেষে সাহিত্যেও Favouritism প্রবল হইয়া উঠিল!" এই কথাগুলি বলিবার সময়ে বৃদ্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অন্ধকারেও আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

১২২৮ সালের বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে বেলা দুই প্রহরের পরেই ভদ্রেশ্বরের পশ্চিমে পালাড়া গ্রামে রসিকচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হরিকমল রায় হরিপালের রায়বংশসম্ভূত। সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র ঘোষ, এম-একে এই রায়-পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমায় লিখিয়াছেন, "হরিপালে দুইটি পুরাতন জমিদার-বংশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রায়-(কায়স্থ) বংশই অধিকতর প্রাচীন; প্রায় ২৫০ বৎসরের পুরাতন হইবে। পূর্ব্বে ইঁহাদিগের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল এবং এখনও ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বহু প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন বংশে রসিকের জন্ম হয়। পালাড়ায় তাঁহার মাতুলালয়, সেইখানেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন।"

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষার লেখক' নামক পুস্তকে লিখিত আছে, রসিক রায়ের পিতা মাতামহ-সম্পর্কীয় এক জমিদারী লাভ করিয়া বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বড়া গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

বড়া গ্রামেই রসিকচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা হয়। বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি

তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ইংরাজ কবি পোপের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে অভ্যাস করায় তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া একদা তাঁহাকে প্রহার করেন। তাহাতে পোপ বলিয়াছিলেন,—

Papa Papa pity take
I'll no more verses make.

গুপ্ত কবির সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, রসিকচন্দ্রও দশ বৎসর বয়সে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি আঠার বৎসর বয়সে "জীবন তারা" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত পাঁচালী, হরিভক্তি-চন্দ্রিকা, কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলার বনবিহার, বৈষ্ণব-মনোরঞ্জন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আজও বটতলার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে।

প্রথমে রসিকচন্দ্রের নিজের একটি কবির দল ছিল। কিন্তু ইহার পর তিনি প্রায়ই ওস্তাদী কবিওয়ালাদের গান বাঁধিয়া দিতেন। গান বাঁধিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কথায় কথায় তিনি সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, একাদশ খণ্ড পাঁচালীর গান ব্যতীত তিনি প্রায় ৫০ সহস্রেরও অধিক গান সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে রসিক রায়ের বহু গান সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম :—

(ক) গুরু মন্ত্রে মন তোরে পেলাম না।
আমার হ'য়ে আমার মন তুই
পেয়েছিস্ কার মন্ত্রণা॥
গুরু বল্লেন ভজ কালী,　　মন কেন তায় মন বাঁকালি
কালীমন্ত্রে দিয়ে কালি কালীতে বিকালি না॥
যে আশায় ভবে আশা,　　না পূরিল মন আশা
সার হ'ল কি রসিকচন্দ্রের আশা-যাওয়া যন্ত্রণা॥

(খ) কৃষ্ণ তোমার কৃষ্ণ-নামে কত গুণ কে বল্‌তে পারে?
নামের গুণে ধ্রুব প্রহ্লাদ যায় হে ভব-সিন্ধুপারে॥
নাম ভাল রূপ ভাল নহে ওরূপ গোপীর জীবন হরে।
(কিন্তু) এখনও যে বেঁচে আছি কেবল কৃষ্ণনামের জোরে॥
তার সাক্ষী হরের মৃত্যু 'হরে কৃষ্ণ' নামে হরে।
রসিকচন্দ্র বলে ধন্য কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সংসারে॥

—:*:—

(গ) কালী! বিষয় কালি কেন গো আমায় মাখালি।
আমি বলে কালী কালী ডাকি মাতৃ-কালী॥
কালী নামে কেন কালী মন বাঁকালি।
আরো ভবে আমি থাকৃব কত কালি॥
মনে সদাই হয় সন্দেহ, এই রসিকচন্দ্রের দেহ
কবে হবে পতন, আজি কি কালি॥

—:*:—

(ঘ) এইবার ধরেছি চরণ-কমলে
রক্ষ রক্ষ মে বিমলে॥
তোমার আদালতে আর্জ্জি দিলাম দেখব কি ফলে কপালে
(বারে বারে ওগো তারা আমায় শমন হারায় মকর্দ্দমায়)
তোমারে তাই ডাকি তারা মা মা বলে॥
রসিক এই বলে, থাক্‌তে সবলে
(মুক্তি ডিক্রি দিয়ে আমায় মুক্ত কর মা) আর
ফিরব না নিষ্ফলে।

রসিকচন্দ্র কেবল কবিই ছিলেন না, তিনি একজন সাধক ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এরূপ কবির আদর হওয়া দূরের কথা,—উঁহার সম্বন্ধে আজিও যথেষ্ট আলোচনা হয় নাই। জপ করিতে করিতে ৭৪ বৎসর বয়সে, বিগত ১৩০০ সালে রসিকচন্দ্রের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলা।

স্থানের নাম দেখিয়া প্রাচীন তথ্য কিরূপে উদ্ধার হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতেছি।

'বগুড়া' শব্দ 'বাঘের' এবং 'বাঘৈর' শব্দের রূপান্তরমাত্র। বাঘের এবং বাঘেল অভিন্ন। বাঘেল হইতে বাঘেলখণ্ডের নামকরণ হইয়াছে।

বাঘের, বাঘেল বাঘ জাতির শাখা মাত্র। বাঘের হইতে বাগড়ি নামেরও উৎপত্তি হইয়াছে। বাঘ জাতির অধিষ্ঠিত বহু স্থান অদ্যাপি তাহাদের নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

বাগড়ি কোন কোন গ্রন্থে বকদ্বীপ অর্থাৎ বক বা বাঘজাতির দ্বীপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

'বগধ'ই বাঙ্গলা দেশের বাগ্‌দী বলিয়া অনুমিত হয়।

করতোয়া এবং করতৈ বা কিরাতৈ অভিন্ন। কিরাতৈ জাতিই কিরাত; টলেমী এই জাতিকে 'কিরাতৈ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতি এক সময়ে নেপাল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া বাস করিত। নেপালে যে কিরাণ্ডি জাতি বিদ্যমান আছে, ঐ জাতিই কিরাত। 'কীর্ত্তিপুর' অর্থাৎ কীরাৎপুর নেপালের রাজধানী ছিল, সমুদ্রগুপ্তের নিশানিতে একথার উল্লেখ আছে। ত্রিপুরার নামান্তর কিরাত। আসাম অঞ্চলের নৃপতিগণ অনেকে আপনাদিগকে কিরাতবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।*

কায়স্থদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও কীর্ত্তি উপাধি দৃষ্ট হয়।

আত্রেয়ী বা আতরাই এবং ওদ্দরাই অভিন্ন। এই ওদ্দর জাতি নেপালেও বিদ্যমান আছে।

'ওদ্দর'ই বদর এবং ভদর। 'wit'ই বুদ্ধি; 'woden' ই বুধ। †

---

* 'কিরাত' হইতে খরোদ, খারোদ হয়। খরোদ লিপিই খরোষ্ঠী। 'খরৎ'ই খহরৎ, খহরাৎ। পক্ষান্তরে 'কিরাত'ই চিরাৎ, চিরেতা (ক্ স্থানে চ হয়)। 'কেরল'ই চের। 'খয়রাৎ'ই charity.

† বত, ভত জাতির শাখাই বদর, ভদর, বদল, ভদল, প্রভৃতি। 'বাতাপি'ই বাদামি এবং Batavia। এই বাতাপী জাতিই বস্তরপা।

ভাহুড়িয়া পরগণা ভদর জাতির বাসস্থান। ইহাই ভাহুড়িয়াদিগের আদি বাসভূমি। ভাহুড়িয়া ভাতুড়িয়া নামেও কথিত হইয়াছে।

বিদ্দল, বুদ্দল ও বদ্দর, বদ্দল জাতির নামানুসারে হইয়াছে।

বদর, ভদর হইতেই ভদ্র উপাধি হইয়াছে।

বদ, বিদ জাতি হইতেই মিথিলার নাম বিদেহ হইয়াছে। 'বিদর্ভ'ই বিদর।*

ভাণ্ডারপুর বন্দর বা ভণ্ডরদিগের নগর। ভাণ্ডারা এই জাতির বাসস্থান। বন্দর বঞ্জর বলিয়াও কথিত হয়। 'বন্ধ্যা'ই বাঁজা। বিধিবার অস্ত্রই বজ্র।†

বন্দর, ভন্দর এবং বন্দল, ভণ্ডল অভিন্ন। বন্দর বা বুন্দেলা জাতির বাসস্থানই বন্দলখণ্ড বা বুন্দেলখণ্ড। এই ভণ্ডল জাতিই (Vandal)। লুটপাট করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। যাহারা বন্ধলপোতিয়া, তাহারা এই জাতিসম্ভূত।

ভাণ্ডার কায়েস্থদিগের একটি শ্রেণী।

বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় সর্ব্বজনবিদিত। মহাস্থানগড় মথন, মিথন জাতির গড়। ইহা বঙ্গদেশের মিথনকোট। 'মৈতি'ই মহতা, মহান্ত; মানদা নদীই মহানদী; 'মারাঠী'ই মহারাষ্ট্রী।

'মিথন', 'মথন'ই মিথি বা মেদজাতি (Meder)। এইজাতির নামানুসারে মিথিলার উৎপত্তি হইয়াছে। এই মেদ জাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। সেন এবং পালরাজদিগের মধ্যে তাম্রশাসনে মেদ এবং অন্ধ্র জাতির উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়।

দিনাজপুরে মেদ জাতির অস্তিত্বজ্ঞাপক মদন লাল বা মদন লাল নামক স্থান বিদ্যমান আছে।

---

* বন্দ, বিন্দ, প্রভৃতি হইতে বন্দর, ভন্দর, প্রভৃতি হয়। কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বিন্দ, বন্ধ, প্রভৃতি উপাধি আছে।

বিন্দ জাতি হইতে বিন্ধ্যগিরির নাম হইয়াছে।

† বত, বন্দ, জগৎ, এবং ভোজ জাতি অভিন্ন। এই 'ভোজ'ই ভাঙ্গ। 'বৃন্দাবন' বা 'বৃন্দাওন'ই ব্রজভূমি। এই জাতির ভাষাই ব্রজবুলি। এই জাতির বাসস্থানই ভাজুয়া বা বজুহা পরগণা।

ময়দানদীঘী নামক স্থান ও মদনভুগ বা মদন দুর্গ বলিয়া বোধ হয়।

'রাণী শঙ্কল' সম্ভবতঃ রণশঙ্কল। 'শঙ্কল'ই শকল, শগল। 'শৃঙ্খল'ই শিকল (Shackle)। 'শর্করা'ই Sugar। শঙ্কল শক জাতির এক শাখা। 'শঙ্কা'ই শক্ (সন্দেহ)।*

জগদ্দল জগ, যুগী জাতির বাসস্থান ছিল।

পরগণা মহেশ বা মাহেশ মাহিষ্যদিগের আবাসস্থান। মাহিষ্য কৈবর্ত্ত-দিগের একটি শ্রেণী। এই জাতি মহিষাসুর বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মুষাওরও এই জাতির এক শাখা। তাহাদের নামানুসারে Mussoorie, Mysore প্রভৃতি স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

জগদ্দল অঞ্চলে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মায়ারুদ্র রাজা এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে। 'মায়ারুদ্র' মারুদর, মারুতগ্ন শব্দের রূপান্তর মাত্র (ইং Marander)। এই মারুত জাতিই মারাঠী বা মহারাষ্ট্রী। মারাঠীই প্রকৃত উচ্চারণ—সংস্কৃত হইয়া মহারাষ্ট্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, রাষ্ট্রকূট জাতিই মারাঠী, এই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়। মারুত জাতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে রহিয়াছে,—

মারুতা ধেনুকাশ্চৈব তঙ্গনাঃ পরতঙ্গনাঃ।—ভারত (৬।৪৭।৪৯)

মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র মারুতী দেবতার পূজা প্রচলিত আছে।

মারুত জাতিই মারুণ্ডে।

মারুণ্ডে এবং মলিন্দে এক জাতি। এই মলিন্দে জাতিই মালোৎ। মালোৎ জাতির বাসস্থান মালদহ। পুরাণে ইহা মলদ নামে কথিত হইয়াছে। অদ্যাপি মালোৎ জাতি এই জেলায় বিদ্যমান আছে। প্লীনি এই জাতিকে মনিদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মনিদি জাতিই মনিন্দে। 'মনিন্দে' হইতে মানন্দা বা মহানন্দা নদীর নাম-করণ হইয়াছে।

সাঙ্গাল দাক্ষিণাত্যের একটি স্থান।

সাঙ্গালী মারাঠীদিগের এক শ্রেণী।

'থালতা'ই তলিত, তলোৎ (Toledo)। এই স্থানে থালতেশ্বরী দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহা তল, দল বা ধল জাতির নগর। তালেরা বা তলোড়া এবং দিলওয়ারা অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। দেউলীও ধৌলী বলিয়া বোধ হয়।

এই জাতির নাম হইতেই ধল্লা নদীর নামের উৎপত্তি হইয়াছে।*

তর এবং তল অভিন্ন। 'তারা'ই Star এবং Stella; 'তাড়'ই তাল; 'দেওয়ার'ই 'দেওয়াল'।

'তারাগুণা'ই Terragona। ইহা তর, দর এবং ধর জাতির বাসস্থান। এই জাতিই থারু। দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতি বিদ্যমান আছে।

'তারাগুণা'ই তারাগুড়া, তালগুড়া, তেলিগুড়, তালিকোট্টা (Tallikot)। এই স্থানই সম্ভবতঃ 'স্থালীকট্ট'। 'স্থালী' থালি, থারি (Tray)।

মালব অঞ্চলের ধার বা ধর এই ধরজাতির নগর।

তাড়াশ (Torres)ও এই জাতির বাসস্থান।

'শাস্তাহর'ই শস্তওয়ার, সৈন্থর। এই সৈন্থরই ছিন্দওয়ার।†

সৈন্থর হইতে সাঁতৈর নামক স্থানেরও নামকরণ হইয়াছে অর্থাৎ এই সকল স্থান সৈন্থ বা চিন-তু জাতির বাসস্থান ছিল। সিন্দুরী পরগণাও অদ্যাবধি তাহাদের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ইহাই চন্দেরী।

'সৈন্থর'ই সৈন্থল। সৈন্থল এবং সান্তাল অভিন্ন।

সৈন্থল, সান্তাল এবং চণ্ডাল অভিন্ন। 'চণ্ডাল'ই চন্দেল। রাজসাহী এবং মালদহ জেলার চাঁদলাই পরগণা রহিয়াছে। 'Sandal'ই চন্দন। চান্দনীয়া, ও এই চিন্ত বা চন্দ, চন্দ্র জাতির বাসস্থান। চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত এবং সদ্গোপদিগের সাঁতরা উপাধি আছে।

---

* ধৌলী অঞ্চলই ধওলী, ডাহল। ঢোলপুরও এই জাতির বাসভূমি। দাক্ষিণাত্যের ধারওয়াড় এই ধর জাতির আবাসভূমি।

† চৈণ্ডি এবং জৈণ্ডা অভিন্ন। জৈণ্ডিয়া পর্ব্বত এই জাতিরই বাসস্থান। জয়ন্তী এই জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সন্থেঙ্গ জাতি খাসিয়া-পর্ব্বতবাসী।

কায়স্থ, বৈদ্য, স্বর্ণবণিক, সূত্রধর, শাঁখারি, যুগী প্রভৃতির চন্দ, চন্দ্র উপাধি আছে।*

'খৈতলাল'ই খেতলুর (Cuddolore)। ইহা কাথি জাতির বাসস্থান। এই কাথি জাতি হইতে কাথিওয়ারের নামকরণ হইয়াছে। এই জাতি এক সময়ে যে এই প্রদেশে প্রতাপশালী ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেওকোট বা দেবকোটের প্রাচীন নাম কোটিবর্ষ এবং কোটিকপুর। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে এই স্থানে কাথি জাতির রাজধানী ছিল। পরে কাথি জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে দেব বা দেও জাতি কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হয়।

এই কাথি জাতির এক শাখাই কতিক, কটিক, খটিক।

এই কাথি জাতিই গুপ্ত (Goth), এবং ঘট, ঘাট। ঘাটনগরও এই জাতির নগর।

গোদাগাড়িও গদিগড় বা কাথিগড়।

কাথি জাতির আবিষ্কৃত অনেক স্থানই দেব জাতির হস্তগত হয়।

খৃষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে পালনরাজদিগের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত উত্তর-বঙ্গে এই দেব জাতিই অত্যন্ত শৌর্য্যশালী ছিল। দেবকোট দেওস্থল, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থান অদ্যাপি তাহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ধূপচাঁচিও সম্ভবতঃ তাহাদেরই নগর।†

এই দেবজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই দ্বারবাসিনী। দ্বারবাসিনী দুবাসিন, দুর্ব্বাসিনের সংস্কৃত রূপ বলিয়া অনুমিত হন। টলেমী এই দুবাসিন, দুমাসিন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। দুবাসী কোচদিগের এক শ্রেণী।

এই দিব, দিম জাতিই তিব, তিম এবং ধীব, ধীম।‡

---

* চিতি জাতিই চেদি। 'চেতন'ই Sentient। 'চিতীয়' জাতিই সীদিয়। আসামে সদীয়া নামক স্থান আছে। এই জাতিই ছুটীয়া বা চুটীয়া।

† এই জাতির অধিষ্ঠিত স্থানই দর্ব্ব।

‡ রাজপুতনার দহিমা জাতিও এই ধুম জাতি (Dahomy)। জাতির আদি বাসস্থান বিয়ামা অঞ্চল।

সংস্কৃত দ্রাবিড় এবং দাবড়, ধাবর, ধীবর অভিন্ন। ধীবর এবং তীবর. তিপরও অভিন্ন। তীবর, তীপর জাতিই তিপ্রা। ইহাদের বাসস্থানই ত্রিপুরা। ধাবড়, ধীবড় জাতির বাসস্থান ধুবড়ি।*

দ্রাবিড় দেশই ডামিল, দামিল, তামিল। 'দামিলিক'ই তমিলিঙ্গ।• এই দামিল, তামিল জাতির ভাষাই তামিল। 'দামিল'ই ধীমাল। রঙ্গপুরের ডিমলা এই জাতির বাসস্থান।

আসামে যে স্তম্ভরাজগণের তাম্রশাসন এবং শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহারা এই ধীম, ধূম বা ডোম-বংশীয়।

আসামের ডিমাপুর তাহাদের এক শাখার রাজধানী ছিল। ডিমাপুরই স্তম্বপুর। অভিধানে তমলুক বা তাম্রলিপ্তের নামান্তর স্তম্বপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তমলুকও তামিল বা তামিলী জাতির রাজধানী ছিল। ঢাকা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে ডোম্‌-রাজগণের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহারাও এই দিম, ধীম, ধূম-বংশীয়।

ডোমর, তোমর ও তীবর, তিপর এক জাতি। কাশ্মীর প্রদেশে যে উডুম্বর-রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ঐ রাজ্যের অধীশ্বরগণ তুমারবংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই তুমর জাতিই তুয়ার। তীবর জাতিও তীওর বা তীওর।

মধ্যভারতেও এই তুমর জাতি বিদ্যমান ছিল। তাহারা সংস্কৃত গ্রন্থে তুম্বুর বলিয়া কথিত হইয়াছে। †

যে চান্যে বিন্ধ্যানিলয়াঃ পুলিন্দাস্তুম্বুরস্তথা—শিবপুরাণ (৫৬।১৭)।

'তুমুর'ই উডুম্বর। 'উডুম্বর'ই উড়ুম্বর। 'উড়ুম্বর'ই হিড়িম্ব। এইজন্যই আসামের ডিমাপুর হিড়িম্ব রাজ্য বলিয়া কথিত হয়। 'হিড়িম্ব'ই সম্ভবতঃ আসাম বুরুঞ্জীর আড়িমাও।

'বালুঘাট'ই বল্লকোট অর্থাৎ বল্লজাতির গড়। বল্ল জাতিই ভিল্ল বা

---

* দাভড় মারাঠীদিগের এক শ্রেণী।

তেওয়ার রাজ্যই জব্বলপুর অঞ্চল। চেদি রাজ্যের অন্য নাম ত্রিপুর।

ভীল। বালুভরাও এই জাতির বাসস্থান। বলিহার পরগণা তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ইহাই বল্লর (Vellore)। 'বেলা আওলা'ও বল্লোল। কায়স্থদিগের বল এবং সদ্গোপ জাতির বল, বাল, বল্লভ প্রভৃতি উপাধি আছে। বল্লভী এই জাতির প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। বল্লভী ধ্বংসের বৎসর হইতে বল্লভী সম্বৎ আরম্ভ হয়।

বল্লভ এবং পহ্লব জাতি অভিন্ন। তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। 'পহ্লব'ই পলৈ, পালৈ। এই জাতির ভাষাই পালি। পলিজাতি দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যমান আছে।

'পলি'ই ফলি। Ploughই ফাল, L. Pleoই full.

'ফুলবাড়ী'ই ফুলওয়াড়ী অর্থাৎ পহ্লবদিগের নগর।

'বলিদি'ই Phyllite (পালিত)। 'ফলিশ'ই Foolish; 'বিলাই'ই L. Felis (Cat).

বাগ্‌দীদিগের পুইলা এবং চণ্ডালদিগের ফলিয়া উপাধি আছে।

বাগ্‌দীদিগের পালনথাই বা পলঙ্কে উপাধি আছে। (অর্থাৎ বল্মীক, তৌলিঙ্গী)।

পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা পহ্লব জাতির নাম হইতে হইয়াছে। পূর্ণিয়াও এই জাতির বাসস্থান। 'পহ্লব'ই পনবৈ, পনৈ, পনোয়া, পানোয়া।*

'পণিজ'ই বণিজ। পহ্লব জাতির আধিপত্যনিবন্ধন দিনাজপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে বাণ রাজার দেশ, এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।†

কায়স্থদিগের বাণ উপাধি আছে। সদ্গোপ প্রভৃতি জাতির পান, স্বর্ণ-বণিকদিগের পাইন উপাধি আছে।

ইলু জাতি বগুড়া, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার প্রাচীন অধি-বাসী। হিলীর নাম তাহাদের নামানুসারে হইয়াছে। তাহাদের বাসনিবন্ধন বগুড়া এবং ময়মনসিংহের পশ্চিম-দক্ষিণাংশ শীলাবর্ষ নামে উক্ত হইত। এই অঞ্চল এক সময়ে ইলাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

---

* পান্না প্রভৃতিও পহ্লব জাতির বাসস্থান।

† বিয়ানা অঞ্চলও বাণরাজার দেশ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল।

বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যাহারা আল্যানগোত্রীয়, তাহারা এই বংশোদ্ভব।*

বাঁশোয়ার কোচদিগের এক শাখা। এই জাতির নাম হইতে বংশীহারি থানার নাম হইয়াছে। 'বাঁশোয়ার'ই বংশীহর, 'মুষাওর'ই মুষহর, 'যশোয়ার'ই যশোহর; 'বল্লোয়ার'ই বলিহার।

টাঙ্গন নদীর নাম তঙ্গন জাতি হইতে হইয়াছে। দিনাজপুরের উত্তরাংশ এবং কোচবিহার টাঙ্গল ঘোটকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সংস্কৃত গ্রন্থে এই তঙ্গন জাতির উল্লেখ আছে:—

মারুতা ধান্নকাশ্চৈব তঙ্গনাঃ পরতঙ্গনাঃ—ভারত। (৬।৪৭।৪৯)।

এই তঙ্গন জাতি তঙ্ক জাতির এক শাখা। 'টক'ই টেঙ্গা; Stickই ঠেঙ্গা ও ডাঙ্গ; Stickই ডাঙ্গড়ান; 'তুঙ্গ'ই দীর্ঘ, ঢেঙ্গা।‡

তঙ্ক হইতে তঙ্কর, ঠঙ্কর হয়। ঠাকুরগাঁ দিনাজপুরের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তঙ্কর জাতিই টলেমীর ডাকুরৈ (Dakourai)। আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ঠাকুর উপাধি আছে। ইংরাজদিগের Duke উপাধি আছে।

'তঙ্কর' তগর, ডগর। তগর রাজ্যই ত্রিগর্ত্ত। দক্ষিণাত্যেও তগর নামক একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। তঙ্কর জাতির লিপিই তকারি লিপি।

ডগর জাতিই ডোগরা। কৈবর্ত্তদিগের ডোগরা, বাউরীদিগের ধাঁধা উপাধি আছে।

'তঙ্গর'ই ডুঙ্গর, ধাঙ্গড়। 'তুঙ্গ'ই ধিঙ্গি।

'তঙ্গর'ই তঙ্গল। 'তঙ্গল'ই টাঙ্গাল, ডাঙ্গাল ডোঙ্গলা (ডোখলা, ডোগলা)। ডোগলা জাতি কোন কোন গ্রন্থে 'দুর্গলা' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দিনাজপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কম্বোজ জাতির রাজ্য ছিল। এই জাতির বাসস্থান কাম্বোডিয়া (Cambodia)। দেব জাতির পূর্ব্বে এই

---

* আলওয়ার, ইলোরা প্রভৃতি স্থানও ইলা জাতির বাসভূমি।

‡ 'তঙ্কন'ই দক্ষিণ (Deccan)। রাজপুতনার টঙ্ক বা তঙ্ক এই তঙ্কজাতিরই বাসস্থান।

জাতি দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল।

কম, কুর্মি জাতির শাখাই কমত বা কমঠ, কমক, কম্বোজ।*

কমত বা কমঠ জাতির রাজধানীই কামতাপুর। এই জাতির উপাস্য দেবতাই ক্রমদীশ্বর। ইনি জৈন্তীয়া রাজ্যে বিদ্যমান আছেন।

কোহিমা এই কম, কূম জাতির বাসস্থান। ইহা ডিমাপুরের সন্নিহিত। আসামে যে থমতি জাতি আছে, ঐ জাতি এবং কমত জাতি অভিন্ন। নেপালে থম্মু জাতি বিদ্যমান আছে। ক্যাম্বেও এই জাতির নামানুসারে পরিচিত হইয়াছে।

কায়স্থদিগের ক্ষম, ক্ষেম, ক্ষোম উপাধি আছে। কৈবর্ত্তদিগের ঘাম, গোমতা; মালাদিগের কমদ, খামিদ উপাধি আছে। †

কুমারে জাতি হইতে কামরূপ প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে এই কুমার জাতি যে এই অঞ্চলে পরাক্রান্ত ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জাতির উপাস্য দেবতা কামাখ্যা।

এই কম, কুমা জাতিই কুম্মা। কুম্মাই কুম্বী এবং কুণবী।

'কমর'ই কমল। এই জাতির বাসভূমিই কুমিল্লা। এই জাতিই Kymbri (কুমার, কামার, কুম্ভীর)।

'গম্ভীরা' অর্থ নৃত্য. ইং Gambol.

অম্ম জাতির বাসস্থানই আমরি, অমৌরী, অম্বর (Hamburg)। 'অম্ম'ই আমি, হাম।

কায়স্থদিগের ওম, হোম উপাধি আছে। ‡

সম্ম জাতির নাম হইতে সিমলা প্রভৃতির নাম হইয়াছে। এই জাতিই স্বপ্ন। এই জাতি হইতে সোম উপাধি হইয়াছে। §

---

* 'কাম্বোজ'ই কণ + ভুজ (Confucius, Campeachy).

† 'কমত'ই গমত। গোমতী নদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে। 'Coma'ই ঘুম।

‡ 'অম্ম'ই অহম। অহম জাতির অধিষ্ঠিত স্থানই আসাম।

§ Syam, Samax প্রভৃতি স্থানে এই সাম, স্বম জাতির বাস ছিল। ব্রহ্মপুত্রের নাম সম্পু, শম্ভু শন + পু।

জম্ম জাতির নাম হইতে যমুনা নদীর নামকরণ হইয়াছে। এই জাতিই জুমিয়া। এই জাতি হইতেই 'জাম' উপাধি হইয়াছে।

চম্ম বা চম্প জাতির বাসস্থান চম্পাই, চম্পটী।

অম্ম, সম্ম জাতির বাসস্থান রাজপুতানাতেও ছিল। ইহারাই ওমরা, সোমরা অর্থাৎ অম্বর, সম্বর। চম্ম জাতির নাম হইতে চম্বল নদীর নাম হইয়াছে।

হাবড়া আবরজাতির নগর। এই জাতি হইতেই আবড় উপাধি হইয়াছে। এই আবর জাতিই আভীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'অভ্র'ই অম্বর, ইং Heaven; আবর জাতির ভাষাই হিব্রু।

কায়স্থদিগের অপ্প, উপমান (Hoffman) উপাধি দৃষ্ট হয়।

পত, পোত জাতির বাসস্থানই পওনীতলা প্রভৃতি। 'পোদ'ই পদ্মরাজ। এই জাতি হইতেই পদ্মানদীর নাম হইয়াছে।*

পুণ্ড্র জাতিও এই জাতি। তাহাদের রাজ্যই পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পাণ্ডুয়াও তাহাদের রাজধানী। 'পাণ্ডুয়া' ই পাঁড়ুয়া, পেঁড়ো। পাড়ৈয়াই (Pariah) পাণ্ড্য।

পাড়ৈয়াদিগের নগরই পাড়পুর পাহাড়পুর।

'পাণ্ডু'ই পাটল। 'পাতিলাদহ' রঙ্গপুরের একটি পরগণা। পাটলা এই জাতির উপাস্য দেবতা। মালদহে পাটলা দেবীর মন্দির বিদ্যমান ছিল।

কৈবর্ত্তদিগের পটেল উপাধি আছে। 'পটেল'ই পড়েল। 'পাটল'ই পারুল। কৈবর্ত্ত এবং সদ্গোপদিগেব পড়েল, পড়ল উপাধি আছে। 'পাতিল'ই পাত্র (Pot) কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, পোদ প্রভৃতি জাতির পাত্র, পাতর উপাধি আছে।

'পড়েল'ই পড়ের (Parisri) এই জাতিই পরিহার।

---

† পদ্মকোট (পদ্দকোট্টা), পদ্মপুর (পদমপুর) প্রভৃতি স্থানে এই জাতির বাস ছিল। 'পুণ্ডরীক'ই পদ্ম।

পোত্তগর জাতি হইতে Portugalএর নামকরণ হইয়াছে।

পাতন, পাটনও এই জাতির শাখা। পাঠান, প্রধান পাটনিও এই জাতি। পাটনাই পাটলিপুত্র। 'পাঁড়'ই প্রধান।*

'পেতেনিক'ই পট্টনায়েক, পদ্মনাগ। কৈবর্ত্তদিগের পটনায়েক উপাধি আছে।

'পাটক'ই প্যাটেক। 'পাটক'ই পরিঘ, পুরিক। পাটিকা, পাটিকাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বাস ছিল।

পাঠানদিগের ভাষাই 'পুস্তু'। পোন্দ (পোঁদ) পাঁদাড় 'পশ্চাৎ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'পোঁদ'ই Post, posterior, পুষ্ত P. ; back)। 'পিঠা'ই Pastry 'পিটুলী'ই Paste.

পক্ষান্তরে 'পশ্চাৎ'ই পাছা পুচ্ছ। 'পচ্ছাদ' জাতিই পশ্চাৎ, পচ্চাৎ, পকেট্। 'পচ্চাৎ' ই পর্জ্জাদ। 'পর্জ্জাদ'ই পারিজাত, পারিষাৎ। ইহাদের নাম হইতে পারিযাত্রের নামকরণ হইয়াছে। 'পুস্তু'ই Patow.

পুস্তু ভাষার সহিত পালির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা ইউরোপীয় মনীষিবর্গও স্বীকার করিয়াছেন।

বর, ভর জাতির নাম হইতে বড়র বা বরৌর, ভরৌর পরগণা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বর জাতির নগরই বড়নগর।

বরা বা বরাহ জাতিও এই জাতি। 'বরাহ'ই Boar। Borrhoi জাতি এবং বর, ভর অভিন্ন। 'ভর'ই ইং Bear ; 'ভার'ই Burden ; 'ভারবাহী'ই বেহারা (Bearer)। ‡

বর, ভর এবং বহর, বাহার একই। কোচ এবং ভর জাতির বাসস্থানই কোচবিহার। "বাহারবন্দ" ভরজাতির স্মৃতি বহন করিতেছে, ইহা অসম্ভব নহে।

---

* 'পাত্র'ই Plate ; 'চিৎপাত'ই Flat ; নট্ করে E. Flat, Flit। সুতরাং, 'পোদ' এবং পলিতি, পুলিন্দ যে অভিন্ন, তাহাও প্রমাণিত হয়। 'পুলিন্দ' পলি, পাল জাতিরই শাখা। পালিবোথ্রা এবং পাটলিপুত্র যে পাটনা নগর, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। 'পাণ্ডু'ই Pale.

‡ বরাভূম বা বরাহভূমও এই বর, ভর জাতির বাসভূমি।

কৈবর্ত্তদিগের বেরা উপাধি। কুমারদিগের বেহারা উপাধি আছে।

বরিন্দ এই বর, ভর জাতির বাসস্থান। ‘বরিন্দ’ই ভরৌন্দ। ভরৌন্দই ভরোত (ভরস্মৃত অর্থাৎ বরদাবতী) এবং বরদা। ‘বরিন্দ’ দেশই বিরাট। বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ, দিনাজপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশ এবং রঙ্গপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ বিরাট নামে পরিচিত ছিল। কুলগ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বরিন্দ বরদাভূম নামেই কথিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, বরেন্দ্রপুরের নামানুসার বরিন্দের নামকরণ হইয়াছে, এই অনুমান ভিত্তিহীন।

কুসুম্ব পরগণা কুশ জাতির বাসস্থান। এই জাতিই কুশ, খস। ‘কুসুম্ব’ই কোশাম্ব, কোশম। ‘কুশল’ই খোস খবর, খুস হাল। ‘খসখসে’ই Coarse.

কোচ্ জাতিও এই কুশ এবং খস জাতি। ‘কচ্ছু’ই খোস। ‘কোচ’ই কছোয়া বা কচ্ছপ (কশ্যপ)। কচ্ছপ্রদেশও তাহাদের বাসস্থান ছিল। কছোয়া জাতি আপনাদিগকে কুশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহারা কুশ জাতি হইতে উদ্ভূত।

কায়স্থদিগের কচু উপাধি আছে। কামারদিগের গছু গাছু উপাধি আছে।

রঙ্গপুরের মুসলমানগণ অদ্যাপি ‘কস্য’ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকে।

দিনাজপুর এবং বগুড়া অঞ্চলে নন্দ প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতির বাস ছিল। সকল জাতির উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চলেই বহুসংখ্যক প্রাচীন জাতির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু রাষ্ট্রতত্ত্ব।

কোন কোন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতত্ত্ববিদের বিশ্বাস যে, হিন্দুরা রাজ্যশাসনে বিশেষ পটু নহে এবং ইংরেজ-শাসন ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজের ভারতাধিকার যে বিধিনির্দ্দিষ্ট, তাহা অবশ্য অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু-শাসন-প্রণালী অপকৃষ্ট হইবেই, এমন কি কথা আছে! অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে তাহা সম্যক্ বিকশিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই কি বুঝিতে হইবে যে, হিন্দুরা রাজ্যশাসনে অপটু! কোন্ বিপ্লবের দিনে শাসন-চক্র প্রবল থাকিতে পারিয়াছে? যদি বিপ্লবের দিনের বিশৃঙ্খলা দেখিয়াই শাসন-পটুত্বের বিচার করিতে হয়, তবে য়ুরোপের কোন রাজশক্তিই এই পটুত্বের দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে বিপ্লবের দিনের শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলাই বিচারের মান বা কষ্টি বলিয়া গৃহীত হইবে না। সহজ অবস্থায় তাহা সফল হইয়াছিল কি না সম্যক্ জানিতে পারিলেই তাহার যাথার্থ বিচার সম্ভব। এই বিচারের সাহায্য করিবার জন্য আমরা মনুসংহিতা হইতে হিন্দু-রাষ্ট্রতন্ত্রের কয়েকটি মূল কথার সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতঃপর অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও হিন্দুরাষ্ট্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা পাইব। আমাদের এই সঙ্কলন যদি একান্ত নির্দ্দোষ নাও হয়, তথাপি তাহা হইতে ভারতীয় রাজতন্ত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।

রাজশক্তি।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজা কয়েকটি বিশিষ্ট দেবতার সারভূত অংশ হইতে সৃষ্ট। সেই সকল দেবতা দিক্‌পাল বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এইরূপ কল্পনার তাৎপর্য্য এই যে, সেই দিক্‌পালবর্গ যে যে গুণে বিখ্যাত, সেই সকল গুণ রাজাতেও বর্ত্তমান আছে। কারণ সেই গুণগুলির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে রাজশক্তি কোনক্রমেই রাষ্ট্রত্ব অক্ষুণ্ণ

রাখিতে পারেন না, ছিদ্রান্বেষী বৈদেশিক কোন রাষ্ট্র অচিরেই কোন এক ছিদ্র ধরিয়া তাহার উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসেন। কাজেই অষ্ট দিক্‌পালের ন্যায় রাজাকে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সকল দিক্ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়।

রাজাকে এত দিক্ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইত বলিয়া তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হইতেন; কিন্তু যথেচ্ছাচারে তাঁহার ক্ষমতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। বরং দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ের মোহ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন। আর বাস্তবিক শাস্ত্রশাসন মানিতে তিনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন। নিজের জীবনকে হিন্দুর আদর্শ-অনুসারে গঠন করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। জনহিতব্রত ঋষিদিগের এবং স্বকর্ম্মপটু মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাগ্রহণে সঙ্কুচিত হইবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার এই সর্ব্বশক্তিমত্তা কেবল তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনেই সত্য ছিল; ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি বরং নানা ভাবের ও নানা শক্তির অধীন ছিলেন। কিন্তু সকল রাজাই যে একথা সকল সময় বুঝিতেন অথবা বুঝিয়াও চলিতেন, এমন মনে হয় না। বেণ ও নিমি প্রভৃতি রাজারা রাষ্ট্রীয় কার্য্যের বাহিরে এই সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতে যাইয়াই নিজেদের বিলাসকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, রাজা রাষ্ট্রীয় পদ-গৌরবের জন্য যে শক্তির পরিচালনা করিতে পারিতেন, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যে শক্তি-প্রয়োগের তিনি কিছু-মাত্র অধিকারী ছিলেন না।

বাস্তবিক হিন্দুরা রাজাকে দেবতা-স্বরূপ মনে করিলেও, তাঁহার যথেচ্ছা-চারিত্ব কখনও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্যই তাঁহারা বলিতেন, রাজ-দণ্ডই প্রকৃত রাজা; যিনি সেই দণ্ড ধারণ করেন, তিনি সেই দণ্ড-প্রভাবেই রাজপদ ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হন। হিন্দুরাষ্ট্রতত্ত্ববিদেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন—

সরাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥ ৭।১৭

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধা ॥ ৭।১৮
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭।২৭
দণ্ডো হি সুমহৎ তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ৭।২৮

প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসন-কর্ত্তা ; এবং দণ্ডই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিভূ বলিয়া স্বীকৃত। দণ্ডই প্রজা-দিগকে শাসন করেন, দণ্ডই তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সকলে নিদ্রিত হয় বটে, কিন্তু দণ্ড চিরকাল জাগিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন। রাজা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দণ্ড বিধান করিলে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গেরই বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু রাজা কামাত্মা, বিষম ও নীচ-প্রকৃতি হইলে দণ্ড কর্ত্তৃক নিহত হন। দণ্ডই সুমহৎ তেজঃস্বরূপ, তাহা অকৃতাত্মা রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইবার নহে, কারণ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবা-মাত্রই রাজা সবান্ধবে দণ্ডকর্ত্তৃক নিহত হন। আবার—

শুচিনা সত্যসন্ধেন যথা শাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৭।৩১
এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ৭।৩৩

পবিত্র-প্রকৃতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যথাশাস্ত্রানুসারী ও বুদ্ধিমান্ রাজা সুলোকের সাহায্যে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। এরূপ গুণবান্ রাজা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও তাঁহার যশঃ জলস্থিত তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বহু বিস্তার লাভ করে।

রাজার মহত্ত্ব যে রাজদণ্ড-প্রভাব-জাত এবং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা যে কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, তাহা এই বাক্যগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আরও জানা যাইতেছে, যতক্ষণ তিনি এই দণ্ডের সম্মান রক্ষা করিতেন, ততক্ষণ তিনি সকলের মান্য থাকিতেন এবং যেমনি তিনি ইহার অবমাননা করিতে প্রস্তুত হইতেন, অমনি রাজদণ্ড আপনিই তাঁহার

হাত হইতে খসিয়া পড়িত, এবং তাঁহার রাজপদের গৌরব করিবার অধিকার-টুকুও সেই সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যাইত। রাজা যতক্ষণ রাজার কাজ করিতেন, ততক্ষণই তিনি ঠিক রাজা। রাজার কায কি? দেশের অরাজকতা দূর করিয়া প্রজাগণের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করা এবং তাহাদের ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখা। ইহাই রাজার প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে রাজা সে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম মানেন না, তিনি কোন্ অধিকারে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার দাবী করিবেন? কাজেই তখন দণ্ড তাঁহাকে দণ্ড বিধান করিয়া রাজপদের গৌরব রক্ষা করেন।

রাজদণ্ড ব্রতচ্যুত রাজাকে দণ্ড দিয়া থাকেন, এই কথায় কি প্রজাবর্গের অসীম রাষ্ট্রীয়শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? প্রজাশক্তিই কি এই দণ্ড বিধান করেন না? যদি প্রজাশক্তিই এই দণ্ডের বিধান না করেন, তবে কে সেই দণ্ডকর্ত্তা? মন্ত্রিগণ? তাহাই যদি হয়, তাঁহারা কি প্রজাশক্তির পরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত এরূপ দণ্ডবিধান করিতে পারেন? যদি হিন্দু প্রজাশক্তি নিতান্ত নির্জ্জীবই হইবেন, তবে পুরাণে যতগুলি হিন্দু রাজার বৃত্তান্ত শুনা যায়, তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রজা-মত মানিবার জন্য অত ব্যস্ত ছিলেন কেন? দুর্য্যোধনের মত রাজাকেও প্রজামত মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যদিও হিন্দু প্রজাশক্তি সাধারণতঃ আপনার শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তত ব্যস্ত ছিলেন না, তথাপি প্রকৃত রাজশক্তি তাঁহাদিগের মধ্যেই নিহিত ছিল, আর সে কথা হিন্দুরাষ্ট্র-তত্ত্ববিদেরা ও রাজনীতিকেরা স্বীকার করিতেন।

প্রজাশক্তির এরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল বলিয়াই রাজা মন্ত্রীদের সাহায্য লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এজন্য যতগুলি মন্ত্রীর প্রয়োজন, তাঁহাকে ততগুলি মন্ত্রীই নিযুক্ত করিতে হইত। যখন তিনি এইরূপে মন্ত্রিগণের সাহায্য লইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পালন করিতেন, তখন তিনি মানুষরূপে সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি বালক, তাহার বিচার চলিত না; তখন তাঁহার আদেশ সকলকে বেদবাক্যের মত গ্রাহ্য করিতে হইত। যে কেহ সে আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইত, সেই রাজদ্রোহী বলিয়া ধৃত ও দণ্ডিত হইত। এমন কি রাজসহোদর বা রাজপুত্র পর্য্যন্ত এই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞান ও ভক্তি।

অন্নপূর্ণা মা আমার! আজিকে বিদায়,
জননী গো লহ তব কেয়ূর, কুণ্ডল,
মণিহার। এ সন্তান আজি মুক্তি চায়,
তুলে লও দেহ হ'তে অঞ্চল কোমল।
পেয়েছি পিতার ডাক সব তুচ্ছ গণি ;
সোণার সংসারে তব স্বর্ণ-সুখজাল,
মিটাতে প্রাণের ক্ষুধা পারে না, জননি!
করিয়া রেখেছে তাই আদুরে দুলাল।
পুত্র ল'বে পিতৃমন্ত্র, পিতার চরণে,
তার শিক্ষা, সিদ্ধি, মুক্তি। মাতৃ-অন্তঃপুরে
চিরকাল মায়াজালে রহিবে কেমনে
ভোগে চির মগ্ন হ'য়ে, যোগ হ'তে দূরে ?
তোমারি সংসার ল'য়ে রহ স্নেহময়ী
চলিনু শ্মশানে যথা পিতা সর্ব্বজয়ী।

উহু কি ভীষণ মাগো এযে গো শ্মশান,
চারিদিকে নাচে প্রেত মৃতের কঙ্কাল,
অট্টহাসি, বাজে শুধু মরণ-বিষাণ,
পিতৃ-অনুচরগণ—ভীষণ ভয়াল।
এই কি সিদ্ধির স্থান ? হবে না সাধনা,
লও মা ডাকিয়া আজি চরণে তোমার,
তব স্বর্ণ-থালি হ'তে লয়ে স্নেহকণা
বিলা'ব দুখীরে ফিরে দাও কার্য্যভার,
তাপিতে ধরিব বুকে, বল দিব ক্ষীণে,
আতুর সন্তানদলে, রব নিত্য কাজে,
রব চির পদপ্রান্তে, কোল দিব হীনে,
লভিব মঙ্গল-মুক্তি শতবন্ধ-মাঝে।
তব পুণ্য-গৃহতলে ডাক স্নেহময়ী
চাহিনে শ্মশানে গিয়ে হ'তে সর্ব্বজয়ী।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরিচয়।*

সে আজ আট বৎসরের কথা,—আমি 'কান্ত' কবি রজনীকান্তের প্রথম রচনা 'বাণী' পাঠ করি, আর পাঠান্তে সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবের কণ্ঠে 'বাণী'র গানগুলি শ্রবণ করিয়া পুলক-বিহ্বল হইয়া উঠি। তাহার ঠিক এক বৎসর পরে, পত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়, তখন তাঁহাকে দেখি নাই; শুধু তাঁহার গান শুনিয়াছি ও পুস্তক পড়িয়াছি। তার পর ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে তাঁহাকে প্রথম দেখি। দীনেশবাবু তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন— "ইনিই রাজসাহীর কান্ত কবি"। পরিহাসপ্রিয় রসিক কবি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"রাজসাহীর সকলের নয়, তবে একজনের বটে।" প্রথমালাপের সূত্রপাত এই।

রজনীবাবু একটা হার্ম্মোনিয়াম্ লইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি যে একজন সুগায়ক, ইহার পূর্ব্বে আমি তাহা আদৌ জানিতাম না। কারণ জানিবার সে প্রকার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তখন জানিতাম না যে, 'বাণীর' কবি সপ্তসুর-বাঁধা বীণা লইয়া গভীর ওঙ্কারপূর্ণ সামঝঙ্কারে দূরবিমান কাঁপাইয়া তুলিতেন, শুভ্রকমলাসীনা বাগ্দেবীর চরণ-কমলে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার অমৃতোপম সঙ্গীতলহরী মূর্ত্তিমতী রাগরাগিণীর সৃষ্টি করিত; তখন বুঝি নাই যে, তাঁহার কণ্ঠামৃত-পানে হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুরলী-রব-পূরিত বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জের, নয়ন-মনোহর ভুবনমোহন ছবি ফুটিয়া উঠে, হরিনাম-বিভোর ভক্তকুল-চূড়ামণি নারদের ত্রিলোক-মনোরম ভগবান-টলানো সেই মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ হরিনাম-গান-শ্রবণে প্রাণ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। সঙ্গীতারম্ভে তাহা বুঝিলাম, অন্তঃকর্ণের সহিত বহিঃকর্ণের সংযোগ সাধিত হইল। প্রথমেই কবি গান ধরিলেন :—

---

* লেখক ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে "কান্তকবি রজনীকান্ত" সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই একাংশ।

'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছা'য়ে;
তব পূণ্যকিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।'

পূর্ব্ব হইতেই গানটীর সহিত পরিচিত ছিলাম, দু' একজন সুকণ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের কণ্ঠে ইহা বহুবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কবির নিজের কণ্ঠে যেমন শুনিলাম, তাহাতে আবদ্ধ নয়নের বন্ধন খুলিয়া গেল। হৃদয়ের মলিনান্ধকার দূরীভূত হইয়া চিদালোকে সমস্ত হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। "গানাৎ পরতর নহি" যে কেন তাহা বুঝিলাম, আর বুঝিলাম,—গাহিবার মতন হৃদয় ঢালিয়া গাহিতে পারিলে সঙ্গীত জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাই বুঝি শ্রীনিবাসের চরণ-কমল হইতে পতিতপাবনী কলুষহরা জাহ্নবীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাই বুঝি সঙ্গীত-শ্রবণে একদিন নদীয়ার মহাপাপী জগাই-মাধাইয়ের পাষাণ-প্রাণে ভক্তির অমৃতধারা পূর্ণবেগে বহমান হইয়াছিল।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অমৃত-বর্ষণের পর রজনীবাবু ক্ষান্ত হইলেন; সম্ভাষণান্তে তখনকার মত আমিও বিদায় লইলাম।

পরদিন ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবারে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নব গৃহ-প্রবেশ দিনে—বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনার শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার মঙ্গল বাসরে রজনীকান্ত "সৃষ্টির বিশালতা" ও "সৃষ্টির সূক্ষ্মত্ব" নামক দুইখানি গান গাহিয়া সমবেত জনশ্রেণীকে মুগ্ধ করিলেন। বাঙ্গালীর বাণী-দেউল-স্থাপনার সেই শুভক্ষণে আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে তিনি একটী কথা বলিয়াছিলেন। তাহা এই—"এতদিনে বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটা মন্দির তৈরী হ'ল, এখন দেবী-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার আয়োজন করান।" আমি ব'লিলাম,—"যেখানে আপনাদের মত অকপট বাণী-সেবকগণের শুভাগমন হইয়াছে; সেখানে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

১৩১৫ সালের ১৬ই মাঘ রবিবার রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষে সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও পরিষৎ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমরা প্রতিনিধিরূপে

রাজসাহীতে গমন করি। শনিবার মধ্যাহ্নে সেখানে গিয়া উপস্থিত হই। রবিবার প্রাতে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রজনীকান্ত আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তিনি আমাকে তাঁহার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

বেলা প্রায় ১২টার সময় সভাভঙ্গ হইল। রজনীকান্তের বাড়ী চিনি না। লোক-সমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, এমন সময়ে তিনি স্বয়ং আসিয়াই উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বন্ধু মালদহের সুপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ ও আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ভবনে গমন করিলেন।

তাঁহার সেদিনকার আদর-আপ্যায়ন ও যত্নের কথা আমি আমরণ ভুলিতে পারিব না। সে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ সরল ব্যবহার সেদিন পাইয়াছি, তাহা জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছে। রাজসাহীতে সমাগত মনস্বী ও সুধীবর্গের মধ্য হইতে আমার ন্যায় নগণ্য সাহিত্য-ভক্তকে লইয়া গিয়া তিনি যে মধুর আদর ও যত্নে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আপনাদের সমক্ষে ব্যক্ত করিতে আমি শ্লাঘাবোধ করিতেছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা—কবিহৃদয়ের একটা পরিচয় জানাইতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই ঘটনায় আমার চক্ষু-সম্মুখে তাঁহার হৃদয়ের একটা দিক বেশ উজ্জলভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠিল—সেটা সাম্যভাব। যিনি বড় ও ছোটকে, ধনী ও নির্ধনকে, পণ্ডিত ও মূর্খকে, গুণী ও গুণহীনকে সমান চক্ষে দেখিয়া সমানভাবে হৃদয়ের প্রীতিরাশি দিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারেন, তিনি আমাদের কৃত্রিমতাবহুল লোকসমাজে খাঁটি মানুষ। তাঁহার স্নেহ ও যত্ন, আদর-অভ্যর্থনা এমন আন্তরিকতাময়, এমন সরল যে, তাহা আত্মার উপভোগ্য, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। নিজে কাছে বসাইয়া যত্ন করিয়া আহার করানো, স্নেহময়ী জননীর মত কোলের কাছে আহার্য্য বস্তুগুলি আগাইয়া দিয়া 'ওটা খান' 'এটা খান' বলিয়া সেই যে অনুরোধ-নির্ব্বন্ধ, তার পর আহারান্তে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া নিজের রচিত গান শোনানো,—আজ যেন এক এক করিয়া সব চোখের

সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশ ও কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের কমকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে লাগিলাম। তার পর কত হাস্য-পরিহাস, নানাবিষয়িণী কত আলোচনা দ্বারা গৃহ-সমাগত বন্ধু-হৃদয়ে আনন্দধারা ঢালিয়া দিলেন। এ সকল কথা যিনি রজনীকান্তের সহিত অন্যূন দুই তিন ঘণ্টাকাল মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। সর্ব্বশেষে এক অপূর্ব্ব উপাদেয় জিনিষ তিনি আমাকে দেখাইলেন—তদীয় পিতা ৺গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়-প্রণীত "পদ-চিন্তামণিমালা"। ইহা ব্রজভাষায় রচিত কীর্ত্তনসঙ্গীতের অপূর্ব্ব-সমষ্টি।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকাগারে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য একটী সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন হয়। সেখানেও রজনীকান্ত। তাঁহার হাসির গান, স্বদেশ-সঙ্গীত ও রহস্যাবৃত্তি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার উপর সুধাকণ্ঠ পুত্র-কন্যাদ্বয়ের গানের ঝঙ্কার সমাগত জনসঙ্ঘের হৃদয় সুধাধারায় স্নাত করিয়া দিল।

পরদিন অধিবেশন-সমাপ্তির পূর্ব্বে যখন রজনীকান্ত বিদায়-গান আরম্ভ করিলেন, যখন তাঁহার এই গীত—

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাথা,
(এই) ভাঙ্গাবীণায় কি সুর দিলে!

দুঃখ-দৈন্য ভুলেছিলাম,
ডু'বে আনন্দ-সলিলে;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।

(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে;
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দু'হাতে জ্ঞান বিলাইলে!

(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে, ভেবেছিলে ?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে !

তন্ময় হইয়া শুনিলাম, তখন দশমীর দিনে প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে গৃহ-প্রত্যাগত-বাদকের শানাইয়ের করুণ রাগিণী যেন হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

অপরাহ্নে কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে বিদায়-অভিনন্দন লইবার সময়ে রজনীকান্ত আবার সঙ্গীত-সুধা-বিতরণে আমাদের পরিতৃপ্ত করিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, হার্ম্মোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া রজনীকান্ত অক্লান্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, কুমার বাহাদুরের গাড়ী দ্বারের কাছে আমাদের ষ্টেসনে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপাস্থত হইল, তখন রজনীকান্ত পুনরায় তাঁহার সেই প্রাণ-ব্যাকুল-করা বিদায়ী গান গাহিয়া আমাদের প্রাণে বিষাদ-ধারা ঢালিয়া দিলেন।

বিদায় লইলাম, গাড়ীতে উঠিলাম, কিন্তু প্রাণটুকু রজনীকান্তের কাছেই ফেলিয়া আসিলাম। জ্যোৎস্না-বিধৌত দীর্ঘ নাটোর যাইবার সমস্ত পথটায় কেবলই মনে হইতে লাগিল—রজনীকান্তের কথা। একজন লোক যে এমন করিয়া নানামূর্ত্তিতে এত আনন্দ দিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বুঝি নাই,—একজন লোকের ভিতর একাধারে কবি, সুগায়ক ও কর্ম্মবীরের ত্রিমূর্ত্তি পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে—সে চরিত্র পূর্ব্বে দেখি নাই।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

পাষাণী।*

(কিটসের অনুকরণে)।

"কে তুমি পথিক আজিকে হেথায়
নির্জ্জন বনে ভ্রমিছ একা ;
প্রলয়-শঙ্খ মেঘে ঐ বাজে ;
বাদল ঐ যে দিয়েছে দেখা।

শ্রান্তি-বিবশ নয়ন-কমল
পাণ্ডুর রক্ত-কপোল দু'টি,
হুঙ্কারে ঘোর বহিছে পবন
বনস্পতি ওই পড়িছে লুটি'।

ক্লান্তি-রেখাতে ভরেছে কপাল
শীর্ণ বীরের পূর্ণ দেহ,
অশনি পড়িছে এ হেন সময়ে
কাননে কখন ভ্রমে কি কেহ!"

"সন্ধ্যার শান্ত ধূসর ছায়ায়
যুবতী এক দি'ছিল দেখা,—
স্বর্ণ-কিরণে ললাটে তাহার
উঠেছিল ফুটি জ্যোতির রেখা।

ঊর্ম্মি-সমান কুঞ্চিত কেশ
পড়েছিল চুমি' চরণতল,
ভ্রমর-সমান চঞ্চল তারা
সাজায়েছে আঁখি-কমলদল।

---

* La belle dome Sons merci—Keats.

কত না কুসুম তুলিয়া যতনে
দেছিনু বাঁধিয়া কবরী রে,
কটিদেশে তার কুসুম-মেখলা
দেছিনু যতনে আবরি রে।

বাঁধি ছুটি করে কুসুম-কঙ্কণ
তুলিয়া লইনু অশ্বের পরে,
ভাষাহীন কত প্রণয়ের কথা
মুখ হ'তে তার পড়িল ঝরে।

ছুটিল অশ্ব, কানন প্রান্তর
অতীতের মত রহিল পিছে ;
ভুলে গেনু সব, মনে হল যেন
সেই বিনা এই জগত মিছে।

স্বপনের মত সঙ্গীত তাহার
অধরে তাহার বিলোল হাসি,
আধ ভাঙ্গা সুরে সে বলিল মোরে—
"ভালবাস প্রিয় ?" "ভাল যে বাসি।"

উতরিনু দোঁহে আবাসে তাহার
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে ;
পালঙ্কে প্রবাল হীরক-কণিকা
জ্বলিছে ধাঁধিয়া চক্ষে।

টানিয়া লইনু দেহ-লতাখানি
ভুজের প্রণয়-বন্ধে ;
মলয় মারুত বহে গেল ধীরে
ছড়া'য়ে কুসুম-গন্ধে।

নয়ন পল্লব মুদে এল তার
চুম্বন ঘন পরশে ;
দুরু দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয়
প্রাণের নবীন হরষে।

টুটে গেল সব বেদনা-বন্ধ
লুপ্ত চেতনা পরাণে,—
সুপ্তি আসিয়া লয়ে গেল শেষে
মধুর মোহন মরণে।

স্বপ্নে হেরিনু শেষ স্বপ্ন সেই—
কত না হৃদয় দীর্ণ,—
রাজার কুমার বীরবর কত
ক্ষীণ শশীসম শীর্ণ।

তাদের মাঝারে ছায়ার মতন
যেন কে বলিল মোরে,—
'পাষাণ-হৃদয়া পাষাণীকে আজি
ধরিয়া এনেছে জোরে।'

ঘুমঘোর ভাঙ্গি জাগিয়া দেখিনু
সেই সে রজনী-প্রভাতে,
পড়ে আছি দূর প্রান্তর-মাঝে
অরুণ-কিরণ-শোভাতে।

সে অবধি আমি কাননে কাননে
নিশিদিন ধরে ভ্রমিছি একা,—
প্রলয়-শঙ্খ যদিও বাজিছে—
বাদল যদিও দিয়েছে দেখা।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

পুস্তক-পরিচয়।

আলেখ্য।*

বইখানি নানাফুলের সাজি—কোনটী ভ্রমণকাহিনী, কোনটী পল্লীচিত্র এবং কোনটী বা চরিত্র-চিত্র।

"আলেখ্যে"র চিত্রকর অঙ্কন-শিল্পে সুনিপুণ। তাঁহার আঁকা রঙ্গীন চিত্রগুলি অবিকল স্বভাবানুসারী। ভাব সর্ব্বত্র জমাট্ অথচ জড়সড় নয়। বর্ণনা বেশ ঝর্‌ঝরে অথচ একঘেয়ে নয়। পরন্তু, যেখানটিতে যেমন রং-ফলান দরকার—ঠিক তেমনটি হইয়াছে।

এ ধরণের বই লেখা, যার-তার সাজে না। নিজে দেখা এক কথা। পরকে দেখান আর এক কথা। ধর আমি সাগরতটে গিয়াছি। সেই দিগন্তচুম্বী নীলাম্বুবিস্তার—সেই লীলায়িত উর্ম্মির নর্ত্তনটন, সব চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখিতেছি এবং ধারণা করিতে পারিতেছি; কিন্তু তুমি কখনও তাহা দেখ নাই, সুতরাং সে স্বর্গসৌন্দর্য্যের ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ আমার কাজ, আমি তোমাকে সব দেখাইব। আমার চিত্তপটের ছবি ভাষা-ফলকে তুলিব। যদি পারি, তবেই তুমি দেখিতে পাইবে; না পারি, সব পণ্ডশ্রম। ছোটখাটো খুঁটিনাটিগুলিও প্রকৃত চিত্রকরের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সে দিকে খুব অবহিত। আমরা সাদাসিদার রূপ দেখিতে জানি না। যোগ্যের নৈপুণ্যগুণে নেহাইৎ যাহা সামান্য—তাহা অসামান্য, যাহা আটপৌরে—তাহা পোষাকী হইয়া দাঁড়ায়। আনন্দের কথা, "আলেখ্যে"র লেখক সামান্যকে সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার দেখিবার ও দেখাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

গ্রন্থকারের রসগ্রাহিতা ও রসসৃষ্টির শক্তিও বড় অল্প নয়। তিনি আনন্দের দেওয়ালী সাজাইয়াছেন—তাহার সর্ব্বত্র রসের ফুলঝুরি ঝরিতেছে, হাসির তুবড়ী ফুটিতেছে এবং 'দেওয়ালী'র এই সমুজ্জ্বল আলোক-মালার মাঝে কারুণ্যের স্নিগ্ধ দীপ-রশ্মিরেখাও বিরল নহে।

আন্তরিকতা রচনার প্রাণ। আজকাল লেখা পড়ি অনেকের,—কিন্তু তথাকথিত রচনা-রাজির ভিতরে রচয়িতার প্রাণের সাড়া পাই না। কিন্তু 'আলেখ্যে'র লেখা, প্রাণের লেখা,—তাহা আন্তরিকতার আকর,—কাজেই উহা সুখপাঠ্য ও প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে।

লেখক কলমের কালোয়াৎ। তাঁহার ভাষা বড় আশাময়ী—যেমন সরল, তেমনি তরল। তাহা ঝরণার মত ঝরিয়া পড়ে, ফোয়ারার মত নাচিয়া উঠে, পাপিয়ার মত গাইয়া যায়।

আমরা 'আলেখ্যে'র সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়াছি। তবে পুস্তক-মধ্যগত 'মন্দির-বাসিনী' সম্বন্ধে আমাদের একটু আপত্তি আছে। কারণ, লক্ষণ দেখিয়া উহাকে চিত্র-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অতএব 'আলেখ্য' হইতে ইহাকে সরাইয়া রাখিলেই ভালই হইত।

বইখানির সুবর্ণরেণু-সুন্দর মূল্যবান প্রচ্ছাদনী এবং সুমুদ্রিত হাফ্‌টোন্ ছবিগুলিও চমৎকার।

"আলেখ্য" রূপে নিখুঁত, গুণে ভরপুর।

---

* শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম-এ, প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং; ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য।*

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের বিরুদ্ধে এক অতি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মাইকেল-বঙ্কিম-হেম-নবীন প্রভৃতি ইংরাজি-নবীশগণ কর্ত্তৃক যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা "অনুচিকীর্ষায় সাহিত্য-প্রতিযোগিতার সাহিত্য মাত্র। উহার সহিত বাঙ্গালীর প্রকৃতির তেমন সম্বন্ধ নাই; উহার ভাষা ও ভাব তেমন প্রচলিত নহে। উহা ইংরাজের সহিত পাল্লা দিবার মানসে রচিত হইয়াছে; উহা ইংরেজী ও ইউরোপীয় ভাবকে বাঙ্গলা দেশে আনিবার পয়ঃপ্রণালী মাত্র। তাই ইংরেজী শিক্ষিত সমাজেই উহার একটু আধটু প্রচার আছে, বিশাল বাঙ্গালী-সমাজ উহার পরিচয় রাখে না।" খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য কি তাহা জানিতে হইলে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেকার বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। কৃত্তিবাস, কাশীদাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিকুল এখনও বাঙ্গালীর কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন; কারণ তাঁহারা যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গালির ধাতে গড়া। কিন্তু বঙ্কিমাদি ইংরেজী-নবীশগণের গ্রন্থগুলির প্রতি ইহার মধ্যেই লোকে অনাদর দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ এ সমস্তই ঝুটা মাল। মেকী জিনিষের আদর কতদিন থাকে?

এই অভিযোগ কতদূর সত্য, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জাতীয় সাহিত্য কি এবং কোন্‌টা বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য ও কোন্‌টা নয়, তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই এই প্রশ্নের অনেকটা সমাধান করিয়া দিবে। 'সহিত' হইতে যে 'সাহিত্য' উৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ

---

* এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বিগত আশ্বিনের 'অর্ঘ্যে' "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।—সম্পাদক।

নাই। কিন্তু এই 'সহিত' শব্দ যে একটা সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা কিসের সাহচর্য্য? রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সুধীগণ বলেন যে, সাহিত্য জাতীয় জীবনের সহগামী;—জাতীয় জীবন যে দিকে যে ভাবে চলিতে থাকে, সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিও তদনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। জাতির প্রত্যেক স্পন্দন তাহার সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে যে শুধু সাময়িক সজীবতা প্রদান করে তাহা নহে, পরন্তু তাহা ঐরূপ জাতির জীবনপথের এক বিশেষ সময়ের একটা চিরস্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া যায়। তাই সাহিত্যের ন্যায় অতীত ইতিহাসের উপকরণ বুঝি বড় বেশী নাই। সুতরাং জাতির 'সহিত' এই অবিচ্ছেদ্য, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধই সাহিত্যের গোড়ার কথা অথবা বিশেষার্থ কেহ কেহ আবার বলেন যে, অনেকের 'সহিত' যাহা একত্রে পাঠ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহার ভাব ও ভাষা শুধু ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের বোধগম্য না হইয়া একটি সমগ্র জাতিকে জ্ঞান ও আনন্দ দান করে, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্যের এই সংজ্ঞাটি আপাত-দর্শনে প্রথমোক্তটি হইতে বিভিন্ন মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ দু'য়ে বিশেষ বিভিন্নতা কিছুই নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা প্রথম অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা তাহার আর একটা দিক মাত্র। কারণ যে ভাব একটি সমগ্র জাতির আনন্দবিধান করিতে সমর্থ, তাহা নিশ্চয়ই সমসাময়িক জাতীয় জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনু-প্রবিষ্ট। কিন্তু একটা সজীব জাতি যেমন একই স্থানে এক ভাবে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, তাহার অল্প বিস্তর, দ্রুত মন্থর পরিবর্ত্তন অবশ্য-ম্ভাবী, জাতীয় ভাবও তেমনি। প্রতিযুগের পরিবর্ত্তন সাহিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন আকার দান করে। এক যুগে যাহা লোকের চিত্তরঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে চাহে না। কত নূতন জ্ঞান, অভিনব তত্ত্ব, উদ্দীপনাপূর্ণ আন্দোলন মানব-সমাজকে প্রতিনিয়ত আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করিতেছে; চিন্তা, ভাব ও আদর্শেরও কি সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে না? সুতরাং যাহা কোন-এক যুগে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া জাতির আনন্দ-বিধানে সমর্থ, তাহা সেই বিশেষ যুগের বিশেষ ভাব।)

অতএব আমরা যেদিক দিয়াই দেখি, এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সাহিত্য জাতীয় জীবন, সমসাময়িক জ্ঞান বা দেশের রাজনীতিক অবস্থার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। যুগবিশেষের বিক্ষিপ্ত ভাবরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া সাহিত্যের আকার ধারণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া যে লেখক ও কবিগণ সকলে একই কথা বলেন, তাহা নহে। একই সূর্য্যমণ্ডল-নিঃসৃত আলোকধারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড মেঘে সংহত হইয়া নানা বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করে, সেইরূপ একই কারণ-সঞ্জাত ভাবরাশি বিভিন্ন লেখকের মানসাকাশে প্রতিফলিত হইয়া নানা প্রকারের সাহিত্য-সৃষ্টির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। আর এই সাহিত্য কোন এক যুগের বিশেষরূপে উপযোগী বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সকল যুগের মনুষ্যের মধ্যে যেমন একটা সাদৃশ্যের মূল সূত্র বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভাব, চিন্তা ও আদর্শ-সম্বন্ধে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইলেও, তাহার অন্তরালে এমন একটা যোগের সূত্র থাকে, যাহা তাহাকে সর্ব্বকালোপযোগিতা দান করে। বর্ত্তমান অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের কারণ। সুতরাং অতীত যুগের সাহিত্যের উপর দাঁড়াইয়াই বর্ত্তমান সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হয়।

দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ, তাহা দেখাইবার জন্য ইংরাজী সাহিত্যের একটু আলোচনা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যখনই ঐ জাতির জীবন-স্রোতঃ খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছে, তখনই বিভিন্নমুখ উদ্যম ও উদ্দীপন স্ব স্ব ভাবরাশি লইয়া সাহিত্যে এরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, তত্তৎ সময়ের সাহিত্য আয়তনে, 'বহুমুখীনতা'য় ও ভাবসম্পদে অতুলনীয় হইয়াছে। ইংরাজদের আদি কবি চসারের মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর উহাদের মধ্যে কোন প্রতিভাবান্ কবি বা লেখক জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে; ঐ সময়ে ইংরাজ জাতি শান্তিসুখে বঞ্চিত ছিল; তাহাদের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আন্তর্জ্জনীন যুদ্ধে (Wars of the Roses) নিয়োজিত ছিল। তারপর রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকাল ইংলণ্ডের একটি গৌরবান্বিত যুগ

এবং এই যুগেই সেক্সপীয়র, বেকন প্রভৃতি মহাকবি ও মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইংরাজী সাহিত্য মহোচ্চশিখরে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ঘোর নীতিহীনতা ও কদর্য্য স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ইংরাজ সমাজ একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ফলে, সে সময়কার ইংরাজি সাহিত্য এমনই দুর্নীতি-মূলক যে, এখন আমরা তাহা পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠি। কিন্তু সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এই ভীষণ দুর্নীতির যুগেও মিল্‌টনের ন্যায় এমন এক মহাকবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার কাব্যের মূলমন্ত্র ছিল, ধর্ম্ম ও নীতি। ইঁহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। স্ব স্ব যুগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে, তাঁহাদিগকে কোন যুগবিশেষের কবি বা লেখক বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যের জাতীয় জীবনানুবর্ত্তিতা-রূপ সাধারণ নিয়মের কোন ব্যত্যয় হইতেছে না। দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর শতাধিক বৎসর ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যেরূপ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত ছিল, তাহার সাহিত্যও সেইরূপ দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব ছিল। তার পর ফরাসী বিপ্লবে যখন সমস্ত য়ুরোপীয় সমাজে একটা বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইল, তখন এই নূতন ভাববন্যা একদিকে যেমন ইংরাজের জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল, অপরদিকে তেমনই আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যকে অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত করিলেন। এইসকল কবি যে ফরাসী বিপ্লবেরই ফল তাহা বলিতেছি না; তবে এই ঘটনাজনিত ভাবপ্রবাহ যে তাঁহাদের প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল হইয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পূর্ব্ব যুগের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছিল। অনুকরণপ্রিয় ও অনুভূতিশূন্য লেখকগণ এক প্রাণহীন সাহিত্যের বোঝা ইংরাজ জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার অপূর্ব্ব মন্ত্র যখন ফরাসী ভূমিতে উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন ইংরাজ কবিগণও তাহাতে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন; আর দেখিতে দেখিতে কৃত্রিমতার সমস্ত বন্ধন নিমেষে ছিন্ন হইয়া প্রকৃত সাহিত্যোৎপত্তির পথ মুক্ত করিয়া দিল। তাই এ যুগের সাহিত্য স্বাধীন চিন্তার সাহিত্য, স্বানুভূতির সাহিত্য। অতঃপর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার যুগ। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি, রেলওয়ে,

ষ্টীমার, কলকারখানার অত্যধিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-বিস্তার এবং ধর্ম্মে ও সমাজে নানাবিধ আন্দোলন এই যুগের বিশেষত্ব ছিল। কবি টেনিসন এবং থ্যাকারে, ডিকেন্স, জর্জ্জ ইলিয়ট প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণের মধ্য দিয়া এই যুগমাহাত্ম্য কিরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিদিত নহে।

ইংরাজী সাহিত্যে যাহা দেখা গেল, অন্যান্য সাহিত্যেও ঐ একই নিয়মের কার্য্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আর বেশী কথার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

এই ত গেল ভাবসম্বন্ধে। ভাষাও কখনও অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারে না। নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন ভাষাকে আপনা হইতেই নিয়ত নূতন ভাবে গঠিত করিয়া লয়। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। নানা দিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের ঘটনারাশি যখন সাহিত্যের উপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন স্বতঃই ভাব ও ভাষার যুগপৎ বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কেহ এই পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করিতে পারেন না। ইংরাজী সাহিত্যই ইহার উদাহরণস্থল। চসারের সময় ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নর্ম্মাণ-ফ্রেঞ্চের আদর বড় বেশী ছিল, চসার নিজেও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁহার ভাষায় প্রবল ফরাসী-প্রভাব লক্ষিত হয়। পরে যখন ইংলণ্ডে ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতে থাকে, তখন ইংরাজী সাহিত্যের উপর এই দুই প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাবও বড় কম হয় নাই। আবার যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে জর্ম্মাণ সাহিত্য ও দর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, তখন কোলরিজ, কার্লাইল প্রভৃতি লেখকগণের উপর এই বৈদেশিক প্রভাব কিরূপভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন।

বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপনির্ণয়কল্পে যে এতগুলি কথা বলা হইল তাহার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে, সাহিত্যের ভাব ও ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এবং দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থাই এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী। আর যেহেতু অধুনা সকল সভ্য জাতিকেই বিদেশের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, তখন সকল জাতির সাহিত্যেই বৈদেশিক প্রভাব অল্পবিস্তর আসিয়া পড়ে।

এইবার আমাদের নিজেদের সাহিত্যের অবস্থা আলোচনা করা যাক্। বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় হইতে ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গাধিকার পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সমাজে যে কোন রাষ্ট্রীয় সজীবতা ছিল, তাহার প্রমাণ ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক এক সময় হয় ত প্রতাপাদিত্য কিম্বা কেদার রায়ের ন্যায় কোন কোন ভুঁইয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া মোগলসম্রাট কিম্বা বাঙ্গালার সুবাদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন। কিন্তু এইরূপ দুই একটি ব্যাপার বাঙ্গালীর সাধারণ জাতীয় জীবন হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন ছিল যে, তাহাদের এই অসংলগ্নতাই সেগুলিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী সেকালে কিরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানেই ব্যস্ত থাকিত, দেশের ও দশের কথা ভাবিবার অবসর পাইত না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবণতা চিরকালই তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তাই কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত এই একটি ভাবই প্রাধান্যলাভ করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য ভাব যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সেগুলি এতই ক্ষীণ এবং এতই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেগুলি প্রায়ই আমাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

সেকালের বাঙ্গালী ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল; কারণ তাহাদের জাতীয় জীবনে বড় একটা অন্য কোন নূতন ভাবের আবেশ হইত না। কেহ যেন মনে করিবেন না যে, তাহাদের কাব্য আদিরস প্রভৃতি বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত হইত না। এগুলি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। আমি ভাবের কথা বলিতেছি, রসের নয়। তাহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে একটিমাত্র তার বাজিত, তাহা ধর্ম্মের; অন্যগুলি সব অসাড় হইয়া থাকিত। তাই তখনকার সাহিত্য ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। লেখকগণ সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়াই সকল সময়ে যে এরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেন, তাহা নহে। অন্য কোনরূপ সাহিত্যের উদ্ভব বোধ হয় তখন একেবারে সম্ভবপরই ছিল না।

কিন্তু ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। মৃতবৎ সমাজে জীবনসঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিল। বাঙ্গালী এমনই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত যে, সে যে পরাধীন তাহা সে ভুলিয়াই গিয়া-

ছিল। সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া সে মুসলমান রাজাকে নিজের রাজা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতি বৈদেশিক জাতির শাসন-পাশ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে নিজের অবস্থাটা একবার বুঝিবার চেষ্টা করিল। তার পর কুক্ষণে কি সুক্ষণে জানি না, বঙ্গে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটা দারুণ বিদ্রোহভাব সূচিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা বেশীদিন থাকিতে পায় নাই এবং বিশেষ কোন অনিষ্টও সাধন করিতে পারে নাই। কারণ যে বিদ্রোহের মূলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য-জনিত মোহমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা আর কয়দিন থাকিতে পারে? তাহার ভিত্তি ত কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শীঘ্রই সে মোহ কাটিয়া গেল; আর ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজ যে একটা বিপুল 'নাড়া' পাইয়াছিল, আত্মপ্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা বহুশতাব্দী পরে বাঙ্গালীর মনে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতেছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষণিক অস্বাভাবিক আচরণ যাহার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিল, তাহাই এখন আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য পড়িল। বৈদেশিক সংঘাতে যাহাতে ইহাদের কোন ক্ষতি না হয়, বাঙ্গালীর চেষ্টা এখন সেইদিকে নিয়োজিত হইতে লাগিল। ইংরাজ-সংস্পর্শের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা-প্রয়াসের এই ভাবটা গুপ্ত কবির রচনায় প্রথম প্রকাশ পাইল। তিনি শুধু তাহাদের সমাজবিধি, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচারক মিশনারি প্রভৃতির উপর তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, পরন্তু তাহাদের স্ত্রীজাতিও তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। নূতন যুগের ইনিই প্রথম কবি। তার পর বঙ্কিম-হেম-নবীন প্রভৃতির উপন্যাসে, কাব্যে ও প্রবন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব আরও বেশী পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের ভাব-দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতা চলিয়া গেল এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত যোগ-স্থাপনের সূচনা হইল। একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষিগণ হিন্দুত্বের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগি:

লেন এবং রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ স্বাধীনতার ভেরী-নিনাদে বঙ্গাকাশ ধ্বনিত ও বঙ্গবাসিগণকে চমকিত করিয়া তুলিলেন, অন্য দিকে যেমনই আবার নূতন ভাবের ভাবুক মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতকে নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে প্রচার করিলেন। বাহিরের আলোক, বাহিরের প্রভাব উপেক্ষা না করিয়াও হিন্দুর এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার বিপুল চেষ্টা, ইহাকেই মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Neo-Hindu Revival আখ্যা দিয়াছেন।* যুগপ্রভাবে যে ভাব-মদিরা বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, এই সময়কার সাহিত্যে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা 'অনুচিকীর্ষার সাহিত্য, প্রতিযোগিতার সাহিত্য' নহে। অনুকরণ করিয়া কেহ কখনও ভাল কিছু করিতে পারে নাই, প্রতিযোগিতা দ্বারাও ভাল ফল আশা করা যায় না। কোন জাতির সহিত 'পাল্লা দিবার মানসে' কখনও কোন সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে না। ইংরাজ কবি পোপ এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "স্কুলে"র কবিগণ যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে বোধ হয় অনুকরণের কাব্য বলিতে পারা যায় এবং ইংরাজী সাহিত্যে এই সকল কবির স্থানও বড় উচ্চে নহে; কারণ মৌলিকতা ইঁহাদের একেবারেই ছিল না, ল্যাটিন ও গ্রীক কবিতার আদর্শেই ইঁহারা কবিতা রচনা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতির সৃষ্ট সাহিত্যকে অনুকরণের সাহিত্য বলিলে শুধু যে তাঁহাদের উপর ঘোর অবিচার করা হয় তাহা নয়, আমাদের জাতীয় অভিব্যক্তির ধারাকে বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

* Vide Dr. B. N. Seals "Neo-Romantic Literature of Bengal."

হিন্দুরাষ্ট্রতত্ত্ব।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

হিন্দু রাজা সমাজপালক বলিয়া বিবেচিত হইতেন।(১) সমাজের হিত-সাধনই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল।(২) প্রজার মতের বা মঙ্গলের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার তাঁহার আদৌ ছিল না।(৩) তিনি সমাজের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে বাধ্য ছিলেন।(৪) কেবল দেশের অন্তঃশত্রু দমন করিয়াই তিনিই ক্ষান্ত হইতেন না, যাহাতে বহিঃশত্রুও প্রবল হইয়া না উঠিতে পারে, সে-দিকেও তাঁহাকে কঠোর লক্ষ্য রাখিতে হইত (৫) এবং সেজন্য দেশের ক্ষাত্র-শক্তি যাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত না হয়, তাহারও বিধান তাঁহাকে করিতে হইত।(৬) তিনি ধর্ম্মের প্রতিভূ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। ধর্ম্মই সমাজের ভিত্তি, পোষক ও লক্ষ্য। সেই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া তিনি প্রজাদিগের আদর্শ-স্থল হইতেন।(৭) তাঁহাকে ভোগ-বিলাস হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে হইত, রিপুচয়কে দমন করিয়া সত্বরতা-সহকারে কাজ করিতে হইত। তিনি জন-হিত-ব্রত পুরুষের ন্যায় বিরাজ করিতেন।

হিন্দুরাষ্ট্র এই কারণে সমাজের হিতসাধন-যন্ত্রস্বরূপ ছিল। প্রজাদিগকে রাষ্ট্রীয় জীব করিয়া তুলিবার দিকে উহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। যাহাতে তাহারা মানুষ হইতে পারে—শান্তিতে বাস করিয়া ধর্ম্মকার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহাই করা হিন্দুরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল।(৮)

---

(১) অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ। রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ মনু ৭।৩ স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥ ৭।৩৫

(২) সর্ব্বস্যাস্য যথা ন্যায়াং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥ ৭।২

(৩) মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া। সোঽচিরাদ্‌ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥ ৭।১১১

(৪) মনু—৭ অধ্যায়ের ২০।২১।১৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। (৫) ১৫৫।১৫৬।৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৬) ১০২।১০৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৭) ৪৩।৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৮) ৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগ।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রাষ্ট্রে যথাবিহিত ব্যবস্থাও ছিল। যাহাতে দেশে সম্যক শান্তি বিরাজ করে ও প্রজাদিগের ধর্ম্মসাধনে কোন বাধা না পড়ে, এজন্য রাষ্ট্রে রাজকার্য্য-পরিচালনার্থ বিভিন্ন বিভাগও ছিল। সেগুলি এই,—(১) ব্যবস্থা-বিভাগ, (২) বিচার বিভাগ, (৩) প্রজারক্ষণ-বিভাগ, (৪) সামরিক বিভাগ, (৫) পররাষ্ট্র-বিভাগ, (৬) কৃষিবাণিজ্য-বিভাগ ও (৭) রাজস্ব-বিভাগ। পরে আমরা বিশদভাবে এই বিভাগগুলির কার্য্যাবলী ও গঠন প্রণালীর আলোচনা করিব।

মন্ত্রী।

প্রথমটি ব্যতীত অন্য সকল বিভাগের কর্ত্তা এক একজন মন্ত্রী থাকিতেন। রাজকার্য্যে সাহায্য করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। রাজা তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মন্ত্রীরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট দায়ী থাকিতেন। রাজাও তাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিতে পারিতেন না। (৯)

মন্ত্রি-নিয়োগভার রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। অজ্ঞাতকুল, বিদেশী ও অজ্ঞাত-চরিত্র ব্যক্তিকে মন্ত্রি-পদে নিয়োগের বিধি ছিল না। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব ও পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইত। মন্ত্রীদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হইতে হইত। বিশুদ্ধচরিত্র না হইলে কেহ মন্ত্রিপদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন না।(১০) এই মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর বংশোদ্ভূত হইতেন বলিয়া মনে হয়। কারণ এরূপ কয়েকজন সাধারণ মন্ত্রী ব্যতীত রাজার আরও একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থাকিতেন। সকল কার্য্যেই রাজা এই মন্ত্রীর সাহায্য লইতেন।(১১) সুতরাং কার্য্যতঃ ইনিই প্রধানতম মন্ত্রী ছিলেন। রাজকার্য্যপালনের জন্য যতগুলি মন্ত্রীর প্রয়োজন হইত, রাজাকে ততগুলি মন্ত্রীই নিযুক্ত করিতে হইত।(১২) তবে প্রধান মন্ত্রীর সংখ্যা সাত আট জনের অধিক হইত না।

---

(৯) মনু—৭ অধ্যায়ের ৩১।৫৫।৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১০) মনু—৭।৫৪। (১১) ৭।৫৯। (১২) ৭।৬১

মন্ত্রীসভা।

রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য প্রধান মন্ত্রীদিগের একটি সভা ছিল। সেই সভায় তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। সে সভায় রাজাও উপস্থিত থাকিতেন।

কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে মন্ত্রীদিগের প্রত্যেকের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। পরে মন্ত্রীসভায় সে বিষয় প্রকাশ্যে আলোচিত হইত।(১৩) সেখানে যাহা নিষ্পত্তি হইত, রাজা সাধারণতঃ তাহাই গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করা না করা কতকটা তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। মন্ত্রীসভার নিষ্পত্তি নিজে আবার বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল।(১৪) কিন্তু সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে তিনি নিজে শেষ বিচার করিবার সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সাহায্য লইতে বাধ্য ছিলেন(১৫) এবং কার্য্যতঃ তাঁহার মতও মানিয়া লইতেন। কারণ, নিয়ম ছিল—

নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্ব্বকার্য্যাণি নিক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ ৭।৫৯

রাজা সর্ব্বদা তাঁহার উপর বিশ্বস্তভাবে সমস্ত কার্য্যের জন্যই নির্ভর করিবে এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেম।

১

ডাক্তার স্মিথ এবং তাঁহার বন্ধু হেনরি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সমাপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সাময়িক প্রসঙ্গের কথা উঠিল। দৈনিক সংবাদের কথা পড়িতেই হেনরি কহিল, "স্মিথ আজকার কাগজে ট্রেভেলিয়ন-মেরির প্রণয়ের কাহিনীটা পড়েছ? কি উদগ্র কি তীব্র প্রেম!"

---

(১৩) ৭।৫৭। (১৪) ৭।৫৭। (১৫) ৭।৫৮।

স্মিথ কহিল, "হাঁ পড়েছি!"

হেনরি কহিল, "এমনধারা প্রেমের কাহিনী,—আমি আর কোথাও শুনিনি! আপনার জীবনকে এত বড় বিপদের সম্মুখীন করা—শুদ্ধ মাত্র প্রেমের জন্যে — এই দ্বন্দকোলাহলময় পার্থিব জগতে একটা খেয়ালের জন্যে—এ কি কম বিচিত্র! মনে কর যদি সেই একটি মাত্র পাথর খ'সে পড়ে যেত, তা হ'লে মেরির কি কিছু পাওয়া যেত? অদ্ভুত নয়?"

স্মিথ কহিল, "অদ্ভুত বটে, কিন্তু এরও চেয়ে অদ্ভুত প্রণয়ের কাহিনী আমি জানি!"

হেনরি বিচলিত হইয়া কহিল, "এরও চেয়ে অদ্ভুত? কোথায় হ'য়েছিল?"

স্মিথ কহিল, "সভ্যতার আলোকের সম্পূর্ণ বাহিরে—গভীর তিমিরাচ্ছন্ন অসভ্য আফ্রিকাদেশে!"

হেনরি কহিল, "সে কাহিনী শোনবার আগ্রহ আমার প্রবল হয়েছে, বল।"

স্মিথ আরম্ভ করিল, "তখন আফ্রিকায় রেল পাতা সুরু হইয়াছে মাত্র। জায়গায় জায়গায় উপনিবেশ গোছ ক'রে এক একদল ইয়োরোপীয় থাকত, আর রেলের তত্ত্বাবধান করত। তুমি জান আমি এমনি একটা উপনিবেশের ডাক্তার হ'য়ে গিয়েছিলাম।

আমরা কয়েকজন ইংরাজ একত্র থাক্‌তাম। তার মধ্যে যিনি রেলের ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, তিনিই প্রধান। এমন একটা বিপদসঙ্কুল দেশে বেঁচে থাকাটাই মানুষের পক্ষে প্রচুর আনন্দ। কখন সিংহ তোমাকে তোমার বিছানা থেকে মুখে ক'রে তুলে নিয়ে যাবে,—কখন অসভ্যরা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তোমার হয় ত মুণ্ডটাই কেটে নিয়ে বল খেলা করবে তার কোন ঠিকানা যেখানে নেই, সেখানে এই সব দুর্দ্দিনের হাত থেকে প্রাণটাকে রক্ষা করাই একটা মস্ত উপভোগ, কিন্তু আমরা তা ছাড়াও অন্য আনন্দের ব্যবস্থাও যে না করতাম তা' নয়। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ, নাচ এবং শীকার দ্বারা আমাদের একঘেয়ে জোর-ক'রে বাঁচিয়ে-রাখা জীবনগুলোকে কতকটা বৈচিত্র্য দিতাম! এমন কি আমাদের এই ক্ষুদ্র উপনিবেশটিতে একটা বিবাহও হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন থাকার পর আমাদের মধ্যে আর একজন অফিসার এল, নাম জন। সে এসেছিল স্কটল্যাণ্ড থেকে;— সুন্দর সবল দেহ, ক্রীড়ায় পারদর্শী,—

;ট্ ক'রে লোকের হৃদয় অধিকার ক'রে নেবার মত তার সব গুণই ছিল। সে আসাতে আমাদের মধ্যে—বিশেষ আমাদের চেয়ে ছোটদের দলের মধ্যে, একটা বেশ আন্দোলন পড়ে গেল! কেউ বা তাকে হিংসা করতে লাগল এবং অধিকাংশ লোকই তাকে পছন্দ ক'রে ফেললে!

কিন্তু সে আমাদের দলে বড় মিশত না, কেমন এক অদ্ভুত রকমের খেয়ালী লোক ছিল। শোনা গেল, সে হতাশ প্রণয়ী। স্কটল্যাণ্ডে যাকে সে ভাল বেসেছিল, সে ধনীর কন্যা; তার পিতা তাকে বলেছিল, টাকা-কড়ি কিছু না করতে পারলে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তাই সে বেরিয়ে পড়েছিল।

আফ্রিকায় রেলের চাকুরীতে অনেক টাকা হওয়ার সম্ভাবনা শুনে বোধ হয় সে এই চাকুরী নিয়েছিল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হ'ত না যে, টাকা হবার যে সাধারণ উপায় অসৎ পথ সে তা সহজে গ্রহণ করবে! সেইজন্যে বোধ হয় সে কতকটা হতাশ হ'য়েছিল, কিন্তু উপায় নেই, সে সর্ত্তে আবদ্ধ হ'য়ে এসেছিল—সহসা যাবার পথ ছিল না!

২

তাকে একটা বাংলো তার বাসের জন্য দেওয়া গেল।

বাবুর্চ্চি ছাড়া তার একজন নিগ্রো পরিচারিকা জুটে গেল। তার একটা অত্যন্ত বড় অনুচ্চরণীয় নাম ছিল, কিন্তু জন্ তাকে বদলে সোফিয়া নাম রাখলে।

এই সোফিয়ার একটু ইতিহাস ছিল। তার বাপ মা আপনার জন কেউ ছিল না,—কিন্তু তার যৌবন তার শত্রু হ'য়ে উঠেছিল। তাই অসভ্যদের কাছ থেকে পালিয়ে সে আমাদের কাছে এসেছিল এবং ঠিক সেই সময়ে জনেরও একজন দাসীর দরকার হয়েছিল। সেইজন্যে সোফিয়াকেই সে রাখলে!

নিবিড় কালো রংএর মধ্যেও সোফিয়ার একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল! তার চোখ দুটো কি সুন্দর! অসভ্যতার সমস্ত বীভৎসতা তার এই স্নেহ-করুণ দুটি চোখের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'য়ে গিয়েছিল!

আমাদের ক্লাব থেকে জনের বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যেত! আমরা যখন সদলে আনন্দ করছি তখন দেখা যেত, জন তার হেলান চেয়ারটাতে ব'সে একটা বই নিয়ে পড়ছে, আর সোফিয়া এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম ক'রে বেড়াচ্ছে!

কোন কোন দিন দেখা যেত আপনার আফিসের কাজ কর্ম্ম সকাল সকাল সেরে জন তার বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তার পর অনেকক্ষণ পরে হয় ত দুটো চারটে মৃত পাখী নিয়ে, কখনও বা খালি হাতে ফিরে এল। সে যাই ফিরে আসত, অমনি সোফিয়া দৌড়ে গিয়ে তার হাতের বন্দুকটা আর তার শীকারগুলো নিয়ে—তার বস্‌বার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বাবুর্চির কাছে ছুটে গিয়ে সেগুলো রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিত! এতক্ষণ যেন তার কোন কাজ ছিল না, সে শুধু উন্মুখ হ'য়ে বসেছিল, তার প্রভু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার ব্যস্ততার আর সীমা রইল না!

৩

জনকে নিয়ে আমাদের দলে কাণাকাণি চলিতে আরম্ভ করলে! সকলেই প্রায় তার ওপরে বিরক্ত হ'য়ে উঠছিল—এ কেমন ধারা লোক! এই একটা ছোট জায়গা, সঙ্গই যেখানে একমাত্র আনন্দ, সেখানে এমন করিয়া নিঃসঙ্গ থাকা, শুধু অদ্ভুত নয়, নিতান্ত স্বার্থপরতার নিদর্শন।

ইঞ্জিনিয়রের কন্যা মিস্ ব্রাইট কহিল, এমনধারা লোকের চেয়ে যদি অন্য কেউ এর পরিবর্ত্তে আসত, তা হ'লে ঢের ভাল হ'ত!

মিস গ্রিন কহিল, এমনধারা করিয়া বলাটা তোমার ঠিক নয়! ও বেচারা হয়ত জীবনে এত বড় একটা নৈরাশ্য পেয়েছে, যা ওকে এমনি ক'রে দিয়েছে! আমার ওর ওপর বরং দয়া হয়!

মিস ব্রাইট একটুখানি বাঁকা হাসিয়া কহিল, তোমার দয়াটা এত সুন্দর করে থেকে!

ইঞ্জিনীয়ার ব্রাইট কহিলেন, তোমরা একটা সামান্য লোককে এত বেশী গুরুত্ব কেন দিচ্ছ! ও যখন ছিল না তখন আমরা যেমন ওর অভাব বুঝতাম না, তেমনি এখনও আমরা ও নেই মনে করতে পারি!

মিস সার্প একটু রুক্ষস্বরে কহিল, কিন্তু আমাদের ক্লাব ঘর থেকে নিয়তই যে ওই কালো নিগ্রেসটা আর জনকে দেখা যায়! সেটার উপায় না করলে ত এমন মনে করা চলে না! বলিয়া সে চোখে চোখে মিস ব্রাইটকে ইঙ্গিত করিল।

মিস গ্রিন কহিল, না জনের পশ্চাতে তার সম্বন্ধে এমন করিয়া বলাটা কোন ক্রমেই ভদ্রতা ও শ্লীলতা-সঙ্গত হয় না!

পিটার—সে মিস্ ব্রাইটের প্রণয়ার্থী ছিল—কহিল, না ও লোকটাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না।

মিস্ গ্রিন কহিল—তা ত' হবার কথাই নয়!

মিস ব্রাইট কহিল—তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন?

ব্রাইট কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় সেখানে সোফিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমার প্রভু আজ হঠাৎ বিকালে আপিস হইতে ফেরার পর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি একবার দয়া করিয়া চলুন।"

৪

জনকে আফ্রিকার ভীষণ জ্বরে ধরিয়াছিল। আমার অভিজ্ঞতায় এই জ্বর একবার যাহাকে ধরিয়াছে তাহাকে সহজে পরিত্রাণ পাইতে দেখি নাই।

তাহার রীতিমত সেবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সে যতই কেন আমাদের অপ্রীতিভাজন হউক না কেন, সে আমাদের স্বজাতি, সুতরাং তাহার যাহাতে কোন প্রকারে অযত্ন না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দেখিতেই হইবে।

মিস্ গ্রিন কহিল, আমি তাহার সেবার জন্য প্রস্তুত।

দেখাদেখি মিস সার্প, মিস ব্রাইট, পিটার প্রভৃতি বাকী সকলেই রাজি হইয়া গেল।

একমাস মৃত্যুর সহিত রীতিমত যুদ্ধ! ক্ষণে ক্ষণে জন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিল,—তাহাকে সেবা ও ঔষধের দ্বারা কোন প্রকারে ঠেকাইয়া রাখা মাত্র! তাহার যদি এত সেবা না হইত, তাহা হইলে সে কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না!

কিন্তু এই একমাসে সোফিয়া সকলের নিকটেই একটা বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল! মানুষের যে এত সাধ্য তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই! আহারনিদ্রাহীন হইয়া একমাস পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে যাপন করা নিগ্রোর শরীর ভিন্ন সম্ভব নয়! কিন্তু কিসের জন্য? জন সোফিয়ার কে? প্রভু মাত্র, মাসান্তে কয়েকটা মুদ্রার সম্বন্ধ! সকলে ধন্য ধন্য করিল!

আর একবার আক্রান্ত হইলে জনের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে আফ্রিকা হইতে দূরে পাঠাইতে হইবে! চিফ ইঞ্জিনিয়র

স্বয়ং তাহার আবেদনে এই কথা লিখিয়া দিলেন এবং ফলে জনের আপাততঃ এক বৎসরের ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল।

যেদিন সে সংবাদ আসিল, সেদিন ক্লাবে জন সম্বন্ধে আবার কথা উঠিল। তাহার আফ্রিকা-পরিত্যাগের সম্ভাবনায় বিশেষ এত বড় পীড়ার পর আর কেহই জনের সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল না। কথায় কথায় সোফিয়ার কথা উঠিল,—মিস্ গ্রীন কহিল, "কিন্তু সত্যই কি অদ্ভুত সেবা!"

মিস্ ব্রাইট কহিল "অদ্ভুত! কিন্তু সে নিগ্রো—তার এত বোধশক্তি, এত অনুভব-ক্ষমতা!"

মিস্ সার্প কহিল, "এত প্রভুভক্তি!"

মিস্ গ্রীন কহিল, "শুধু প্রভুভক্তি? আর কিছু নয় কি?"

মিস্ সার্প কহিল, "আর কি?"

মিস্ গ্রীন কহিল, "তারও চেয়ে শক্তিমান্—তারও চেয়ে আশ্চর্য্য—প্রেম?"

মিস্ সার্প উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "বলেছ ভাল! প্রেম? নিগ্রোর আবার প্রেম? সে প্রেমের বোঝে কি? এই অসভ্য উলঙ্গ জাত, তারা চেনে মৃত্যু, হিংসা, তারা প্রেমের কি জানে?"

মিস্ ব্রাইট কহিল, "নিশ্চয়ই এত বড় একটা বৃত্তি তাদের নেই! হয় প্রভুভক্তি, নয় একটা অবোধ্য কিছু—!"

ব্রাইট সেথান দিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন, 'তা'হলে সে অবোধ্য কিছুও নিশ্চয়ই সুমহৎ!

৫

জন তাহার ছুটির সংবাদ পাইয়া সোফিয়াকে কহিল, "সোফিয়া আমার ছুটি মঞ্জুর হ'য়েছে—আমি পরশু দেশে যাত্রা করব।"

বুকের মাঝে কঠিন আঘাত পাইলে যেমন মুখ হইতে সমস্ত রক্ত সরিয়া যায়, সোফিয়া তেমনি পাণ্ডু হইয়া গেল! কাচের মত প্রভাহীন দুটা চোখ তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, "চলে যাবেন?" তাহার পর সামলাইয়া লইয়া কহিল "হাঁ, হাঁ, আপনার শরীর বড় দুর্ব্বল—যত শীঘ্র যেতে পারেন ততই ভাল—।" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জন কহিল, "সোফিয়া তোমার স্নেহ, তোমার যত্ন আমার চিরদিন মনে থাকবে! তুমি না থাক্‌লে আমি বাঁচতাম না।"

হঠাৎ সোফিয়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, "না না আমি কি করেছি, আপনি যখন চলে যাচ্ছেন তখন কেন আমার কথা মনে রাখ্‌বেন—দরকার নেই—দরকার নেই—আমি কিছু করিনি—।"

জন বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল—কহিল, "সোফিয়া আমার সঙ্গে যাবে?"

সোফিয়া কহিল, "না।"

জন কহিল, "সোফিয়া তোমাকে আমি কি দিব—তুমি কি চাও?"

সোফিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "কিছু না।"

কলের পুতুল হাত নাড়ে, চোখ নাড়ে, চলিতেও পারে। তেমনি করিয়া সোফিয়া তার প্রতিদিনকার কাজ সেদিন হাত নাড়িয়া সারিল, চোখে তাহার প্রত্যহকার যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিত, সেদিন তাহার পরিবর্ত্তে একটা জ্যোতিঃহীন স্বচ্ছতা স্থির হইয়া রহিল।

৬

পরদিন জন স্বদেশ যাত্রা করিবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল—কিছুক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে জন ক্লবে সকলের কাছে ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে! কাল সে চলিয়া যাইবে—আজ প্রত্যেকের নিকট—মিস্ ব্রাইট, মিস্ সার্পও বাদ যান নাই, সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া গিয়াছে! বলিয়াছে, মানুষের অবস্থা তাহাকে সময়ে সময়ে অমানুষ করিয়া তোলে, তাহার বিষয় বিচার করিবার সময় যেন দয়া করিয়া এ কথা তাঁহারা মনে করেন! সে কোনও দিন প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারে নাই, তথাপি তাঁহারা অবিরত যে দয়া, যে স্নেহ তাঁহাকে দেখাইয়াছেন তাহার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা সে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে?

জনের প্রতি যাহার মন সর্ব্বাপেক্ষা বিরূপ ছিল, সে পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে এই ঘটনার পর স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল!

মিস্ ব্রাইট কহিল—"জন-সোফিয়ার ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত স্মৃতিরূপে আমাদের মনে থাকবে!"

মিস্ গ্রীন কহিল, "অদ্ভুত কিন্তু সুন্দর!"

মিস্ ব্রাইট কহিল, "সোফিয়ার কথা বলছ ?"

মিস্ গ্রীন কহিল, "হাঁ তার প্রেম—তার আকর্ষণ !

মিস্ ব্রাইট বলিল, "অসম্ভব !"

মিস্ সার্প কহিল, "নিগ্রোর প্রেমের কল্পনা—একটা বিকট ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপও যাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না—একজন নিগ্রেস সম্বন্ধে তার কল্পনা সত্যই উদ্ভট ! তুমি কি বল ?"—

ব্রাইট বলিলেন, "তোমাদের সেই পুরাতন তর্ক ! তোমরা যাই বল জনকে সোফিয়াই প্রাণ দিয়াছে—সেটার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা কারণ থাক্ বা না থাক, —তার হৃদয় যে অত্যন্ত মহৎ, পরার্থপর তাতে আমি সন্দেহ করতে পারিনে ! প্রেম কি পরের জন্য আত্মনিবেদন নয় ?"

এমন সময় জনের চাপ্‌রাশী ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "জনকে সাপে কামড়েছে—শীঘ্র আসুন।"

আমি কহিলাম, "সাপে ?"

চাপরাশী কহিল, "হাঁ সাপ, কাল সাপ—"

কালবিলম্ব না করিয়া জনের বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, জন চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে—সম্মুখে ভীষণ বিষাক্ত সর্প মারা পড়িয়া আছে। পায় কামড়াইয়াছিল—পা বাঁধা—পার্শ্বে সোফিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

জন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল; "কহিল, "আফ্রিকা আমাকে ছাড়লে না ! ডাক্তার মৃত্যু সুনিশ্চিত !"

সোফিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিল কহিল, "একটা কিছু উপায় ব'লে দিন —একটা কোন উপায় যাতে বাঁচান যায় !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ কামড়েছে ?"

জন কহিল, "এই মাত্র"।

আমি বলিলাম, "আমি অবশ্য সব রকম উপায়ই করব। কিন্তু একটা ধ্রুব উপায় হচ্ছে, ক্ষত স্থানে মুখ দিয়ে বিষ চুষে নেওয়া। তা হ'লে জীবন-রক্ষা অনেকটা সুনিশ্চিত। কিন্তু যে কেউ চুষবে, সাবধান দাঁত যেন পানসে না হয় —তা হ'লে রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে ত'ার মৃত্যু সুনিশ্চিত !"

জন ধীরে ধীরে কহিল, "দরকার নেই ! কে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করবে ?

আমাদের মধ্যে সকলেই সেখানে ছুটিয়াছিলেন—আমার কথা শুনিয়া সকলেই পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন! সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে কে ঝাঁপ দিবে?

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম সোফিয়া—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রেস সোফিয়া—ক্ষত-স্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিলাম, "সাবধান—দাঁত পান্‌সে না হয় তা হ'লে মৃত্যু নিশ্চয়!"

সোফিয়া ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "না শক্ত—ইস্পাতের মত শক্ত!"

স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া জন-মণ্ডলী সে অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল! আত্মোৎসর্গের অমর আলোকে সোফিয়া তখন দীপ্ত সুন্দর হইয়া উঠিল!

জন ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল। অবশেষে সে কহিল, "আমি এখন ভাল বোধ করছি!"

তখন সোফিয়াকে বলিলাম, "সোফিয়া এইবার হয়েছে—জনের তুমি প্রাণ দিয়াছ।"

কিন্তু সোফিয়া মুখ সরায় না। তখন জোর করিয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া দেখিলাম—তাহার চোখ দুটা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। পান্‌সে দাঁতের রক্তে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে!

আমি কহিলাম, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

তখন সোফিয়া চেতনা হারাইতেছিল! কিন্তু তথাপি সে জোর করিয়া আমার হাত হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া আপনার দুইটি অধর ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল,—জ্ঞান তাহার ছিল না; কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া যে যাহা করিতে চাহিতেছিল, চেতনাহীনতা তাহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিল না। মৃত্যুর দুয়ারে আপনার ব্রত বলিয়া সে যাহা গ্রহণ করিয়াছিল, প্রয়োজন-শেষেও তাহা হইতে তাহার অচেতন ব্যাকুলতা ফিরিতে দিল না!

তার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখ নত হইয়া পড়িল, জনের পায়ের উপর তাহার প্রাণহীন দেহ দেবতার নির্ম্মাল্যের মত লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়।

অর্থনীতি।*

অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় এই পুস্তকের রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আজকালকার বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে এরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি যতটা সাবধানতার সহিত রচিত হওয়া আবশ্যক, ততদূর হয় নাই। কি প্রণালীতে লিখিলে এরূপ দুরূহ বিষয় সর্ব্বজনবোধ্য হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে অর্থনীতির মূল তত্ত্বগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া না দিয়া একেবারে বিভিন্ন মতের বিচার করিতে বসিলে বিষয়টি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠে, তার পর অনেক স্থলেই তাহা আদৌ বোধগম্য হয় না। যোগীন্দ্র-বাবু শিক্ষক হইয়াও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করায় বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এ গ্রন্থে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ দুইখানি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলেই ভাল হইত। প্রথম খণ্ডে মূল তত্ত্বগুলির সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন মতের বিচার করিতে বসিলে পাঠকদিগের যেমন আনন্দবৃদ্ধি হইত, তেমনি জ্ঞানলাভের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করাও হইত।

গ্রন্থের দ্বিতীয় দোষ,—পরিভাষা-সঙ্কলনে মনোযোগের অভাব। এ সকল বিষয় লিখিতে হইলে আগে পরিভাষাগুলি ঠিক করিয়া লইতে হয়। অন্যথা জিনিষটি কোন মতেই বোধ-গম্য করা যায় না। যোগীন্দ্রবাবু এই সত্যটি উপেক্ষা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে লিখিতে যখনই যে ইংরেজি পরিভাষা পাইয়াছেন, অমনি তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই নব অনূদিত পরি-ভাষাটির সহিত পূর্ব্ব ব্যবহৃত কোন পরিভাষার অর্থসঙ্গতি থাকিল কি না, অথবা অর্থবৈষম্য ঘটিল কি না, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। এইজন্যই 'অর্থ' শব্দ কোথাও wealthএর এবং কোথাও moneyর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মাত্রা' কোথায় dose, কোথায় limit হইয়াছে। স্থানে স্থানে এরূপ ভুল আরও আছে।

তার পর পরিভাষাগুলি যাহাতে অর্থবোধক হয়, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া যোগীন্দ্র-বাবু ইংরেজি শব্দগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। Circulating capital কি 'ভ্রাম্যমান' মূলধন? যাহা 'একবারের বেশী দুইবার কার্য্যে লাগে না', তাহা কিরূপে ভ্রাম্যমান হইবে? এখানে Circulating শব্দে কি 'ক্ষণিক' অর্থ প্রকাশ পাইতেছে না? ইংরেজী পরিভাষায় যদি কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষটাও যে আমাদের ভাষায় আমদানী করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম আছে কি না জানি না। Utility মানে 'কার্য্যকরী শক্তি' নহে,

---

* অর্থনীতি—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

তাহার মানে 'ব্যবহারিক প্রয়োজন'। Unproductive Labourএর বাঙ্গলা 'অফলোৎ-পাদক পরিশ্রম' অপেক্ষা 'নিষ্ফল পরিশ্রম' করিলে আরও ভাল হইত। এরূপ অনেক পরিভাষা সম্বন্ধেই আপত্তি আছে।

গ্রন্থের তৃতীয় দোষ এই যে, গ্রন্থকার সব সময় সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতে পারেন নাই। অনেক স্থলেই অতি অমনোযোগিতার সহিত লিখিত হইয়াছে। অনেক স্থলে কোনরূপ বিচার না করিয়াই তিনি ইংরেজী অর্থনীতিবিদ্‌গণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এ দোষগুলি কোন মতেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'সঞ্চয়—ইহাকে সাধারণ কথায় সুদ বলে।' সঞ্চয় কি সুদ? সঞ্চিত ধন মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহাই কি সুদ নহে? এই কথাকয়টি একেবারে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকার লাভ ও সুদে বরাবর গোল করিয়াছেন। এরূপ গোলের একটা হেতুও যে নাই, তাহা নহে। ব্যাপারটা এই—৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—'মূলধনের অধিকারী কর্ম্মকর্ত্তা'। কথাটা সব সময় সত্য নহে। কর্ম্মকর্ত্তা কি সর্ব্বত্রই নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া কারবার করেন? তিনি কি ধনী বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করিয়া কার্য্যে হাত দেন না? যদি তাহা দেন, তবে ধনী বা মহাজন এবং কর্ম্মকর্ত্তাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা কি ঠিক? উভয়ের কর্ম্ম কি পৃথক নহে? ধনী তাঁহার টাকা ধার দেওয়ার সুদ পান, আর কর্ম্মকর্ত্তা সেই টাকা নিজের ব্যবসায়ে লাগাইয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে ঐ সুদ ও অন্যান্য খরচা বাদ দিয়া তবে না লাভ করেন। গ্রন্থকার ইংরেজী অর্থনীতিবিদ্‌গণের মত অবিবাদে গ্রহণ করিয়া এই গোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন অন্যান্য অর্থনীতিতে এই মতবাদ নিন্দিত ও ভ্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন তাহা আবার বাঙ্গলা ভাষায় আমদানী করিয়া যোগীন্দ্রবাবু ভাল কাজ করেন নাই। এ সব বিষয় লিখিতে হইলে যতটা বিচার, যতটা সাবধানতার প্রয়োজন, তিনি অধ্যাপক হইয়াও তাহার একটুও দেখান নাই। মাসিক কাগজের জন্য তাড়াতাড়ি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, শেষে সেইগুলিই জড় করিয়া কোনরূপ সংশোধন না করিয়াই তিনি গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা আদৌ গৌরবের কথা নহে।

চতুর্থ দোষ, বিষয়-বিন্যাসে অমনোযোগিতা। গ্রাহকতা ও সরবরাহতার প্রভেদ ও সম্পর্ক লইয়াই অর্থনীতি। এই বিষয়টি আগে বুঝাইয়া না রাখিলে অনেক তত্ত্বই ভাল বুঝান যায় না। যোগীন্দ্রবাবু পূর্ব্বাহ্ণে এই বিষয়টি না বুঝাইয়া জিনিষটি কতকটা দুরূহতর করিয়া তুলিয়াছেন।

পঞ্চম দোষ, যেমন করিয়া বুঝাইলে জিনিষটি বেশ সহজে বোধগম্য হইতে পারে, তাহা না করিয়া তিনি স্থানে স্থানে ইংরেজী অর্থনীতিবিদের ব্যাখ্যার অনুবাদ করিয়াছেন। এজন্যই উর্ব্বরতা সমস্যাটি একেবারেই বুঝাইতে পারেন নাই। উর্ব্বর কথা সাধারণতঃ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থনীতিতে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। কেন হয় না, তাহাই বুঝান আবশ্যক। কিন্তু ইংরেজি গ্রন্থকর্ত্তাদের পন্থা অনুসরণ করায় জিনিষটি এমনই ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা

বুঝিয়া উঠা সহজবুদ্ধির সাধ্য নহে। 'ক্রমিক আয়হ্রাসের নিয়মটি'ও এই কারণেই তিনি বোধগম্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি সংক্ষেপে মূল গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দিলে ভাল হয়। ২য় পৃষ্ঠার 'শিক্ষার আবশ্যকতা' এইরূপ একটি বিষয়। তাহার অতি দৈর্ঘ্য ঐ স্থলে অত্যন্ত 'বেমানান' ও নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। ওখানে মোটামুটি ভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া বাকী কথাগুলি পরিশিষ্টে দেওয়াই উচিত ছিল।

১৯ পৃষ্ঠায় যে পাদটিপ্পনীটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন সার্থকতাই নাই। তাহা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কথা ভাল হইলেই কি যেখানে সেখানে তাহা তুলিয়া শুনাইতে হইবে! এরূপ পাদটিপ্পনীতে গ্রন্থ-সৌন্দর্য্য আদৌ বৃদ্ধি পায় না, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

তার পর ভাষার কথা। ভাষার দিকে গ্রন্থকারের আদৌ লক্ষ্য নাই। কত যে ব্যর্থপ্রয়োগ আছে, তাহা বলিবার নহে। আবার অনেকস্থলে মাঝে মাঝে দুই একটা প্রয়োজনীয় কথা বাদ দেওয়ায় অর্থবোধ কষ্টকর হইয়াছে। শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্যগুলি ব্যবহার করিবার সময় তিনি সেগুলির উপযোগিতা ও সার্থকতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়া ত মনে হয় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১০ পৃষ্ঠার ২০ ছত্রে 'নিয়ম প্রণয়ন' কথা দুইটি কি ঠিক্? 'উপায় অবলম্বন' বলা উচিত ছিল না কি? ১১ পৃষ্ঠায় ২য় ছত্রে 'এই উদ্দেশ্যসাধনমানসে' আছে। কোন্ উদ্দেশ্যের জন্য তাহা সহসা বুঝা যায় না। বলা উচিত ছিল, 'শিল্পোন্নতিসাধনমানসে'। ঐ পৃষ্ঠার তৃতীয় ছত্রের 'শস্যাদির রপ্তানি' হইতে এই প্যারার শেষ পর্য্যন্ত অংশটির সহিত পূর্ব্বে বা পরে লিখিত অংশের কোন সামঞ্জস্য নাই। ঐ পৃষ্ঠায় ২য় প্যারাগ্রাফের ৩য় ছত্রের 'ভূমি এবং পরিশ্রমই অর্থ উপার্জ্জনের মূল মন্ত্র এবং প্রকৃষ্ট উপায়' অংশের মূল মন্ত্র কথাটির কি কোন মানে হয়? ১৩ পৃষ্ঠায় ৪র্থ ছত্রের 'ভূমি ও পরিশ্রমদ্বারা লব্ধ অর্থই মূল অর্থের কারণ' কথাটির মানে কি? ১২ পৃষ্ঠায় ২য় প্যারাগ্রাফের প্রথম তিন ছত্রের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। ২৪ পৃষ্ঠায় শেষ দুই প্যারাগ্রাফের তাৎপর্য্য আদৌ বোধগম্য নহে। ইহাদের প্রথমটিতে যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কিরূপে যে ঐরূপ পরিশ্রম 'পরোক্ষ ফলোৎপাদক পরিশ্রম' আখ্যা পাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ দোষ অনেক আছে।

খৃষ্টাব্দের স্থলে সন কথা ব্যবহারের অর্থ কি? খৃষ্টাব্দ কি সন? ঐরূপ ব্যবহারে সুবিধা না হইয়া বরং অসুবিধাই বাড়িয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাবধানতার অভাবে আদৌ সফলকাম হন নাই। এই পরিচ্ছেদটিকে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া আরও পরিষ্কৃত ও সংযতভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে পরিচ্ছেদটি এরূপ ব্যর্থ হইত না।

এক এক করিয়া গ্রন্থের অনেকগুলি দোষই দেখান গেল। কিন্তু দোষ দেখাইব বলিয়াই দোষ দেখাই নাই। এরূপ গ্রন্থ যত ভ্রমশূন্য হয়, ততই ভাল। তারপর গ্রন্থকার 'নিবেদনে' জানাইয়াছেন যে, 'গ্রন্থে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইবে, তাহা গ্রন্থকারকে জানাইলে, ভবিষ্যতে

সংশোধন করা যাইবে।' তাঁহার এরূপ সঙ্কেত না পাইলে আমি এরূপ বিস্তৃতভাবে দোষগুলি দেখাইতাম না, দুই এক কথায় বক্তব্য শেষ করিতে পারিতাম। এ সকল পুস্তক যাহাতে ভ্রমহীন হয়, তাহা করা কেবল কি রচয়িতারই দায়িত্ব? পাঠকদের কি সেদিকে কোন দায়িত্বই নাই? আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না; আর তাহা হয় নাই বলিয়াই যাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়াছি, সরলভাবে তাহাই নিবেদন করিলাম। ইহাতে গ্রন্থকারের বা তাঁহার কোন পক্ষপাতী ব্যক্তিরই অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

আমার এ সমালোচনায় কেবল দোষের ভাগই দেখান হইয়াছে, গুণের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমাদের বুঝিবার ও জানিবার বিশেষ প্রয়োজন। বণ্টন-বিভাগের পরিশিষ্ট দুইটি এতদূর প্রয়োজনীয় যে, তাহা বলিবার নহে। এরূপ অনেকগুলি কারণে গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে গুণগুলির আলোচনা করা এ সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। যাহার ভাল দিক্ আছে, কেবল তাহারই মন্দ দিক্‌টা দেখাইলে লাভ আছে; আর যাহা আগাগোড়াই মন্দ, তাহার আর মন্দ ভাগ কে দেখাইতে যায়? সুতরাং ভূমিকা-লেখক অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভাষায় বলি—'বিষয়টী যেরূপ বিস্তৃত ও দুরূহ, তাহাতে এই ছোট পুস্তকের মধ্যে ইহার সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, বর্ত্তমান যুগের আমাদের উপযোগী স্বদেশী অর্থনীতি বলিয়া কোন শাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই। এ বিষয়ে বিদেশী লেখকগণও এখন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন সেখানে রাজনীতি ও সমাজনীতির যথেষ্ট আলোচনা আছে, অর্থনীতিকে সহজেই তাহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। এখানে কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় এ বিষয়ে যাঁহারা প্রথম চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যে ত্রুটী থাকাই সম্ভব। কিন্তু সকল ত্রুটী সত্ত্বেও তাঁহাদের এই চেষ্টা ও উদ্যম, আশা করি, সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভ করিবে।'

আমাদের এই সমালোচনাকে অন্য ভাবে না লইয়া গ্রন্থকার যদি দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রকাশকালে দোষগুলির সংশোধনের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখেন, তবে কেবল যে তিনি নিজের গ্রন্থের সার্থকতাই বৃদ্ধি করিবেন, এমন নহে, বাঙ্গালী পাঠকদিগেরও যথার্থ উপকার করিবেন।

এরূপ দোষ-গুণে জড়িত সুন্দর গ্রন্থখানির আদর যদি না হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু এখন আমাদের সমাজের দৃষ্টি অর্থনীতির দিকে যতটা পড়া আবশ্যক, তাহার তুলনায় কিছুই পড়ে নাই। সুতরাং ইহার আদর যে খুব বেশী হইবে, তাহা মনে করিতে সাহস হয় না। কিন্তু সে অনাদর গ্রন্থকারের অগৌরবের কথা হইবে না—আমাদের বর্ত্তমান সমাজেরই শিক্ষার দুরবস্থার পরিচয় দিবে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে হুগলীজেলার প্রভাব।

বর্ত্তমান সময়ে বহু মনস্বী বঙ্গভাষার অনুশীলনে নিরত হইয়া দীনা হীনা বঙ্গভাষার পুষ্টি ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিতেছেন। এখন প্রায় সকল জেলাতেই তাষার অঙ্গবৈকল্য দূরীকরণ ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সাহিত্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য, কেবল হুগলী জেলাতেই এই শুভ চেষ্টার চিহ্ন দেখা যায় না। ইহা সমগ্র জেলার পক্ষে কলঙ্কের কথা, সন্দেহ নাই। অথচ এই জেলার অতীত ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জ্বল। একদিন যখন বঙ্গসাহিত্যের উদ্দাম স্রোত বাঙ্গালার প্রান্তর ভাসাইয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, তখন এই জেলার কতিপয় ব্যক্তির প্রাণপণ চেষ্টার ফলেই,—বঙ্গভাষা-জননীর পূজার মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছিল। আজ এই পূজাক্ষেত্রে দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতেছে, কিন্তু এই গৌরবের দিনে অনেকেই সেই প্রথম মাতৃপূজকদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই পুরাতন-প্রসঙ্গ নূতন করিয়া স্মরণ করাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পলাশী-যুদ্ধে বাঙ্গালার শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, ইংরাজগণ অল্পে অল্পে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়া বসেন। বর্দ্ধমান বিভাগের শাসনভার সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের হস্তগত হয়, ইহা ঐতিহাসিক কথা। ইহার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোনরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও ইহার অব্যবহিত পরে হুগলী সহরে প্রথম মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ শীঘ্রই অচিন্তনীয় ভাবে অদ্ভুত ঘটনাবলীর সমাবেশে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে সর্ব্ব-প্রথমে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর বঙ্গীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ, সুযোগ্য ও সুপরিচিত সংস্কৃতাধ্যাপক লেফটেনাণ্ট সি উইল্‌কিন্স স্বহস্তে বঙ্গভাষার অক্ষরমালা প্রস্তুত করেন। নাথনি এল ব্রসি হালহেড নামক জনৈক ইংরাজ এই অক্ষরা-বলী সাজাইয়া একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহা প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ইহার পরই এই অক্ষর-খোদাই বিদ্যা শ্রীরাম-পুরনিবাসী পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি মহামতি উইল্‌কিন্স সাহেবের নিকট হইতে শিক্ষা শিখিয়া লন এবং পরে ভাগীরথী-সলিলবিধৌত শ্রীরামপুর সহরে বাপ্তিষ্ট মিসনারী সম্প্রদায়ভুক্ত মুদ্রাযন্ত্রের জন্য এক সেট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত

করেন। তাহার ফলস্বরূপ তখন শ্রীরামপুর হইতে মাসিক পত্রিকা ও বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়া দেশের শিক্ষার ও জ্ঞানের পথ বিস্তৃত করিয়া দেয়। শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সমুদয় বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি :—

কথোপকথন।—১৮০১ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পাদরী রেভারেণ্ড ডবলিউ কেরী জনসাধারণের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও উহার ইংরাজী অনুবাদ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। নিম্নে তাহার নমুনা দিলাম :—

আর শুনেছিস্ নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চোখে মুখে দেখে না। হ্যা দ্যাখ, কালী যে আমার ছেল্যা পথে দাঁড়িয়ে ছিল, তা ঐ বুড়ি মাগী তিন চার ছেল্যার মা, —করিল কি, ভরন্ত কলসিতা অমনি ছেল্যার মাথার উপর তলানি দিয়া গেল।

এই পুস্তক শ্রীরামপুর কলেজে ও সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

ইতিহাস-মালা।—১৮১২ সালে কেরী সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ইতিহাসের কোন কথাই নাই। রসময়ী ও চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় ১৫টি গল্প-সমন্বিত এই পুস্তক কেরী সাহেবের বঙ্গভাষাভিজ্ঞতারও অকাট্য প্রমাণ।

বত্রিশ সিংহাসন।—১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের মুদ্রণ-যন্ত্রে এই পুস্তক মুদ্রিত করেন। পরে লণ্ডন সহরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। নিম্নে এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল :—

"দৈবলৌকিকোভাবসামর্থসম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাবিংশ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল।"

ইহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থের ভাষা বৈচিত্র্যহীন বা নীরস নহে।

লিপিমালা।—আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেইকালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।
অতএব ভুলভ্রান্তি আছে সর্ব্বজনে।
মানব লক্ষণ বহু রামরাম ভণে॥

শকাদিত্য বসুশ্রেষ্ঠ পঞ্চশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ॥

উল্লিখিত গ্রন্থকালনিরূপণ পদ্যটি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, রামরাম বসু মহাশয় ১৮০০ সালের ভাদ্র মাসে এই পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক ২২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর প্রেসে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সদ্‌গুণ ও বীর্য্য।—এই পুস্তকখানি ১৮২১ সালে মুদ্রিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব ও বীরগণের কীর্ত্তিকলাপ লিখিত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য-চরিত্র।—১৮০১ অব্দে রাম রাম বসু মহাশয় শ্রীরামপুর হইতে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রথম। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি সুন্দরভাবে ছাপাইয়া তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত অভিধান।—১৮২৭ সালে মার্সম্যান সাহেব কর্ত্তৃত মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহাতে ২৫ হাজার শব্দ আছে। ইহার পূর্ব্বে ১৮০৯ সালে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি শব্দসিন্ধু নামক একখানি বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফষ্টার সাহেবের অভিধান ব্যতীত এরূপ বৃহৎ অভিধান বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় ছিল না।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবের নবোদিত সূর্য্যকিরণ যাঁহার সমুন্নত ললাটে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই শক্তিমান্ বঙ্গগৌরব রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম রাধানগরে,—হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত একটি দরিদ্র পল্লীতে। তাহার হৃদয়ে সাহিত্যের যে শুভ্র আদর্শ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে আজ বাঙ্গালা ভাষা বহুশক্তিশালিনী। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি আজন্ম সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালা গ্রন্থ বাঙ্গালায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার "ব্রাহ্ম সঙ্গীত" আজিও শিক্ষিত সমাজের আদরের ধন। "ব্রাহ্ম সঙ্গীত" ব্যতীত "ব্রাহ্মণ সেবধি" "পথ্যপ্রদান" "প্রার্থনা" "আত্মানাত্মবিবেক" "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" "আদালত তিমিরনাশক"

প্রভৃত বহু গদ্য পুস্তক তিনি রচনা করেন। তদ্ব্যতীত তৎকর্ত্তৃক বেদান্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি বঙ্গভাষাকে সুমার্জ্জিত ও সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইহার পর দেশময় সাহিত্যানুশীলনের চেষ্টা দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বড়া হইতে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হয়। তাহার পর শ্রীরামপুর হইতে "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত আরম্ভ হয়। ইহার কথা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

যে সময়ে বহু মনস্বীর চেষ্টায় বঙ্গভাষা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হুগলী জেলার কতিপয় ব্যক্তিই বঙ্গভাষার ভাগ্যবিধাতারূপে পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হুগলী জেলার সমুদয় সাহিত্যিকের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। তথাপি নিম্নে আমরা কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

গদাধর ভট্টাচার্য্য।—ইহারই চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। ইনি এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। এই পত্রিকাখানি মাত্র এক বৎসর বাহির হইয়া উঠিয়া যায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।—ইঁহার নিবাস গুপ্তিপাড়ায়। ইঁহার বহু কবিতা প্রচলিত আছে। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাণেশ্বর ও অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।—ইঁহার আদিবাস যশোহরের অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। কিন্তু ইঁহার কর্ম্মবহুল জীবন হুগলী জেলাতেই অতিবাহিত হয়। ইনি কেরী সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে, ইনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্করণের এক বিস্তৃত সমালোচনা "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন।—ইনি ত্রিবেণী-বাসী হলধর চূড়ামণির সন্তান। ১২৩৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সর্ব্বজনপ্রিয় বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গাচরণ সরকার।—সাহিত্যরথী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের পিতা। ১২৩০ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ঋতুবর্ণন, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা, পাঁচালীর গান প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া, তিনি আজীবন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।—এই মহাত্মার নাম শুনেন নাই, বাঙ্গালার এমন একজনও শিক্ষিত ব্যক্তি নাই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভূদেবের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "শিক্ষাদর্পণ" নামক মাসিক পত্র প্রচারিত করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী গৃহে গৃহে পঠিত। ১৩০১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সরকার-সম্পাদিত "নবজীবন" বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। এক বঙ্কিম-পরিচালিত "বঙ্গদর্শন" ব্যতীত ইহার সমকক্ষ মাসিক পত্র বাঙ্গালার আজিও দেখা যায় নাই। "নবজীবন" ব্যতীত কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রকাশিত "পূর্ণিমা" নামক মাসিক পত্রিকাও হুগলী জেলার সম্মান বহু দিবস অটুট রাখিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আজ কয়েক বৎসর হইল, এই পত্রিকাখানিও উঠিয়া গিয়াছে।

ইহা ব্যতীত আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিক নির্জ্জনে বসিয়া, সারাজীবনের সাধনা মাতৃপদে অঞ্জলি দিয়াছেন, আজ তাহাদিগের নাম বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই হুগলী জেলাতেই বসিয়া, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের জনকস্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন। কবি হেমচন্দ্র ও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই জেলার উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলাতেই বসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়া দেন। সাধু শিবচন্দ্র দে এখানেই সর্ব্ব-

প্রথমে বঙ্গভাষায় আরব্য উপন্যাস অনুবাদিত করিয়া মুদ্রিত করেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে, আজ আর আমাদিগের গর্ব্ব করিবার বড় বেশী কিছু নাই,—আছেন শুধু জরাজীর্ণ অক্ষয়কুমার ও সারদাচরণ; তাঁহারাই জেলার কৃতী সুসন্তান, দরিদ্রের আশা, কাঙ্গালের ভরসা, এবং সাহিত্যের গৌরব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং"।

(কবিপ্রিয়া কবিকে অলঙ্কারের জন্য প্রার্থনা করায় কবি এই কবিতা তাহাকে উপহার দিয়াছেন।)

তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি!
অঙ্গলতা গন্ধ-শোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি'।
আল্‌তা কোথা পর্‌বে তুমি?
ধরণী যে চরণ চুমি'
ভ'রে উঠে অশোকদলে, ভ্রমর ছুটে গুঞ্জরি'।
তোমার কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি?
তাম্বুলেতে কাজ কি তব, অধর তব অনেক লাল,
অঙ্গরাগ মাখ্‌বে কোথা, ফোটা কমল তোমার গাল,
স্বর্ণলাজে হবেই মাটী, হোক্ না কাঁচা, হোক না খাঁটী,
কাঁকণ মেখে মলিন হয়ে কাঁদবে দিবা শর্ব্বরী।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি?
কাজল তুমি পরবে কোথা, সেকি তোমার সাজবে ভাল,
কাজল হ'তে উজল তারা, যুগল ভুরু অনেক কালো।
তোমার অমন চিকণ চুলে,
কর্‌বে কি আর হীরের ফুলে,
নারীর ভূষণ পর্‌বে কি আর মায়াবনের অপ্সরি!
তোমায় কোথা ভূষণ দিব সুন্দরি?

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গ-বিধবা।

কবে কোন্ অতীতের বাসন্তী উষায়
সুমধুর বাঁশীর ঝঙ্কার,
দূর হ'তে ভেসে এসে তন্দ্রা-অভিভূত
পশেছিল শ্রবণে তোমার।

নিদ্রার অলস আঁখি পারনি মেলিতে,
তখন বোঝনি সেই গান,
কেবল সুরটি তার পরতে পরতে
মুগ্ধ করেছিল মনপ্রাণ।

কিন্তু হায়! যবে ভেঙ্গে গেল ঘুমঘোর,
স্তব্ধ হয়ে গেছে একেবারে
সে মধুর বাঁশী মরি! রেশটি কেবল
হৃদিমাঝে জাগাইছে তারে।

যে গান শুনিয়াছিলে জাগ্রত স্বপনে
আর না শুনিবে তাহা হায়!
আধফুট প্রেমকলি হৃদি-উপবনে
না ফুটিতে লুটাল ধূলায়।

জাগিলে কাঁদিতে শুধু. সুখের দুয়ারে
হয়ে গেল আত্ম-বলিদান
অজ্ঞাতে—জনমতরে। স্মৃতি-পদতলে
স'পে দিলে মুগ্ধ মনপ্রাণ।

ধরামাঝে মূর্ত্তিমতী সুররাণীরূপে
উজলিলে সেই দিন হ'তে
হে বঙ্গ-বিধবা-বালা! ঢেলে দিলে প্রাণ
সেইদিন লোকহিতব্রতে।

একোদ্দিষ্ট প্রীতি-প্রেম শতমুখ হ'য়ে
　উথলিয়া পড়িল ধরায় ;
বিশ্বেরে আপন ভাবি নিলে বুকে টেনে,
　সর্ব্বভূত মুগ্ধ করুণায়।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্র করিলে গ্রহণ—
　বঙ্গ-গৃহে আদর্শ-প্রতিমা
সেই দিন হ'তে তুমি। আজি কি ভাষায়
　বর্ণিব গো তোমার মহিমা !

কঠোর সমাজ ল'য়ে কঠিন শৃঙ্খল
　এল তোমা বাঁধিবার তরে,
নতশিরে স্মিতমুখে আপন ইচ্ছায়
　নিলে তারে তুলিয়া আদরে।

শুভকার্য্যে অমঙ্গলরূপিণী ভাবিয়ে
　সমাজ রাখিল তোমা দূরে,
বুঝিল না মূর্খ বঙ্গ তোমার আসন
　কত উচ্চে—কোন্ সুরপুরে।

তবু তুমি লোকাতীত আপন গৌরবে
　রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী সম ;
কি মহান্ লক্ষ্য তব ! অনন্ত মিলনে
　কি ধ্রুব বিশ্বাস মনোরম !

শ্রীপ্রমথনাথ দে।

স্মৃতি।

(১)

একে ত রজনী,—ধরা তাহে নিস্তব্ধতা ভরা,
নিকুঞ্জও সেই দূর কাননেতে হায়,
কুলবালা আমি একা, সখীদের নাহি দেখা,
ননদী পরম শত্রু ভুজঙ্গীর প্রায়;
এহেন সময়ে শ্যাম উচ্চকণ্ঠে অবিরাম
বাজায় মোহন বেণু কি করি উপায়।

(২)

একদিন এই বাণী কহিলা ব্রজের রাণী
স্বপনেতে ঘুমঘোরে প্রাণের ব্যথায়,
বৃন্দাবন পরিহরি' শ্রীমধুসূদন হরি
যখন করেন রাজ্য সুখে মথুরায়;
চেতনা পেয়েও পরে রাধিকা আবেগ-ভরে
হইয়া আপন-হারা উন্মাদের প্রায়,
যমুনার রম্যকূলে নিকুঞ্জে কদম্বমূলে
আসিলা নির্ভয়ে সেই গভীর নিশায়।

(৩)

ডাকিছে কোকিল-কুল, শোভিছে ফুটন্ত ফুল,
ছড়াইয়া চারিধারে সৌরভ-লহরী,
মত্ত হ'য়ে মধুপানে কি এক অস্ফুট তানে
গাহিছে আকুল প্রাণে ভ্রমর-ভ্রমরী;
পাতার ভিতর হ'তে ছোট ছোট ছিদ্রপথে
কেমন এসেছে জ্যোৎস্না আহা মরি মরি,
এ হেন সে কুঞ্জবনে না হেরে হৃদয়-ধনে
কহিতে লাগিল দুঃখে রাধিকা সুন্দরী।

(৪)

সেই ত তরুর কোলে সোহাগে লতাটী দোলে,
সেই ত কুসুম যত কাননেতে ফুটেছে,
সেই ত রে কুহুস্বরে কোকিল ঝঙ্কার করে,
সেই ত যমুনা-জলে কৈরবিনী শোভিছে,
মেঘশূন্য নভ' পরে সাজিয়া তারার হারে
ছড়ায় সুধার রাশি সেই শশী ওই রে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি শুধু সেই ছায়া দেখি,
সকলি ত তা'র স্মৃতি সে আমার কই রে।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীগৌর-স্মরণে।*

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

আজি মন্দ গন্ধবহ বহে কি আনন্দে।
ভ'রে গেছে সারা ধরা কি মধুর গন্ধে॥
সে গন্ধ-প্রমোদে, প্রমত্ত পিয়াসে,
ভকত-মধুপ, বুক-ভরা আশে,
ঘুরে ফিরে আসে, আকুল উল্লাসে,
মিলনের কুঞ্জে, মত্ত-মকরন্দে।
কি প্রেম-তরঙ্গ কি প্রবাহে ছুটে,
কি ভাব উথলি' বিশ্ব-ব্যোমে উঠে,
বিম্বে বিম্বে তার, শ্যাম ছবি ফুটে,
হরিগুণ-গাথা, উঠে কত ছন্দে—
আবার ফিরিয়ে, প্রেম-অনুরাগে,
নদীয়ার গোরা, ঘরে ঘরে জাগে,
ঐ সেই প্রেমিক, চলেছে গো আগে,
কোটি নরনারী, ঐ চরণ বন্দে॥

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

---

* (কলিকাতা) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর নবম মাসিক অধিবেশনে গীত।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সাহিত্যে জাতির যুগবিশেষের চিন্তাপ্রণালী ও ভাবরাশি একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যদি আমাদের জাতীয় সাহিত্য না হয়, তাহা হইলে জাতীয় সাহিত্য কাহাকে বলিব? সত্য বটে, ইঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, কারণ তাহাই তদানীন্তন যুগধর্ম্মকে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ইংরাজের সহিত পাল্লা দিবার মানসে, কোমর বাঁধিয়া কেতাব লিখিতে বসেন নাই। আর তাঁহাদিগকে যে মিল্‌টন, স্কট, বায়রণ প্রভৃতি একটা করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাহারও মূলে ইংরাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতারূপ হাস্যকর উদ্দেশ্য ছিল না, কিম্বা নবোন্মেষিত স্বদেশপ্রেমও সাধারণকে জাতীয় কবিগণের এরূপ নামকরণে প্ররোচিত করে নাই। আসল কথা এই যে, শিক্ষিত সমাজ এই সকল ইংরাজ কবির সহিত সমধিক পরিচিত ছিলেন বলিয়া কোন বঙ্গীয় লেখকে তাঁহাদের কাহারও সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইলে, তাঁহার সেই ইংরাজ কবি অনুসারে একটা নামকরণ করিয়া দিতেন। এ নাম ত একটা পোষাকী নাম। ইহা কেবল একটা ফ্যাসান ব্যতীত আর কিছু ছিল না।

আর বঙ্কিম প্রভৃতি ইংরাজীনবীশগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা কি সত্য সত্যই সাধারণ বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী ছাচে ঢালা? ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কমলমণি কি বাঙ্গালী ঘরেরই বধূ ও কন্যা নহেন? দেবী চৌধুরাণী, শ্রী ও শান্তির সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা যায় না সত্য। কিন্তু এগুলি কবির আদর্শ সৃষ্টি, তাই বাস্তব হইতে ইহাদের বিভিন্নতা। তবে বর্ত্তমান যুগের বঙ্গরমণী যে ঠিক কবিকঙ্কণের লহনা, ফুল্লরার মত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

একথা সত্য বটে যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রচনা-পদ্ধতিটা বিদেশ হইতে লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আমরা যেমন উপন্যাসের গঠন ও অবয়বের জন্য ইংরাজদিগের নিকট ঋণী, ইংরাজেরাও ত তেমনই তাহাদের নাটকের পরিকল্পনা কিয়ৎ পরিমাণে গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ

করিয়াছে। উপন্যাস জিনিষটাই আমাদের দেশে তখন সম্পূর্ণ নূতন ছিল; সুতরাং বৈদেশিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের উপন্যাসের আকার-গঠন কোন মতেই নিন্দনীয় হইতে পারে না। এখন যদি কেহ বলেন যে, প্রেমের কাহিনী লইয়া পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস-প্রণয়ন পাশ্চাত্য সমাজেই শোভা পায়, সীতা-সাবিত্রী-পদরেণু-পূত ভারতীয় সমাজে তাহা বড় বিসদৃশ বোধ হয়, তদুত্তরে তাঁহাকে শুধু এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যে সমাজে প্রেমমূলক (সংস্কৃত) নাটক বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে সমাজে প্রেম-কাহিনী-মূলক উপন্যাস চলিবে না কেন? তাহাই যদি হইল, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈদেশিকত্ব কোন্‌খানে!

মাইকেলের 'মেঘনাদ' বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ যে মেঘমন্দ্রে কম্পিত করিয়াছিল, রায়গুণাকর ও গুপ্ত কবির মৃদুবাদন-শ্রবণে অভ্যস্ত বাঙ্গালী তখন তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরে যখন তাঁহার কাব্য আদৃত হইতে লাগিল, তখন তাঁহাকে যে মিল্‌টনের সহিত তুলনা করা হইত, তাহা কেবল ঐ ইংরাজ কবির সহিত তাঁহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল বলিয়া। এই সাদৃশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফল, অনুকরণের নিদর্শন নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে বিদেশের জিনিষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাদ্বারা তিনি যে সুধাময় মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যে কি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় নাই? তার পর, হয় ত দান্তের 'ইন্‌ফার্ণো' হইতে তিনি রামচন্দ্রের প্রেতপুরী-দর্শনের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার সরস্বতী-বর্ণনা মিল্‌টনের Muse-আবাহনের অনুরূপ, এবং মিলটন যেমন তাঁহার মহাকাব্যে সয়তানকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিকতর গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন, আমাদের কবিও তেমন রাবণকে রামচন্দ্র অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ছোট বড় এরূপ সাদৃশ্য আরও অনেক থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাকে যদি অনুকরণ বলা যায়, তাহা হইলে মিল্‌টনও ভার্জ্জিলের এবং ভার্জ্জিল হোমরের অনুকরণ করিয়াছেন। এরূপ অনুকরণ সাহিত্যোন্নতির সহায়, পরিপন্থী নহে।

এই সময়কার অন্যান্য লেখকগণের সম্বন্ধেও যে এই কথাই প্রযোজ্য, তাহা

তাঁহাদের রচনাবলী এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শনের বোধ হয় প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাঁহারা যে সাহিত্য আমাদের দিয়া গিয়াছেন, আমাদের জাতির সাহিত্যভাণ্ডারে তাহা চিরসঞ্চিত হইয়া থাকিবে। কে বলিল ইহার সহিত বাঙ্গালী প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই? খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া যে একটা কথা এক সম্প্রদায় লেখকের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, তাহা যদি বাহিরের সহিত যোগশূন্য, পাশ্চাত্যপ্রভাবলেশবর্জ্জিত, প্রাচীনপন্থানুবর্ত্তী বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে এরূপ খাঁটি বাঙ্গালী একহস্তে মনু অপর হস্তে ভারতচন্দ্র লইয়া বঙ্গসমাজের ও সাহিত্যের বিশুদ্ধি-সম্পাদনে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও যুগপ্রভাব তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। একশত কি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী আর এখনকার বাঙ্গালী যে ঠিক এক নহে, তাহা কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? একথা অবশ্য আমরা অস্বীকার করি না যে, ব্যক্তির ন্যায় জাতির চরিত্রেও এমন কতকগুলি গুণ থাকে, যাহা বাল্য হইতে যৌবনে এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়, এবং তাহার সমস্ত ক্রিয়া ও প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে একটা বিশেষত্ব দেয়। ইংরাজের উদ্যমশীলতা ও আন্তরিকতা, জর্ম্মাণের অত্যধিক ভাবপ্রাচুর্য্য ও ইতালীয়ের ললিতকলানুরাগের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে কি বাঙ্গালী জাতির এই প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল লেখকই কি অল্পবিস্তর ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত নহেন? আর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ ইহাই নয় কি যে, তিনি স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিকে আরও বেশী ভাবপ্রবণ করিয়া তুলিতেছেন? তাহা হইলে আর এই সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকিবে না কেন?

তার পর আরও একটা কথা আছে। পাঁচকড়িবাবু বলিতেছেন যে, বঙ্কিম প্রভৃতি ইংরাজীনবীশগণের গ্রন্থাবলী ইহারই মধ্যে অনাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র ও দাশরথি রায় লোকে এখনও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলিতে চান যে, বর্ত্তমান সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয়স্পর্শ করে নাই; উহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। সমাজ উহা চায় না। "যদি কখনও বাঙ্গালা দেশটার

ষোল আনা ইংরেজী ভাবে গড়িয়া উঠে, ইংরেজী শিক্ষার পটু হয়, তবে তখন এই সকল কবি বাঙ্গালী জাতির কবি হইবে।" সুতরাং তাঁহার মতে এ সাহিত্যের আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্যকে স্থায়ী করিতে হইলে সমাজ যাহা চাহে তাহাই দিতে হইবে, 'সমাজের দিকে চাহিয়া, সমাজের অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়া এবং বুঝিয়া মাল সরবরাহ' করিতে হইবে। আগে তাহাই হইত। 'সেকালের বাঙ্গালী কবিগণ বাঙ্গালীর রুচি ও গ্রাহিকা-শক্তির ওজন বুঝিয়া কাব্য-পাঁচালী প্রণয়ন করিতেন।'

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, লেখক মহাশয়ের উক্ত মন্তব্যসমূহের একটিও আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, মাইকেল বঙ্কিম প্রভৃতির প্রতি লোক অনাস্থা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালার ভদ্রসমাজে এমন কয়জন লোক আছেন—আমরা শুধু ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের কথা বলিতেছি না—যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করেন নাই? মাইকেলের মেঘনাদ কিম্বা হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' হয় ত বেশী লোকে পড়ে না। কিন্তু যখন ঐ সকল গুরুগম্ভীর কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তখনও কি ঐগুলি এতদপেক্ষা অধিকসংখ্যক পাঠককে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইত? 'মেঘনাদে'র ন্যায় কাব্য হইতে রসোপভোগ করিবার ক্ষমতা যে রুচি ও শিক্ষাসাপেক্ষ, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? সেইজন্য এইরূপ কাব্যের চর্চ্চা চিরকালই অল্পলোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ইংরাজদের মধ্যেই বা এমন কয়জন আছেন, যাঁহারা সখ্ করিয়া মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' বা স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন্' পাঠ করেন? কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল বড় বড় কবির সাহিত্যিক মূল্যের কখনও হ্রাস হয় না। আর যদিও ইহা সত্য হয় যে, হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্য ও কবিতা এবং রঙ্গলাল, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পঠিত হয় না, তাহা হইলে, তাহার কারণ ইহা নয় যে, তাঁহারা বাঙ্গালীর প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য এই সকল কাব্য এই জাতির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন পাতিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাহার কারণ এই যে, নূতন যুগের প্রারম্ভে যে সকল কাব্য জাতিকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিল, সেগুলি এখনও ঠিক সেই ফল প্রসব করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। এখন আবার

রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ এমন সকল কবির অভ্যুদয় হইয়াছে যাঁহাদের কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় জাতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। লোকের রুচি ও ভাব প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাই একই যুগের কবি চিরকাল লোকের মানসরাজ্য অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রবন্ধের প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক নয় কি যে, বর্ত্তমানকালের কবিদিগের তুলনায় অতীতযুগের কবিদিগের পাঠক সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে? কিন্তু তাঁহারা কখনও বিস্মৃতির বন্যায় ভাসিয়া যাইতে পারেন না।

আর এ কথাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায় প্রভৃতির কাব্য-পাঁচালী এখন লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করে এবং ঐ সকল "খাঁটি বাঙ্গালী" কবির কাছে 'হেমনবীনের জারিজুরী' বেশী দিন খাটিবে না। যাঁহারা কোনরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন,—তা সে ইংরাজীই হউক কি সংস্কৃতই হউক—তাঁহারা কখনও কৃত্তিবাস-কাশীদাসে, কি ভারতচন্দ্র-দাশুরায়ে তাঁহাদের কাব্যতৃষ্ণা মিটাইতে পারেন না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। তাহা পরে বলিতেছি। একশত কি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার অনুন্নত বঙ্গসাহিত্যের কাব্যাদি বর্ত্তমান যুগের মার্জ্জিতরুচি বাঙ্গালীর তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। তবে এখনও যে ঐ সকল গ্রন্থের প্রচার এত অধিক, তাহার কারণ এই যে, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত পুরুষ কিম্বা রমণী মানসিক পরিণতির অভাবে বর্ত্তমান যুগের উন্নততর সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে অসমর্থ। এই সকল ব্যক্তি সম-সাময়িক যুগের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। শিক্ষার অভাবে যখন তাহারা স্বীয় যুগের সহিত যোগস্থাপনা করিতে পারিল না, তখন স্বভাবতঃই কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন যুগের গ্রন্থব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না। তাহাদের কাব্যপাঠ রসোপভোগের জন্য নয়, বৃত্তিবিশেষের চরিতার্থতার জন্য। তাই ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী যখন এই যুগের নানা সুষমামণ্ডিত কাব্যকুঞ্জে প্রবেশলাভের অধিকারী হইতে না পারে, তখন তাহাদের ভক্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া অতীত যুগের মহাত্মাগণের চরণে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর যাহাদের ধর্ম্মভাব বড় প্রবল নয়, অথচ কিছু না পড়িয়াও থাকিতে পারে না, তাহাদের পাঠ সাধারণতঃ বড় সুরুচিসঙ্গত হয় না। সুতরাং বিদ্যা-সুন্দরের ন্যায় পুস্তক যে এই শ্রেণীর লোকেরই পাঠ্য হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু এই সকল লোকের মুখ চাহিয়া ইহাদের 'রুচি ও গ্রাহিকাশক্তির ওজন বুঝিয়া' কি গ্রন্থ-প্রণয়ন করিতে হইবে? শুধু ইহাদের কেন, কাহারও রুচি ও গ্রাহিকাশক্তির ওজন অনুসারে ভাল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। 'সভা বুঝিয়া গান গাওয়া' কথাটা লেখকের বেলায় বড় খাটে না। যখনই এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ব্যর্থ ও অসার রচনায় তখনই সাহিত্যক্ষেত্র প্রপীড়িত হইয়াছে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ইংরাজী সাহিত্যের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। ইংরাজ সমাজের নৈতিক অবস্থা তখন যে কতদূর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

সাহিত্য যে সব সময়ে উদ্দেশ্যমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে; কারণ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে বসিলেই প্রায়ই আর্টের দিক থেকে হানি হওয়া সম্ভব এবং সেই উদ্দেশ্যও এইরূপে সুসিদ্ধ হয় কি না, তাহা সন্দেহস্থল। কিন্তু ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে, ভাল সাহিত্যমাত্রই পাঠকের শিক্ষা ও আনন্দ বিধান এই দুইটি উদ্দেশ্য স্বতই সাধন করে। লেখক হয় কিছু নূতন কথা বলিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করেন, নয় পুরাতন কথাই নূতনভাবে সুন্দররূপে বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করেন। (ইহাই সাধারণ নিয়ম, যদিও প্রতিভার সৃষ্টি এই সকল উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া বহু উচ্চে আপনার স্থান করিয়া লয়)। কিন্তু যে সাহিত্য সাধারণের রুচির অনুগামী, তাহা দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়? আর ঐরূপ সাহিত্যের প্রয়োজনই বা কি? সমাজ যাহা চায় তাহাই দিতে লেখক বাধ্য নহেন, সমাজের যাহাতে মঙ্গল হইবে তিনি তাহাই দিবেন।

এই কথাই আবার কবির পক্ষে একটু ভিন্ন আকার ধারণ করে, যদিও মূলকথা সর্ব্বত্রই এক। কবি কোন্ সুরে গান ধরিবেন তাহা তিনি পাত্র বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে পারেন না; যিনি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনও প্রথম শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। প্রকৃত কবির কবিতা এক স্বর্গীয় উন্মাদ-নার অভিব্যক্তি এবং এইরূপ কবি ব্যতীত বিশ্ব-সঙ্গীতের সুর মর্ত্ত্যবাসীর কর্ণে পৌঁছাইয়া দিতে আর কেহই সমর্থ নহে। ইংরাজ কবি টেনিসন তাই বলিয়া-ছিলেন—I do but sing because I must. এইরূপ প্রেরণার অনুভূতিই প্রকৃত কবির লক্ষণ। তাঁহার গান কেহ শুনিবে কি না তাহা তিনি ভাবিবার অবসর পান না; তিনি যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, সেইখানে সকলকে লইয়া

যাওয়াই তাঁহার কবি-জীবনের সার্থকতা। যদি কেহ তাঁহার সহিত যাইতে না চায়, তাহাতে তাঁহার বড় আসে যায় না। শেলীর চাতকের ন্যায় কবি এই পৃথিবীর অনেক উচ্চে এক অপূর্ব্ব সৌন্দার্য্যালোক-মণ্ডিত স্থান হইতে মর্ত্ত্যবাসীর উপর সঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতে থাকেন। *

অতএব সমাজ যাহা চায়, লেখক সব সময়ে তাহা দিতে পারে না, পারিলেও তাঁহার তাহা দেওয়া উচিত নয়। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যসেবিগণও যে লোকমত অনুসরণ করেন নাই, তাহা তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। প্রতিভার প্রেরণা যখন ভাবোন্মত্ত হৃদয়কে প্রকাশ-চেষ্টায় উদ্বোধিত করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন একদিকে সেই প্রতিভার স্ফুরণ, অপর দিকে আবার তাহার সমক্ষে নব নব ভাবকক্ষের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন করে, তখন যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে থাকে তাহা কখনও লোকমতের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা জাতির জীবনগতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় না; কারণ এইরূপ সাহিত্যেই জাতি আপন হৃদয়ের সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাইয়া পুলকাঞ্চিত হয়। নানাবিধ অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহা গড়িয়া উঠে এবং জাতির সুখ-দুঃখ, আশা-ভয়, উন্নতি-অবনতি, এক কথায় তাহার সমস্ত জীবন প্রতিভার আলোকে সেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে সার্থক করে। ইহা স্বতঃ অভিব্যক্ত, এইজন্য ইহা স্বাভাবিক; সাহিত্য-মাত্রই আবার মনুষ্যকৃত, সুতরাং ইহা কৃত্রিমও বটে,—কিন্তু ইহা আর্টের কৃত্রিমতা, অনুকরণের নহে। ইহা প্রতিভায় উজ্জ্বল, অনুভূতিতে সরস, আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ; ইহার ভাষায় মাধুর্য্য, ভাবে সৌন্দর্য্য, ভঙ্গীতে আবেগ। ইহা আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি।

তার পর ভাল সাহিত্য মাত্রেরই আরও একটা গুণ থাকে, তাহা বিশ্বের

---

* এই যে লোকমতনিরপেক্ষ অনুভূতি-প্রসূত কাব্যসাহিত্য, ইহার মধ্যে গীতিকবিতার স্থান অতি উচ্চে। ইহার তারে তারে এমন একটা উদার সার্ব্বজনীন সুর ধ্বনিত হইতে থাকে, যাহা সকল দেশের সকল যুগের লোকের হৃদয় সমবেদনা ও সহানুভূতির রসে সিক্ত করে। আমাদের দেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী এই শ্রেণীর কাব্য। প্রেম, সৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশে এ গুলি চির আদরণীয় হইয়াছে। তাই আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ সূর্য্যের ন্যায় এগুলি পুরাতন হইয়াও চির নূতন।

সহিত যোগ। সাহিত্য যতই পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহা ক্ষুদ্র জাতিগত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মানবের বিশালতার মধ্যে স্বীয় সফলতা ও সার্থকতার সন্ধান করে। বাল্মিকী, হোমার, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, হুগো, গেটে, এমার্সন, টলষ্টয় প্রভৃতি মহাকবি ও মহাজ্ঞানিগণ মিলিয়া কি আজ এমন এক দেশ-কাল-জাতি-নিরপেক্ষ উদার বিশ্ব-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই, যাহা জগতের যাবতীয় জাতির সমক্ষে চিরকাল ধরিয়া জ্ঞানের ও আনন্দের অফুরন্ত আলোক বিকীরণ করিবে? জ্ঞান ও কল্পনারাজ্যের এই মহাসভায় যে জাতি কখনও আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে না, অনন্তকালের মহাকাশে বিরাজমান দীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে যে সাহিত্য একটি জ্যোতিষ্কও উপহার দিতে পারে না, সে জাতির, সে সাহিত্যের গৌরব বা মহত্ত্ব কোথায়?

আজ ধন্য আমরা যে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানযুগে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির আসন পাইতেছেন; আর সে দিন বোধ হয় সুদূরপরাহত নয়, যে দিন গুণগ্রাহী বৈদেশিক জাতিসমূহ হুগো, গেটের সঙ্গে আমাদের কবির নামও উচ্চারণ করিবে। আমরা আমাদের আপন সাহিত্যকে এখন পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলাম না, আপন কবির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না,—ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যখন দেখি বঙ্কিমের উপন্যাস শুধু বাঙ্গালায় নয় সমগ্র ভারতে, শুধু ভারতে নয়, য়ুরোপে পর্য্যন্ত পঠিত হইতেছে, তখনও যদি বলিতে থাকি যে আমাদের সাহিত্য অসার, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরাই আত্মসম্মানহীন অসার জাতি। অনুকরণের, প্রতিযোগিতার সাহিত্যের ভাগ্যে কখনও এত সম্মানলাভ ঘটে না। এমন এক সময় ছিল বটে—যখন বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর নিকট সত্য সত্যই অনাদর ও উপেক্ষার বস্তু ছিল। অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে আজ যে তাহা বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার জন্য কোন স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে না করে? যে শিক্ষা ও সাধনা আমাদের রুদ্ধগতি জাতীয় জীবনে প্রবাহশক্তির সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে এই উন্নতির পথে আনিয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বৈদেশিক প্রভাবসঞ্জাত হইলেও যে অশেষ মঙ্গলদাত্রী হইয়াছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তুষারকল্প জাতীয় জীবন

রাষ্ট্রীয় অবস্থার উষ্ণতাপে দ্রবীভূত হইয়া এমন এক স্রোতোবেগ অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা উৎসারিত হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম্ম ও সমাজ পরিপ্লাবিত করিয়াছে। পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের পূর্ণ গৌরবার্জ্জন বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে; কোন না কোন দিকে ইহা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবেই। যতদিন না বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সমস্ত বাধাবন্ধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আপনার মনোমত পথে চলিতে সমর্থ হইবে, ততদিন ইহার পূর্ণ পরিণতি ও মহিমান্বিত সার্থকতা হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

কাটোয়ার মাঠে।

১

কথা ছিল, পাচক তেওয়ারি ঠিক সাড়ে দুপুরে পারঘাটে হাজির থাকিবে; সুতরাং যথাসময়ে এবং যথাস্থানে তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না।

পরপার হইতে মাইল পাঁচ ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে গেলে তবে রেল ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারা যাইবে। ট্রেণের আর দেড়ঘণ্টামাত্র দেরী আছে এবং ওপারের মাঠে যে অশ্বযানখানি আমার প্রতীক্ষা করিতেছে, সেখানি সেকরাগাড়ী পর্য্যায়-ভুক্ত। অতএব স্থির করিলাম, 'বিলম্বেনালম্'।

পারের কাণ্ডারী 'লগি' হস্তে গলুইএর কাছে দাঁড়াইয়াছিল; ইঙ্গিতমাত্রেই তরি ভাসাইয়া দিল। খেয়াঘাটের উপরে খড়ের ঘর ও নীচে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দ্বিতীয় নৌকাখানি ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া গেল; গঙ্গার মধ্যাহ্ন সমীর-সঞ্জাত বীচিমালা ছলচ্ছল শব্দে নৌকায় প্রতিহত হইতে লাগিল। নৌকা তীর-লগ্ন হওয়ার আর বিলম্ব নাই, এমন সময় তেওয়ারি ছুটিতে ছুটিতে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বামহস্ত বাম কর্ণের উপর স্থাপিত করিল এবং দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভীমনাদে তাহার আগমন ঘোষণা করিতে লাগিল। আমার সঙ্গী ভৃত্যটি গর্জ্জন করিয়া তেওয়ারিকে উপদেশ দিল, সে যে বখ্‌শিস কুড়াইতে গিয়া এই বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছে, সেই

বথ্‌শিস টঁ্যাকে গুঁজিয়া দিল খুস করিয়া ঘাটে বসিয়া থাকুক। আমরা তখন প্রায় তীরস্থ, সময়ও বহিয়া যাইতেছে। তেওয়ারি ও ট্রেণ এতদুভয়ের মধ্যে ট্রেণই যে প্রার্থনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং পাচককে পরদিন আসিবার আদেশ দিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

পাড়াগাঁয়ের পথে ঘোড়ার গাড়ী! গাড়ী কেরোসিন বাক্সের কাষ্ঠের তৈয়ারি,—হানি কি? গদির অয়েলক্লথের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া নারিকেলের ছোবড়া নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—বসিতে একটু লাগিবে বৈ ত নয়! সচল গাড়ীতে আরোহীর সর্ব্বাঙ্গের নর্ত্তন-কুর্দ্দনে পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িবার মত হইবে,—কিন্তু সত্যই ছিঁড়িবে না! মেঠো রাস্তায় পদব্রজে নয়, গোশকটে নয়,—একেবারে ঘোড়ার গাড়ীতে! চাপিতে তত না হোক, ভাবিতে কত সুখ!

গাড়ী অবিলম্বে শান্তিপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। এখানে স্থানে স্থানে বেশ গরুর গাড়ীর চর্চ্চা আছে, দেখিলাম। কোথাও গাড়ীহীন চাকা,—সবে মাত্র তৈয়ারি হইয়াছে; কোথাও চাকাহীন গাড়ী,—সম্প্রতি মেরামত হইতেছে। চা'ল, চিঁড়ে ও চিনির বস্তার আড়ালে বসিয়া মুদী খরিদদারকে জিনিস ওজন করিয়া দিতেছে। সত্যভামার তুলাদণ্ডের মত সত্যসন্ধ মুদীর তৌলযন্ত্র বাটথারার দিকেই ঝুঁকিয়া আছে। গাড়ী গ্রাম প্রায় ছাড়াইল। গৃহস্থ মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া ধূমপান করিতেছেন; গৃহমধ্যে তক্তপোষ, তক্তপোষের উপর সতরঞ্চ, তদুপরি তাকিয়া, তদগ্রে দেহরত্ন; তৈলমর্দ্দনমসৃণ ভুঁড়ি দৃশ্যমান; মুখ হুঁকায় এবং চোখ আমার গাড়ীর দিকে। আহারান্তে "আমরাই কেন পারি না আরামে করিতে শয়ন" ভাবিয়া দুঃখ হইল। পুরন্ধ্রীগণ কেহ কেহ গবাক্ষপথে উঁকি মারিতেছিলেন। রাজপথের পার্শ্বেই বিদ্যালয়। তখন ক্লাস চলিতেছিল। শিক্ষক মহাশয় দড়ি ও খড়ি লইয়া বোর্ডের উপর জ্যামিতির বৃত্ত আঁকিতেছিলেন।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তখনও গাড়ী আসে নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে একটু স্বচ্ছন্দে বসিবার স্থান পাইলাম না। একটি ভদ্রলোক যাত্রী আপিস ঘরে বসিয়াছিলেন; ষ্টেশনের একটি বাবু তাঁহাকে খেদাইয়া বাহির করিয়া দিলেন। বাবুটি ময়লা ধুতির উপর তালি-দেওয়া চাপকান্ পরিয়া থাকেন, ইংরাজী অক্ষরপরিচয় তাঁহার হইয়াছে, দুই

একজন নীল কোর্ত্তাপরা জমাদার তাঁর তাঁবেদার, বেতনও যে কিঞ্চিৎ পান না এমন নহে। সুতরাং কার্য্যটি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাহা হউক, শীঘ্র গাড়ী আসিয়া পড়ায় আর রৌদ্র ভোগ করিতে হইল না।

২

রাণাঘাটে রাত্রি-যাপন। পরদিন সকালবেলা লালগোলার ট্রেণ ধরিলাম। বেলা প্রায় তুইটায় আমার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। প্রথমে কোনরূপ যানেরই সন্ধান পাইলাম না, পরে অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি গরুর গাড়ী মিলিল। বিছানা করিয়া গাড়ীতে শুইয়া পড়িলাম।

গোশকটের উৎপত্তির ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। কমলাকান্তের মতে ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার একটি সুফল। আমি মনে করি, আর্য্যসভ্যতার দ্বিতীয় সুফল—এই গোযান। সেকালে পুষ্পকরথ এবং অর্ণবযানের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্যদিগের কুটুম্বেরা কিছু ত্রিশঙ্কুর ন্যায় আকাশে অথবা দায়মলের আসামীর মত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাস করিতেন না। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার এবং সুদূর গ্রামে ফলাহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্যই বোধ করি তাঁহারা গোশকটের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তখন রোড্‌সেস্ ও পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ছিল না, রাস্তা-ঘাট কোথা হইতে আসিবে?—অন্যবিধ ফলের অস্তিত্ব সে যুগে সম্ভবে না। আর এই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড লোক্যাল বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটির দিনেও কেহ গোরুর গাড়ীর বিলোপ ঘটাইতে পারিল না! স্থলে ও জলে অব্যাহতগতি এমন উভচর যানের যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মনীষী আর্য্যঋষিদিগকে আমি উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

সমাধিমগ্ন মধ্যাহ্ন প্রকৃতির ধ্যানভঙ্গ করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। ঘন ঘন গাড়োয়ানের তালুর সহিত জিহ্বার সংস্পর্শজনিত টক্ টক্ শব্দ এবং তৎসঙ্গে গোরুদু'টির পশ্চাদ্ভাগে প্রহারের ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গাড়ী মাঠের উচ্চাবচা ভূমিতে ক্রমাগত ঠক্কর খাইয়া সেবনের পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক ঔষধের শিশির মত সমস্ত শরীর ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে চলিল। ভৈরব দোলায় দোল খাইতে খাইতে আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম!

তন্দ্রার ঝোঁকটা ছুটিয়া গেলে দেখিলাম, গাড়ীর ভিতর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় কাটোয়ায় পৌঁছিবার কথা, সুতরাং আশান্বিত হইয়া

পর্দ্দাটা তুলিলাম। দেখিলাম গগনমণ্ডল জলদজালে সমাচ্ছন্ন; ধূম্রবর্ণ মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত নিরন্ধ্র আকাশে বক উড়িতেছে। ভীত হইয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাটোয়া আর কতদূর? সে কহিল, "আজ্ঞে, এই মাঠটা পার হ'লেই —এটা কাটোয়ার মাঠ।"

গাড়োয়ানের ভাষা বিশেষ ভরসাজনক বোধ হইল না। প্রশ্ন করিলাম, "কাটোয়ার মাঠ কেমন ক'রে? গঙ্গা পার হ'লে ত কাটোয়া?" কিন্তু সে অবিচলিতভাবে উত্তর দিল, "গঙ্গা পার হইলে কাটোয়া সহর আরম্ভ,—এইটাই কাটোয়ার মাঠ!"

অদূরে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে একখানি গ্রাম দেখা দিল। পুচ্ছমর্দ্দনপূর্ব্বক প্রহার করিতে করিতে গাড়োয়ান বলদদুটাকে সেইদিকে চালাইল। হটর্ হটর্ শব্দে গাড়ী ছুটিল, কম্পান্দোলনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী ছুটিল, কিন্তু পাড়ি জমান গেল না। অচিরে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস এবং মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। গাড়ীর সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ ট্রাঙ্কের উপর জলের স্রোত বহিল। চালনীর সহস্র ছিদ্রপথে যেমন করিয়া গোধূমাদির চূর্ণ ঝরিতে থাকে, তেমনি করিয়া গাড়ীর ছাপ্পড় ফুঁড়িয়া বিছানার উপর সহস্রধারা নামিতে লাগিল। যথাসম্ভব গুটাইয়া নীচের কম্বল উঠাইয়া লইলাম, এবং সেখানি মুড়ি দিয়া বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে চলিলাম।

৩

সৌভাগ্যবশতঃ অনতিবিলম্বে গাড়ী একজন মুসলমানের বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্থের নাম আমীর সেখ। চারিদিকে পাতার বেড়া দেওয়া একখানি খড়ের ঘরে চটের বস্তার উপর বসিয়া সে বিচালি কাটিতেছিল। আমি ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র আমীর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিল এবং আমার বসিবার জন্য একখানি মাদুর পাতিয়া দিল। গাড়ী হইতে আমার বাক্স বিছানা প্রভৃতিও নামিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলাম।

আমীর বলিল, বৃষ্টি শীঘ্রই থামিবে বটে, কিন্তু গন্তব্য পথের বাকীটুকু অন্ধকারে না যাওয়াই ভাল। তাহার ঘরে ঘি ময়দা গুড় ইত্যাদি যাহা আছে তাহাতে আমার মত অতিথির সৎকার সম্ভবে না। গ্রামের মুখুয্যেরা সঙ্গতিপন্ন,

তাঁহারা আগন্তুক ভদ্রলোকদিগের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন ; আমি একটু বিশ্রাম করি, ঝড় বাদল থামিয়া গেলে সে আমাকে মুখুয্যেদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবে। এই মুসলমান গৃহস্থটির অতিথিবাৎসল্য দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় মিলিল বলিয়া দুশ্চিন্তার বোঝা লঘু হইয়া গেল।

ঝড় জল থামিল, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইল না। মেঘান্ধকারময়ী সন্ধ্যা আসিয়া বনচ্ছায়াময় গৃহপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমীরের ঘরে কেরোসিনের ডিবিয়া এবং আমার লণ্ঠন জ্বলিল। বিলম্ব করিলে আবার দুর্য্যোগ আরম্ভ হইতে পারে ভাবিয়া আমরা মুখুয্যেদের বাড়ী রওনা হওয়ার উদ্যোগ করিলাম।

আমীর লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইল। কখনও তরুশ্রেণীর নীচে মাঠের একপেয়ে পথ ধরিয়া, কখনও বা ডোবার ধারে বড় বড় সিক্ত ঘাস পদদলিত করিয়া আমরা চলিলাম। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি তারা উঁকি মারিতেছে, পথের ধারে খানার জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব হাসিতেছে। ভেকের গর্জ্জন থাকিয়া থাকিয়া ঝিঁঝির অবিরাম সুরে তাল দিতেছে। নৈশপ্রকৃতির দীর্ঘনিশ্বাসের মত বায়ুহিল্লোল এক একবার বাঁশঝাড় আন্দোলিত করিয়া চলিয়া যায়,—বাঁশের পাতা সর্ সর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, ঝর্ ঝর্ করিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরিয়া পড়ে।

মুখুয্যেদের দালানে আসিয়া উঠিলাম। ভৃত্য গোরুর গাড়ীতে বাক্স বিছানা লইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছিল। গৃহস্বামীদের কাহারও দেখা পাইলাম না। আমীর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

দালানের এক পাশে শতরঞ্চ পাতিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় গেরুয়া-পরা মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, একজন লোক দালানে আসিল এবং আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া দরজার তালা খুলিয়া পাশের কুঠুরীতে প্রবেশ করিল। মিনিট পাঁচ সাত পরে আর একজন গেরুয়াধারী পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইল এবং কুঠুরীর মধ্যে বসিয়া উভয়ে অনুচ্চস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিল।

ধাঁ করিয়া আমার মাথায় একটা ভাবনা ঢুকিল। তন্ত্রমন্ত্রের কোন কোন উপাসক ত গেরুয়া পরিয়া দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি করিয়া থাকে। শুধু গেরুয়া

নয়, তৎসঙ্গে ঝাঁকড়া চুল এবং মোটা বাঁশের লাঠি। ঝাঁকড়া চুল কেন? এ গ্রামে কি ক্ষৌরকারের অভাব আছে?—সম্ভব নয়। তার পর লাঠি,—গিঁট-ওয়ালা মোটা বাঁশের লাঠি। পাড়াগাঁয়ে পিচ্ মলাক্কা কেইন্ প্রভৃতি [illegible]লিত নাই বটে, কিন্তু অতখানি মোটা বাঁশে[illegible] প্রয়োজন কি? লাঠির স্থূলতা অতিথি-পরায়ণ গৃহস্থোচিত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ঐ গিঁটগুলি; অনায়াসে মাথা ফাটান ভিন্ন উহাদের আবশ্যকতা কি আছে? আমার পরিচয়-জিজ্ঞাসা, কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি কিছুই করিল না। এরূপ ব্যবহার অতিথিসৎকারের অঙ্গীভূত নহে। সর্ব্বশেষে কুঠরীতে অনুচ্চ স্বরে উভয়ের পরামর্শ। নিশ্চয় একটা ঘোর ষড়যন্ত্র হইয়াছে! আমীর লোকটাও এই দলেরই একজন, সন্দেহ নাই, নহিলে সে আমাকে এখানে রাখিয়া যাইবে কেন? তার ঘরে ঘি, ময়দা ও গুড় আছে, এ সব সামগ্রীতে অতিথিসেবা হয় না, কে বলিল? ময়দার লুচি গড়িয়া ঘিয়ে ভাজিয়া গুড় দিয়া দিব্য আহার চলিত। হায় রে, বিদেশে বিঘোরে শেষটা শেষটা ডাকাতের হাতে প্রাণটা গেল! আমার সঙ্গে ত দামী জিনিস কিছুই ন্যাই। বাক্সে থানকতক বই ও জামা কাপড়, এবং কোটের পকেটে মণিব্যাগে ছ' টাকা সওয়া সাত আনা মাত্র। আর বিছানার তোষকটাও মামুলি রকমের—খেরুয়ার প্রস্তুত। গেরুয়াধারীদিগকে এ সব ছাড়িয়া দিলে হয় না? তবুও কি ইহারা আমার মাথা ফাটাইবে?

আশার একটি ক্ষীণ সূত্র এই দেখিতেছি যে, বাড়ীটি পাকা ও বেশ বড়; চণ্ডীমণ্ডপ এবং পূজার দালানও আছে। কিন্তু ডাকাতেরা কি লুণ্ঠিত অর্থে পাকা বাড়ী করে না? বাধা কি? শোনা আছে, কালীপূজা না করিয়া ইহারা দস্যুতায় প্রবৃত্ত হয় না। তার পর গৈরিক বসন। শাক্ত মন্ত্র এবং বৈষ্ণব মন্ত্র—দুই মন্ত্রেই ইহার ব্যাখ্যা হয়;—ঠগী ও বৈরাগী উভয়েই পরিয়া থাকে। গেরুয়ার পারমার্থিক লক্ষণ ভিন্ন আর্থিক লক্ষণও একটা আছে; ধোপার খরচ কমে, যেহেতু ধুতি কাচাইতে হয় না। সুতরাং জিঘাংসাবৃত্তির সহিত গৈরিক বস্ত্রের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। মোটা বাঁশের লাঠি, পাকা বাড়ী, কোঁকড়া চুল, চণ্ডীমণ্ডপ, আমীর সেখ এবং গেরুয়া—এতগুলি বিভিন্ন সামগ্রীর সন্তোষ-জনক সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আশা ও নিরাশার ঘাতপ্রতিঘাতে আমি কিঞ্চিৎ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সজ্ঞান হইলে দেখিলাম, একজন গেরুয়াধারী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ দিকে আর কখনও আসেন নাই বুঝি?" চকিতের ন্যায় মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, মাথা ভাঙ্গে নাই, বাক্সটাও যথাস্থানে আছে। প্রশ্নটি রহস্যপূর্ণ বোধ হইল; মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "উঁহু"।

"ঝড়-জলে আপনার বড় কষ্ট হ'ল।"

"হুঁ"।

কিছুক্ষণ পরে আহার্য্যসামগ্রী আসিল। আহার করিতে করিতে ভয় হইল, খাদ্যদ্রব্যে বিষ নাই ত! লাঠিতে মাথা ফাটে বটে, কিন্তু কার্য্যটি কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য; মিছামিছি চেঁচামিচি হওয়ার একটা আশঙ্কাও আছে। কিন্তু বিষের ক্রিয়া বেমালুম,—প্রক্রিয়াটি বিশেষ সুবিধাজনক। তবে তখন ক্ষুধাও ভীতিতুল্যপরিমাণে বলবতী;—যা থাকে কপালে ভাবিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ফেলিলাম।

কিছুতেই ঘুমাইব না মৎলব ছিল; কারণ শুনিয়াছি, বিষপায়ীদিগের পক্ষে নিদ্রা সাংঘাতিক। কিন্তু ভৃত্য বিছানা করিয়া রাখিয়াছিল; আহারান্তে শয্যা অতীব লোভনীয় মনে হইল। তৈয়ারী ভাতের পরে তৈয়ারী বিছানা কে ছাড়িতে পারে? লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিলাম এবং ঘরের কড়িগুলি গণিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম, শুইয়া যদি তন্দ্রা আসে, জাগিলেই লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে চাহিয়া দেখিব, কড়িগুলি সংখ্যায় ঠিক আছে কি না! জ্ঞান চৈতন্য বজায় থাকার সেইটাই প্রমাণ।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শয়নমাত্রেই গাঢ় নিদ্রা! স্বপ্ন দেখিলাম মরিয়া স্বর্গে গিয়াছি। ইন্দ্র মাতলিকে আদেশ করিলেন, ইহাকে কাটোয়ায় পৌঁছাইয়া দাও। মাতলি গাড়ীতে বয়াল দু'টা যুড়িয়া আমাকে আরোহণ করিতে আহ্বান করিল। আমি ভয়ে ভয়ে উচ্চৈশ্রবার কথা তুলিতে যাইতে-ছিলাম, এমন সময় গাড়োয়ানের ডাকে-হাঁকে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। প্রাণটা ছ্যাঁং করিয়া উঠিল। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?" সে বলিল, "মিয়াজান।"

দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

যিনি নানাদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের আচার্য্য; কাশ্মীর, জয়পুর, ইন্দোর, কাশী, দ্বারবঙ্গ, হাথুয়া প্রভৃতি স্থানের ইন্দ্রতুল্য অধীশ্বরগণ যাঁহার পাদ-মূল্যে ভূপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেন, যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে হিন্দুমাত্রেরই মস্তক ভক্তিভরে অবনত হয়, আজ সেই পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর পবিত্র জীবনী সংক্ষেপে "অর্ঘ্যে"র পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

দক্ষিণাপথে হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত কল্যাণী নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-বংশে সঙ্গমলালের জন্ম হয়। ১৭২৭ শকাব্দে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই সঙ্গমলালের ঔরসে রাজী বাইয়ের গর্ভে মহাপুরুষ বিশুদ্ধানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এই বালকের 'বংশীধর' নামকরণ করিয়াছিলেন।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর জীবন-বৃত্তান্ত নানাবিধ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহার বিশদ বর্ণন ঐহিকসর্ব্বস্ব ইদানীন্তন লোক-সমাজের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। অদ্য আমরা কেবল স্বামীজীর লৌকিক-জীবনের আংশিক বিবরণ প্রকাশ করিব।

স্বামীজী অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় তাঁহার বাল্যজীবন মাতুলের সংসারে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল সবসুখরাম হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। মাতুলের যত্নে স্বামীজীর বাল্যশিক্ষা সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বামীজী নানাবিধ অস্ত্রচালনা-কৌশল এবং অশ্বারোহণ-দক্ষতায় তদ্দেশীয় তদানীন্তন যুবক-সম্প্রদায়ে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী এই যৌবনের প্রারম্ভে মাতুলের চেষ্টায় ও স্বকীয় কার্য্যকুশলতা-প্রভাবে হায়দ্রাবাদের রাজ-সরকারে সৈনিক-বিভাগে একটী উচ্চপদ লাভ করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর স্বকীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াই স্বামীজী যেন নিজেকে ক্লান্ত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী একদিন ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি এই সৈনিক

বিভাগে কার্য্য করিতেছি, কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারিলে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিব। কিন্তু ইহাই কি আমার মনুষ্য-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট? বিবাহ করিব, পুত্র-কন্যা হইবে, সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিয়া বৃদ্ধকালে আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত হইয়া দেহত্যাগ করিব। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই গতানুগতিক ন্যায়ে কার্য্য করিবার জন্যই কি আমাকে মরজগতে পাঠাইয়াছেন? এইভাবে সাংসারিক যাত্রা-নির্ব্বাহও সকলেই করিয়া থাকে। সংসারের এই পথ সম্পূর্ণ পুরাতন; আমি সংসারে এই সাধারণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া স্বীয় জীবনকে তিক্ত করিতে চাহি না। আমি রাজদত্ত-পদ পরিত্যাগ করিব।" স্বামীজী এইরূপ আরও কত ভাবিলেন। কি জানি কেন তিনি ইহার পরদিনই কাহাকেও কিছু না বলিয়া হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। বাল্যের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সহচর-গণ, স্নেহার্দ্রহৃদয় গুরুজনবর্গ, চিরপরিচিত জন্মভূমি—কাহারও মমতাবন্ধন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সমুদ্রের খর-প্রবাহে সামান্য তৃণখণ্ডের মত, বৈরাগ্যের দুরতিক্রম প্রভাবে তাঁহার সকল মায়া-মমতা ভাসিয়া গেল। স্বামীজী প্রফুল্লচিত্তে ব্রহ্মচারী-বেশে পথের যাবতীয় ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গোদাবরী-তীরবর্ত্তী 'নাসিক'-তীর্থে উপনীত হইলেন এবং সে স্থানে এক আশ্রমে থাকিয়া নিয়তভাবে বেদাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে নির্ব্বাসিত পেশোয়ারাজ এই সময়ে 'বিঠুরে' বাস করিতেন বলিয়া সে স্থানে নানা দেশীয় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। বেদাভ্যাস-সমাপনান্তে স্বামীজী নাসিক হইতে এ বিঠুরে সমাগত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক রাঘবেন্দ্রাচার্য্যের নিকটে পাণিনীয় ব্যাকরণ, মহাভাষ্য, শেখর, মনোরমা, ভূষণ, মঞ্জুষা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। স্বকীয় লোকাতীত প্রতিভাপ্রভাবে স্বামীজী উক্ত সমস্ত গ্রন্থেই অতিমাত্র ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এই বিঠুরে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।

স্বামীজী এই স্থান হইতে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পদব্রজে হরিদ্বারে আগমন করেন। যোগশিক্ষার উপযোগী স্থান মনে করিয়া তিনি কনখল দক্ষেশ্বরের মন্দিরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। কনখল হইতে তিনি হিমালয়াদি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশে বারাণসী-ধামে সমাগত হইলেন।

এই সময়ে সর্ব্বজনসুপ্রসিদ্ধ গৌড়স্বামী, দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরে বিশ্ববিশ্রুত মহিলা অহল্যা বাইয়ের ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে ভারতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে গৌড়স্বামীর ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ আর কেহই ছিলেন না। স্বামীজী ইঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মীমাংসা-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়স্বামী, বিশুদ্ধানন্দের অলৌকিক বুদ্ধি-প্রতিভা-দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। গুরু গৌড়স্বামীর সাদর অধ্যাপনার গুণে ও স্বীয় নৈসর্গিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা-প্রভাবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ অল্পদিনেই সমগ্র দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার যশোরাশিতে দিগন্তরাল পরিপূর্ণ হইতে চলিল। স্বামীজীর তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য, অসাধারণ প্রতিভা, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলী তখন জনসমাজের একটা আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল।

যে সময়ে বিশুদ্ধানন্দ প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, সেই সময়ে পরমহংস গৌড়স্বামী ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই জাগতিক রীতি—

"যাত্যেক তোঽস্তশিখরং পরিরোষধীনা
মাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর মেকতোঽর্কঃ।"

বারাণসীর পণ্ডিত সমাজ এবং অভিজাত বংশের সাগ্রহ অনুরোধে পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী গৌড়স্বামীর রিক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গৌড়গোস্বামীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া নানাদেশীয় ভক্তিনম্র জ্ঞান-গরীয়ান্ বিদ্যার্থিগণকে ষড়্দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বামীজী সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইলেও বিদ্যাকামিগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না—অধ্যাপনা-ব্যসনে আসক্ত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রতিভাবতার ৺ তারাচরণ তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, স্বামী মনীষানন্দ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কাশিরাজসভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি বরেণ্য অধ্যাপকগণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্ত-মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। গৌতমকল্প মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বামীজীর ছাত্র না হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ সম্মান করিতেন। বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়েও স্বামীজীর অনেক শিষ্য আছেন।

এক সময়ে "আর্য্য" সমাজে"র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ, কাশীতে সমাগত হইয়া পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর সহিত বিচার করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন। কাশীনরেশ স্বর্গীয় মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের অধিনায়কতায় তাঁহারই প্রাসাদে কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিচারসভা আহূত হয়। সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতপ্রচারী দয়ানন্দ স্বামীর মতখণ্ডনই সভার উদ্দেশ্য ছিল। দয়ানন্দের সহিত প্রথমে স্বামীজীর ছাত্র ৺ তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের বিচার হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী তাহাতে পরাজিত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীজীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বামীজীর অমিত পাণ্ডিত্য-বৈভবের নিকট দয়ানন্দ সরস্বতী বালকের ন্যায় পরাজিত হইলেন,—তাঁহার কোনও যুক্তিই সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। এই বিচারবিভ্রাটের পরই দয়ানন্দ সরস্বতী বারাণসী পরিত্যাগ করেন।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একদিকে যেমন দয়াদাক্ষিণ্যাদির প্রতিমূর্ত্তি, অন্যদিকে তেজস্বিতায় দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসমান। রাজাই হউন, বা মহারাজই হউন, স্বামীজী কাহারও বিন্দুমাত্র দাম্ভিকতা বা অনধিকারচর্চ্চা সহ্য করিতে পারিতেন না।

স্বামীজী প্রত্যহ বহুপরিমাণে সিদ্ধি খাইতেন। একদিন তাঁহার সিদ্ধি খাইবার সময়ে একজন দেশীয় রাজন্য সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে অপ্রস্তুত করিবেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামীজী, সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি?" বুদ্ধিমান্ বিশুদ্ধানন্দ এ প্রশ্নরহস্যের মর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন। এ ধৃষ্টতা স্বামীজীর অসহ্য হইল, তিনি উত্তর করিলেন, "তোমরা ত অতি সামান্য, মান্ধাতা, পুরু, রঘু প্রভৃতি অমিতবিক্রমশালী নরপতিবৃন্দকে যিনি তৃণতুল্য মনে করিতে পারেন,—কাহারও নিকট যাঁহার কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী—বুঝিলে ত? প্রশ্নকর্ত্তা রাজা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।

হাতুয়ার স্বর্গীয় মহারাজ ৬০০৲ শত টাকা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীবাস করাইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর আশ্রমে যান। স্বামীজী, মহারাজের মুখে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীবাস করাইবার ব্যবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, "রাজা, এতদিন কেবল হাতী ঘোড়া পুষিয়াছ, এইবার একটী

শ্লাঘনীয় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অর্থের সদ্ব্যবহার ত এইরূপেই করিতে হয়।" যাইবার সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইলেন—

"যদানন্দাবাপ্ত্যৈ বপুরপচয়ে রাজহৃদয়ে
কৃপারাশিঃ কাশীস্থিতিমনিশমাসাদয়তি মাম্।
অহো ভাগ্যং যস্মাদ্ ভগবদবলোকং কৃতবতো
বিশুদ্ধানন্দোঽসৌ বিশতি ধৃতমূর্ত্তির্মম দৃশৌ॥"

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিব বলিয়া মহারাজ আমাকে কাশীবাস করাইলেন। আমার সৌভাগ্য, আজ সেই বিশুদ্ধানন্দ সশরীরে আমার নয়নের সম্মুখে বিরাজমান!

স্বামীজী গুণবানের একান্ত সমাদর করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাস করিলে পর তাঁহার সহিত ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় আলাপে স্বামীজী এতই সন্তুষ্ট হন যে, সমাগত রাজা মহারাজ প্রভৃতির নিকট 'গৌতম কণাদের মূর্ত্তি' বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিচয় দিতেন।

স্বামীজীর স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত। একবার কাহারও সহিত পরিচয় হইলে সে ব্যক্তি আবার দশ বৎসর পরে আসিলেও তিনি তাহার সকল সংবাদ বলিতে পারিতেন।

সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি স্বামীজীর অতিমাত্র অনুরাগ ছিল। তাঁহারই আজ্ঞায় কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ রণবীর সিংহ কাশীধামে এক সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্রের স্বপাকভোজনের বা ভোজনোপযোগী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি এই সংস্কৃত বিদ্যালয় শ্রীমতী বাসন্তীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

দ্বারবঙ্গের মহারাজও স্বামীজীর প্রীতিকামনায় বারাণসীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যামন্দির স্থাপিত করেন। এই উভয় বিদ্যালয়েরই তত্ত্বাবধান স্বামীজী নিজে করিতেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের জীবনের সকল ঘটনা বিস্তারে বলিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র কলেবরে সে আলোচনা সম্ভবপর নহে। বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব দয়াপরতা, অসাধারণ দাক্ষিণ্য,

সমুচিত গুণগ্রাহিতা, তাৎকালিক জনসমাজকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একবার যিনি স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সদ্ব্যবহারে চিরানুগত হইয়াছেন।

এইরূপে নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মসম্পাদকের মাহাত্ম্যে আজীবন সকল লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া ১৮২১ শকাব্দে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে ৯৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

স্বামীজীর মৃত্যু-বৃত্তান্তও অপূর্ব্ব। তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে নিজের সমস্ত আসবাব—ভাল ভাল শাল, স্বর্ণরৌপ্যাদি-নির্ম্মিত বিবিধ তৈজস সামগ্রী প্রভৃতি কাশীস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে বিতরণ করেন। স্বামীজী প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতল জল পান করিয়া বমন করিতেন। যেদিন শরীর পরিত্যাগ করিবেন, সেইদিনও যথানিয়মে বমন করিলেন। কিন্তু এ দিন বহু পরিমাণে রক্তবমন হইল। স্বামীজী শিষ্যগণকে অনুমতি করিলেন,—"আমাকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া চল।" ভক্ত শিষ্যবর্গ আদেশ প্রতিপালন করিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে শীতলামন্দিরের নীচে এক প্রস্তরময় স্তম্ভের উপর পশ্চাদ্ভাগে উপাধান রাখিয়া স্বামীজীকে উপবেশন করান হইল। স্বামীজী বসিয়া বসিয়া সজ্ঞানে—যেন স্বেচ্ছায় শরীর পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞান-মন্দিরের স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল!

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

পুস্তক পরিচয়।

"শতদল" ও "বনতুলসী"—শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত।

আজিকালিকার কবিদিগের কাব্যগুলির যাঁহারা নিন্দা করেন, "আয়েস" বলিয়া পায়েসের মত মিষ্ট যে একটি অনুভূতি আছে, তাহার কখনও বোধ করি, তাঁহারা রসগ্রহ করেন নাই। জয়দেব তাঁহার "শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দমে"র সূচনায় মার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধাসহকারে বলিয়াছেন, যদি "ললিত-মধুর-কান্ত-পদাবলীম্" শুনিতে হয়, "শৃণুতদা জয়দেব সরস্বতীম", আমরাও বলি, কাব্য-কল্লোলিনীর মধ্যে যদি ললিত শব্দের লহরী-লীলা দেখিতে চাও, তবে বর্ত্তমানের অজ্ঞাত ও অখ্যাত কবি-কোকিলদিগের কাব্যকুহরণ কর্ণাধঃকরণ কর। বলিতে কি, উষ্ট্রলোমের তুলির মত নরম পালক দিয়া কান চুল্‌কাইলে যে আয়েস হয়, নব্য কবিকুলের কাব্যগুলি শ্রুতিগোচর করিয়াও সেই আয়েস হয়। বঙ্গভাষারূপ নন্দন-কাননের পেলব পদ-পারিজাত-নিচয় সযত্নে চয়ন করিয়া লইয়াই আধুনিক কবিদিগের অনেকেই কাব্য-কুসুম-কম্বপের রচনা করিয়া থাকেন। সে সমুদয় কাব্যে ছন্দোপাত প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না; "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"-গোছের কটমট ভাষাও কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই "নীরস তরুবর পুরোভাতি"—গোছের মধুর মোলায়েম ভাষার লাস্যলীলা; আর মিলদোষ তো একেবারেই নাই। অভাব কেবল ভাবের। কুমুদবাবুর কবিতায় ভাবের অভাব নাই বটে, কিন্তু মিলদোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

> "টিন-ক্যানেস্তার বলে বংশীরব শুনি'
> আরে ছ্যা, ওরে কি আমি স্বর ব'লে গণি!"

'শুনি'র সঙ্গে 'গণি'র মিল কুমুদবাবুর মত প্রতিষ্ঠাপন্ন কবির পক্ষে অমার্জ্জনীয়।

> "ইক্ষু বলে, কল, তুমি সুহৃদ্ আমার,
> তোমারি পীড়নে বহে মোর সুধাধার।
> স্বর্ণ বলে, অগ্নি কেন লাজ পাও তুমি?
> বিশুদ্ধ তোমারি স্পর্শে হইয়াছি আমি।
> ধর্ম্ম কহে, দুঃখ, তুমি পরম মঙ্গল,
> তোমারি দহনে আমি হয়েছি উজ্জ্বল।"

ইহা পড়িয়া হৃদয় ও মন উন্নত হয়।

কুমুদবাবু যে যুগত্রুটি অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি বোদ্ধ, মাত্রেরই শ্রদ্ধা-স্পদ হইয়াছেন। যে কাব্য কেবল শ্রুতিমধুর শব্দের সমষ্টি, নির্ম্মল চিদানন্দ বিধান করিতে পারে না, তাহা এ অধীনের ক্ষুদ্রমতে কাব্যপদবাচ্য নহে। কবিতা বিশেষতঃ গীতি-কবিতার ভাবগুলি নম্র ও মৃদুভাবে মানব-হৃদয় আসিয়া স্পর্শ করে বটে, কিন্তু সাধ্বী বনিতার বিনয়মণ্ডিতা কথার মধ্যে যেমন সৎশিক্ষা ও সদুপদেশের অভাব থাকে না, তেমনি সুকবিতার ছন্দোপ্রবাহের

মধ্যেও কত মুল্যবান্ উপদেশ, কত হৃদয় ও মনের স্বাস্থ্যকর সদ্ভাব নিহিত থাকে। কবি প্রত্যক্ষ-ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে উপদেশক ও শাস্ত্রের সহায়।

কুমুদবাবুর এই ক্ষুদ্র-কলেবর কাব্য দুইটি ভাবুক ও ভক্তের পরম ভোগ্যবস্তু হইয়াছে। এ "শতদল" বাণীপদে রাখিতে কবির কুণ্ঠাবোধ করিবার প্রয়োজন নাই, এ "বনতুলসী" মাথায় করিয়া রাখিবার জিনিস। তবে তাঁহার এই কাব্য দুইটির ভাষা আরও হয়ত ভাল করা যাইতে পারে এবং ছন্দ সম্বন্ধে কবি আরও একটু মনোযোগী হইলে কাব্যদুইখানি আরও উপাদেয় ও উপভোগ্য হইত। ভাব কবিতার প্রাণ সত্য, কিন্তু ভাষা উপেক্ষণীয় নহে, ভাষাই কবিতার দেহ এবং ভাষার ভূষা কবির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তারই পরিচয় দেয়। তবু কেবল ভাবসৌন্দর্য্যের জন্যই এই উচ্চাঙ্গের কাব্য দুইটি সুধীসমাজে সবিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

আমাদের জীবন। রেভাঃ জে, এম্, বি, ডন্‌ক্যান্, এম-এ, বি-ডি-বিরচিত।

মিঃ ডন্‌ক্যান্, দেখিতেছি দ্রুতভাবে পুস্তকাদির রচনা করিতে পারেন। তিনি সাহেব হইলেও অশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখেন না এবং তাঁহার বঙ্গভাষায় ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটুকুও প্রায় বাঙ্গালীর মত হইয়া উঠিতেছে। "আমাদের জীবন" উদার খৃষ্টনীতিপূর্ণ সন্দর্ভ পুস্তক। এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি গ্রন্থকার (১) মানবের দৈনিক কার্য্য ঈশ্বর-নিরূপিত, (২) সম্পত্তি ঈশ্বরের গচ্ছিত বস্তু, (৩) খৃষ্টীয় ন্যায়পরতা, (৪) অপরাধ-মার্জ্জনা, (৫) পরের বিচার, (৬) ভদ্রতা ও অপরের পরিচর্য্যা, (৭) সহানুভূতি, (৮) ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বেগ—এই আটটী অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়েই অনেক অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। মিঃ ডন্‌ক্যানের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার কথা এই যে, তিনি অন্য ধর্ম্মকে অনুদারভাবে আক্রমণ না করিয়াও নিজ ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে পারেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকার্য্য অতি পরিপাটী। বইখানি খৃষ্টীয়ানের লেখা হইলেও আমরা সকলকে এই পুস্তকপাঠ-সম্বন্ধে—

যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেলেও পার লুকান রতন।"—

এই উদারনীতির অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পুলিশের নিগ্রহ।

(১)

শ্যামলাল কবিরাজ কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কবিরাজি চিকিৎসাতে তাঁহার প্রতিপত্তি তেমন না থাকিলেও তাঁহার কবিরাজি ঔষধের ব্যবসায় মহা বিস্তৃত ছিল। প্রায় সকল ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্রেই তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞাপন বাহির হইত, তাঁহার বিজ্ঞাপন কলিকাতার পঞ্জিকা-গুলির ওজন বৃদ্ধি করিত, থিয়েটরের ও যাত্রার প্রোগ্রামের এক পৃষ্ঠা তাঁহার "অমোঘ" ঔষধগুলির গুণ কীর্ত্তন করিত। তদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অনেক ভাষাতেও তাঁহার বিজ্ঞাপন বাহির হইত। শুনা যায়, প্রতি মাসে তাঁহার সহস্রাধিক টাকা বিজ্ঞাপনের ব্যয়ে যাইত। ইহা ব্যতীত তাঁহার বাঙ্গালা ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত মূল্য-তালিকা ভারতের প্রায় তিন সহস্র ডাকঘর সতত বিলি করিত। এত খরচে এরূপ বিপুল ব্যাপারে তদনুরূপ কারবার বৃদ্ধি না হইবে কেন?

কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ত্রিতল বাটী। দ্বি ও ত্রিতলে বৈঠকখানা শয়ন-ঘর প্রভৃতি। দোকান, প্যাক করার ঘর, গুদাম, কর্ম্মচারীদের বিশ্রাম ঘর, ইত্যাদি প্রথম তলে অবস্থিত। ঔষধ প্রস্তুত করিবার স্থান নাই। তজ্জন্য ও বিশেষ কবিরাজী তৈল নিম্নতলে জ্বাল দিলে তাহার উত্তাপ ও দুর্গন্ধে উপরে কবিরাজ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কষ্ট হইতে পারে, একারণে ঐ সকলের সমাবেশ শ্যামলাল বাবু কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে তাঁহার কাশীপুরের বাগান বাটীতে করিয়াছিলেন। ঐ বাটীতে মকরধ্বজ ও অন্যান্য নানা মূল্যবান্ ঔষধ প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত এবং তজ্জন্য অনেক টাকার স্বর্ণ মুক্তা প্রভৃতি তথায় মজুত থাকিত। অপরাহ্নে যুগ্মাশ্ববাহিত বৃহৎ ফীটন গাড়ী করিয়া শ্যামবাবু বাগানে যাইতেন, তাহাতে সায়ংবায়ু সেবন ও কারখানার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ উভয় হইত! সন্ধ্যার সময় প্রস্তুত

মূল্যবান্ ঔষধ ও স্বর্ণাদি বুঝাইয়া দিয়া ও তাঁহার হস্তে চাবি দিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারীরা বিদায় গ্রহণ করিত, শ্যামবাবুও ফিরিতেন। রাত্রিতে কেবল দরওয়ান ও মালীরা বহির্বাটীতে থাকিত।

(২)

অমিয়নাথ বাবু বহু বৎসর ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিয়াছেন, অনেক গুপ্ত তত্ত্বের প্রকাশ করিয়া পারিতোষিক ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উপর কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের এক থানার ভার দেওয়া হইয়াছে, তথায় তিনি ইন্‌স্পেক্টররূপে বিরাজ করিতেছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন অমিয় বাবুর নিকট গুপ্ত সংবাদ আসিল, শ্যাম কবিরাজের বাগান বাটীতে কতিপয় প্রসিদ্ধ চোরের সেই রাত্রিতে শুভাগমন হইবে।

এই সংবাদে একটু বিচলিত হইয়া অমিয় তাঁহার থানার প্রধান জমাদারকে ডাকিলেন। উহার নাম নারাণ সিং (নারায়ণ সিংহ) হিন্দুস্থানী, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠকায়, চুরী দাঙ্গা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে অমিয়ের পার্শ্বচর ও সহকারীরূপে কার্য্য করিয়া তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়াছে।

অমিয় বলিলেন, সেই দলের জন্য আমরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম, এত কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্যের পরে এখন দেখিতেছি আর মান থাকে না? শালারা চার জায়গায় চার চার বার আমাদের হাত পিছলাইয়াছে। এবারে খুব সাবধান হইয়া কৌশলের সহিত আমাদের চল্‌তে হবে।

নারাণ সিং। হুজুর, আপনি ঠিক বল্‌ছেন। কিন্তু কবে কোন সময়ে?

অমিয়। আজ রাত্রি ১২টার সময়। অনেক লোক লইয়া গোলমাল করিলে সব পণ্ড হবে। কেবল তুমি ও আমি যাব। মফস্বলে কত ডাকাতের সম্মুখে গিয়াছি, তা এরা ত কেবল সিঁধেল চোর। বল্‌তে ভুলেছি, আমাদের প্লেন পোষাকে যেতে হবে, অর্থাৎ যেন আমি একজন বাঙ্গালী বাবু, আর তুমি আমার দরওয়ান।

অমিয় বাবু ইচ্ছা করিয়াই শ্যাম বাবুর নিকট কোন সংবাদ দিলেন না। আরও তিনি মনে ভাবিলেন, এই গ্রীষ্মের সময় হয়ত শ্যাম বাবু তাঁর পরিবার-

বর্গের সহিত বাগান বাটীতে আছেন, তাঁকে কোন খবর দিলে হয় ত মেয়ে-ছেলেদের মধ্যে মহা ভয় ও গোলযোগের সম্ভাবনা। এইজন্য অমিয় বাবু ঠিক করিলেন, কাহাকেও কোনরূপে উত্যক্ত না করিয়া নিঃশব্দে একেবারে চোর-দিগকে ধরিবেন।

রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় নারায়ণের সহিত অমিয় পশ্চাতের বেড়া ডিঙ্গাইয়া ঘোর অন্ধকারে বাগানে প্রবেশ করিলেন। চুপি চুপি সহকারীকে বলিলেন, চোরেরা সম্ভবতঃ আমাদের আগে আসে নাই, ঐ যে একতলা ঘর দেখা যাইতেছে, উহা এ বাটীর পাকঘর না হইয়া যায় না, চোরেরা নিশ্চয় আগে ওর ছাদে উঠিবে।

এই কথা বলিয়া কিছু দূর যাইতে পায়ে একটা বিষম ধাক্কা পাইয়া অমিয় পড়িয়া গেলেন ও অত্যন্ত আঘাতও পাইলেন। পশ্চাৎ হইতে নারায়ণ সিং দৌড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল। অমিয় বেদনা নীরবে সহ্য করিয়া পকেটস্থ বুলস আই ল্যাম্পের আবরণী সরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক লাইন করিয়া ইট সাজান আছে। নারাণের কাণে কাণে বলিলেন, প্রথমেই কি ব্যাঘাত, নিশ্চয় চোরেরা আমাদের আগে এসেছে। ওদের কেউ ধর্‌তে এলে পড়ে যাবে এই মতলবেই ব্যাটারা ইট সাজিয়ে রেখেছে বোধ হচ্চে। যাহোক আমাদের আর বড় কষ্ট পেতে হবে না, এখনই এই বাড়ীর ভিতরে চোর মহাশয়গণের সাক্ষাৎ লাভ করিব।

ইহার পর আর একটু চলিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় পাকশালার জানালার নিকট উপস্থিত হইল এবং সঙ্গের বুল্‌স্ আই লণ্ঠনের উপরের আবরণী সরাইয়া জানালার গরাদেগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল, অর্থাৎ চোরেরা কোন গরাদে কাটিয়াছে বা সরাইয়াছে কিনা দেখিতে লাগিল।

(৩)

এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে অতি নিকট পদ-শব্দ শোনা গেল। কর্ম্মচারীরা তাহাদের আলোক-সাহায্যে দেখিল, দুই ব্যক্তি পর পর আসিতেছে, উভয়েই ভদ্রলোক, বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, যেন কুস্তী করার অভ্যাস আছে, পরিধানে ভাল ধুতি, গাত্রে নয়ানশুকের পঞ্জাবী, গলায় জুঁইফুলের গ'ড়ে। কিন্তু যেমন দেখা,

অমনি নিমেষমধ্যে আগন্তুকদ্বয় প্রত্যেকে এক হস্তে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর চাদর দ্বারা তাহার গলা আঁটিয়া ধরিল এবং পকেট হইতে অপর হস্তে রিভল্‌ভর বাহির করিয়া ধৃত ব্যক্তির মস্তকের লক্ষ্যে রাখিল।

বলা বাহুল্য, এই আকস্মিক ব্যাপারে পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয় কি যেন হইয়া গেল, ও মুহূর্ত্তকাল তথায় কাহারও মুখে কোন কথা রহিল না।

ক্ষণপরে আগন্তুকদ্বয়ের প্রথম ব্যক্তি, যে অমিয়কে ধরিয়াছিল, বলিল, সুন্দরীরা অনেক কষ্টে তোমাদের দেখা পেয়েছি, ভিতরে এস, তোমাদের চাঁদ মুখ দেখা যাক, কিন্তু খবরদার, একটুও গোল কোরো না, কোন কথা কহিও না, উপরে আমার স্ত্রী শুয়ে, তার ব্যামো যেন তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত না হয়।

ধৃত ব্যক্তিদ্বয়ের তখন যে অবস্থা, তাতে গোলমাল করিবার কখন মন হইতে পারে না; বস্তুতঃ তখন তাহারা ঘটনার আশ্চর্য্যতায় এবং ক্রোধে ও ঘৃণায় একরূপ বাক্‌শক্তিহীন হইয়াছিল। আগন্তুকদ্বয় পাকশালার অদূরবর্ত্তী এক খোলা দরজা হইতে বাহির হইয়া কর্ম্মচারীদ্বয়কে ধরিয়াছিল; এক্ষণে তাহারা উহাদের গলার চাদর এক হস্তে বেশ আঁটিয়া ধরিয়া অপর হস্তে রিভল্‌ভার দেখাইতে দেখাইতে ঐ দরজা দিয়া উহাদিগকে আস্তে আস্তে বাটীর ভিতরে হল ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল, এবং সুয়িচ টিপিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিল। তাহার পর ধৃতদ্বয়কে দেওয়ালের কাছে দাঁড় করাইয়া প্রথম ব্যক্তি মৃদু স্বরে বলিল, আমাদের আজ বড় জোর কপাল, একেবারে এক জোড়া লাভ হইয়াছে। এখন, চাঁদেরা, তোমাদের কি বলবার আছে?

অমিয়ের অন্তর ক্রোধে জ্বলিতেছে। কিন্তু বাহিরে প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, আপনারা এক মস্ত ভুল করিয়াছেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম, আজ রাত ১২টার সময় আপনাদের বাটীতে ভয়ানক চোরেরা ঢুকিবে, আমরা তাদেরই ধর্‌তে এসেছি; কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে, তারা আমাদের আগেই এসেছে, আমি তাদের সাজান ইট লেগে পড়ে গিয়েছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনারাই যদি সেই চোর নন্, তবে মহাশয়রা কোন্ সাধু পুরুষ?

অমিয়। আমি—থানার ইন্‌স্পেক্টর, নাম অবশ্য শুনেছেন শ্রীঅমিয়নাথ রায়। আর এ আমাদের থানার বড় জমাদার, নাম নারায়ণ সিং।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বেশ বেশ! আরও কি আছে বলে যাও, তবে আশা ক'রো না যে তোমাদের যত কথায় আমরা একেবারে বিশ্বাস করে ফেল্‌ছি। আচ্ছা তোমাদের হুকুমনামা বা পরওয়ানা কৈ?

অমিয় তাড়াতাড়ি আপনার কোটের পকেটের ভিতর হাত দিলেন, কিন্তু খালি হাত বাহির করিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন, দূর ছাই, যখন আমি পড়ে যাই, তখন নিশ্চয়ই উহা আমার কোট হইতে বাহিরে পড়েছে।

প্রথম ব্যক্তি। হাঁ, তা সম্ভব বটে, এই রকমেই পড়ে গিয়ে থাকে, কেমন নয় কি? তবে আশ্চর্য্য যে এটীও পড়ে নাই।

এই বলিয়াই ঐ ব্যক্তি অমিয়ের দাড়ীতে এক টান দিয়া তাহা (পরচুলার দাড়ী) খুলিয়া নিজ হস্তে রাখিল। অমিয় ঐ দাড়ী লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু রিভল্‌ভার দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলেন।

প্রথম ব্যক্তি রুক্ষ স্বরে বলিল, আর ও রকম করে কায নাই বাপু, না হলে এই নলের একটী গরম গরম সীসার বড়ী খাইয়ে তোমার একেবারে পাকা ঘুম পাড়িয়ে দিব। এখন আমাদের কবিরাজী বড়ী ছাড়া তোদের জন্য এই বিলাতী বড়ীও রাখতে হয়। পাজি বদমায়েসরা, তোদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়েছে। সমাজের শত্রু, তাদের নির্ম্মূল করা উচিত। ভাই বেহারী, তুমি কি বল, এ বেটাকে বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত করা যাক। এই বলিয়া বক্তা আপন রিভল্‌ভার অমিয়ের মস্তকের দিকে লক্ষ্য করিল।

(৪)

বেহারী। না না, শ্যাম বাবু কর কি! ওতে পরে একটা গোলযোগ হতে পারে। তার বদলে এদের দুজনকে দশ দশ বছর করে শ্বশুরবাড়ী পাঠান যেতে পারবে।

প্রথম ব্যক্তি। আচ্ছা ভাই তোমার কথা মান্‌লুম; কিন্তু দেখ দেখি, এ বেটা চোর, আবার তার উপর জাল দাড়ী পরে গোয়েন্দাগিরিও কর্‌তে এসেছে। দেখ, এ বেটার মুখে যেন মদের চিহ্ন আঁকা আছে।

এই কথাগুলিতে গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর অমিয়ের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। বাস্তবিক তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, মদ মাংস এমন কি মৎস্য পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন

না। তিনি বলিলেন—মহাশয়গণ শুনুন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আপনারা মজা করে যা ইচ্ছা বল্‌ছেন। কিন্তু আমি বল্‌ছি, দেখবেন, এই কয় ঘণ্টা রাতটা কাট্‌লে কাল সকালে আপনাদের কি হয়। আপনারা সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাঘাত করেছেন, তাহাদিগকে পিস্তল দিয়া মার্‌বার ভয় দেখিয়েছেন—সামান্ত জরিমানায় এর শেষ হবে না, ভয়ানক অপরাধ।

প্রথম ব্যক্তি। হাঁ হাঁ, রেখে দাও তোমার ও সব কথা, আমরা ও রকম অনেক শুনেছি। বেহারী ভাই, বল ত, এদের এ রাত্রের জন্ত কি ব্যবস্থা করা যায়? এত রাত্রে পাহারাওয়ালা ডেকে এনে কাঁহাতক গোলমাল করা যায়। আর তুমি ত জান, উপরে ব্যারামী শুয়ে।

অমিয় উত্তেজনায় সহিত বলিলেন, আপনারা করেন কি? এই রকম গোলযোগ কর্‌লে চোরদের ধরাই হবে না। হয়ত তারা একবার এসে দেখে শুনে চলে গেছে, কিছুক্ষণ পরে আবার আস্‌বে। কিম্বা তারা এতক্ষণ আপনার রান্নাঘরেই ঢুকেছে।

প্রথম ব্যক্তি। তুমি বেশ মনে করে দিয়েছ, রান্নাঘর। বেহারী, বল্‌ত, এ বাড়ীতে এদের রাখ্‌বার পক্ষে ঐ রান্নাঘরের চেয়ে আর ভাল জায়গা কোথায়? দরজা খুব মজবুত, জানালার গরাদেগুলিও লোহার। আর এক মজা, যেখানে এঁরা এঁদের বন্ধুদের আস্‌বার কথা বল্‌ছেন, সেইখানেই এঁরা আগে গিয়া বসে থাকুন।

বিহারী। শ্যামবাবু, এদের বেঁধে ফেলা যাক, যাদুমণিরা বড়ই হাত পিছ্‌লে যান, কি জানি গরাদের ভিতর দিয়াই না পেছ্‌লান। এখন এঁদের পোষাক খোঁজা যাক।

নারায়ণ সিংহের পকেটের ভিতর হাত পুরিয়া বাহির করিয়া বেহারী বলিল—একি? এযে হাতকড়ী। সুন্দরীরা গহনা সঙ্গে করে এনেছেন, এখন এঁদের গহনা পরিয়ে দেওয়া যাক।

এই কার্য্যে পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয়ের আপত্তি উত্তোলিত ভীষণ রিভল্‌ভরের দর্শনে থামিয়া গেল; অমিয়ের বাম হস্ত নারায়ণ সিংহের দক্ষিণ হস্তের সহিত আবদ্ধ হইল; উহাদিগকে পাকশালায় লইয়া যাওয়া হইল।

প্রথম ব্যক্তি। কিছু শব্দ কোরো না। যদি একটু জোরে কথা কও,

তা হলে কাপড় পুরে তোমাদের মুখ বন্ধেরও বিধান করব। এখানে তোমরা সুখে কাটাও। আমার অন্নে অনেকে প্রতিপালিত হচ্ছে, তোমারাও এক রাত্রি না হয় আমার অতিথি হলে; হাঁড়ীতে যা আছে খেতে পার, না হয় হাঁড়ীগুলা মারা যাবে। তার পর কাল সকালে তোমাদের পুলিশ মামার হাতে দেব। আর এর মধ্যে যদি তোমাদের বন্ধুগণের শুভাগমন হয়, তোমাদের এক এক হাত ত খোলা রহিল, তাই দিয়া তাদের আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করে রেখো—নমস্কার।

পাকশালার বাহিরের দরজা বন্ধ হইল ও তাহাতে শিকল পড়িল।

(৫)

এই ব্যাপারের পরে নারাণ সিংহের মুখে কথা প্রথম বাহির হইল, বলিল, এ হোলো কি!

অমিয়। দেখো, বড়ী-পেষা বুড়াকে কি রকম নাকের জলে চকের জলে আমি না ভাসাই, ওর নাড়ী টেঁপা না ঘুরিয়ে দিই। আর ঐ হতভাগাটার জন্ত চোরগুলোদের ধরা গেল না, অত আলো জ্বাল্‌লে কি তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্রমে রাত্রি কাটিয়া গেল, কিন্তু উভয়ের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক কি ভাবে রাত্রি কাটিল, পাঠক তাহার কল্পনা করিবেন। ৬টা বাজিল, বাহিরের দোর খোলা শব্দের পর হল ঘরে যেন কাহার পদ-শব্দ হইল।

নারাণ সিং। বোধ হচ্ছে, পাহারাওয়ালা ডেকে এনেছে। এ ঘাঁটীর পাহারাওয়ালা আমার জানা ব্রাহ্মণ, এলে মুখে জল দিয়ে বাঁচ্‌ব।

ক্রমে পদ-শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। অমিয় আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভিতর হইতে দ্বারের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন।

"রান্নাঘরের ভিতর কে?" বাহির হইতে কে যেন চমকিত স্বরে বলিল।

এই কথার স্বর পূর্ব্ব রাত্রির শ্রুত স্বর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও মনের উদ্বেগে অমিয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, মহাশয় যথেষ্ট হয়েছে আর কেন, এখন আমাদের বেরুতে দিন, ক্ষুদ্র ব্যাপারটাকে আরও বড় করবার দরকার কি?

আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এখনও সব পাখী পালায় নাই।—এই বলিয়া এক প্রৌঢ়-বয়স্ক ব্যক্তি পাক-ঘরের দ্বার খুলিয়া যুগল মূর্ত্তির দিকে সবিস্ময় এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অপর দিকে এই সম্পূর্ণ নূতন ব্যক্তির দর্শনে অমিয় চমকিয়া মৃতপ্রায়

হইলেন। ক্ষণপরে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—পরমেশ্বরের দিব্য, দোহাই আপনার আপনি সত্য বলুন যে আপনি শ্যাম কবিরাজ নহেন।

উত্তর। যখন অমন ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমাকে বলতে হল যে, আমিই শ্যাম কবিরাজ।

অমিয় জড়িত স্বরে কহিলেন—তবে কাল রাত্রের সে দুজন ভদ্র লোক কে? আপনার ছেলেরা বুঝি?

শ্যাম, গম্ভীর স্বরে। ছেলে? উপযুক্ত ছেলে বেঁচে থাকলে কি বুড়া বয়সে খেটে মরি! আমার স্ত্রীও নাই, কেবল দুটী ছোট নাতি আছে। এ বাগান বাড়ীতে কেউ রাত্রে থাকে না, জেনেই বোধ হয় আপনারা দুজন ভদ্র লোক শুভাগমন করেছেন। সব বাক্স আলমারী খুলে দেখ্‌লুম, দশ হাজার টাকার অধিক আমার চুরী গিয়াছে। কিন্তু আপনাদিগকেও ত চোরের দলের লোকের মত ঠিক বোধ হচ্চে না।

এই কথা শুনিয়া অমিয় বসিয়া পড়িলেন। ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, আমাদের দফা শেষ হল! জমাদারও প্রতিধ্বনি করিল, এতকাল কার্য্যের পর আমাদের একেবারে হয়ে গেল!

তখন অমিয় বুঝিতে পারিলেন, কালকের সেই দুই ব্যক্তিই চোর, তাহারাই শ্যামবাবু ও বন্ধু সাজিয়াছিল, এবং উহাদিগকে পাকশালায় কয়েদ করিয়া সুবিধামত আপনাদের কার্য্য সাধন করিয়াছে। শ্যাম বাবুকেও ঐরূপ বলিলেন।

শ্যাম বাবু উহাদের কথায় প্রথমে সন্দিহান হইলেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বন্দীদ্বয় চোর নহে, উহারা স্থানীয় থানার ইনস্পেক্টর ও জমাদার, উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় বিশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া শ্যাম বাবুকে এ ঘটনা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং প্রতিশ্রুতি করিল, তাহারা যে প্রকারে হউক চোরদ্বয়কে ধরিয়া তাঁহার অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে। এই কথা বলিয়া উভয়ে রাত্রের কাণ্ড ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হৃদয়ে ও শরীরে এবং হেট মুখে তথা হইতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কৌশলী চোরদ্বয়কে উহারা পরে ধরিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা আমরা শুনি নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।

ভারত ও মিশর।*

পুরাকালে ভারতের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। গ্রীক, রোমান, ফিনিসিয়ান, বাবিলোনিয়ান, পারসীক,মিশরীয় প্রভৃতি সকল জাতিই নিজ নিজ সভ্যতার জন্য ভারতীয় সভ্যতার নিকট অল্পাধিক পরিমাণে ঋণী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুরাকালে ভারতীয় এবং মিশরীয়গণের পরস্পর কি সম্পর্ক ছিল, তাহাই প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইব। Alexandria নগরীর ভুবনবিখ্যাত পুস্তকাগার যদি আজ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে এই সম্পর্কের প্রমাণ-সংগ্রহের জন্য গ্রীক-রোমানদিগের দ্বারস্থ হইতে হইত না। কিন্তু এখন তাঁহাদের গ্রন্থাদি ভিন্ন মিশর-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায়ান্তর নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার ফলে এই বিষয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় এবং মিশরীয় স্থাপত্যের সাদৃশ্য।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Captain C. B. Burr তাঁহার মিশরভ্রমণ-জনিত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন, যে, (Nile) নাইল-তীরস্থ Ginnie হইতে

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ Royal Asiatic Societyর Journalএ প্রকাশিত Captain C. B. Burr, Mr. J. D. Patterson, Mr. Colebrooke, Captain F. Wilford, Sir William Jones প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ হইতে গৃহীত। এজন্য আমি এই মহাত্মাগণের নিকট ঋণী।

এতদ্ভিন্ন নিম্নোল্লিখিত পুস্তকাবলী হইতে বহু মূল্যবান সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—

James Bruce's "Travels to discover the sources of the Nile"; Jacob Bryant's "Analysis of Ancient mythology"; Abbe Plucher "History of the Heavens"; (Eng. Trans.);—Plutarch's "Parallel Lives" (North's Eng. Tran.);—Philostratus's "Life of Appollonius" (Eng. Tran.); Lucian's "Dialogues" (Oxford Translation Series);—Nonnus's "Miscellany" (Eng. Tran.); Diodorus's "Bibliotheca Histoarica" (Eng. Tran.); Ptolemy's "History of the Wars of Alexander the Great" (Eng. Tran.); Pliny's "Natural History" (Holland's Eng. Tran.); Herodotus's "Historical works" (Rawlinson's Eng. Tran.); Sir William Smith "Classical Dictionary" Etc. Etc.

প্রায় তিন মাইল দূরে আইসিস্ (Isis) দেবীর (১) বহু পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখনও সেখানে যে সমস্ত প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা প্রাচীন মিশরীয়দিগের বেশভূষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ঐ প্রতিমূর্ত্তিসমূহের বেশভূষা প্রভৃতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় বেশভূষার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তদ্ব্যতীত মিশরীয় স্থাপত্যকার্য্যাদি দেখিলে স্বতঃই ভারতীয় স্থাপত্যের বিষয় মনে হয়। এই সমস্ত কারণে, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে, যে, খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, হিন্দু এবং মিশরীয়গণের ধর্ম্ম এবং রীতিনীতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল।

হিন্দু এবং মিশরীয় দেবমণ্ডলীর উৎপত্তির মূল।

প্লুটার্কের (Plutarch) মতে মিশরীয় এবং হিন্দু এতদুভয় জাতির মধ্যেই আদি অবস্থায় হয়ত সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিরাট দৃশ্যাবলী অথবা কোন ঐতিহাসিক ব্যাপার বা কোন নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া দেবতামণ্ডলীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা বেদে সর্ব্বত্রই ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতার স্তবস্তুতি দেখিতে পাই। ভারতীয় এবং মিশরীয় দেবমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ সাদৃশ্য ছিল সে বিষয়ে নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মিশরের Osiris, Horus, Typhon এবং Isis,—এবং ভারতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি।

Osiris, Horus এবং **Typhon** মিশরের প্রধান দেবতা, এবং **Isis** প্রধানা দেবী। ইঁহাদের সহিত ভারতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির বিশিষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভারতে যেরূপ ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজা পৃথক পৃথক

(১) Isis অতি প্রাচীন মিশরীয় দেবী। ইনি মিশরীয়গণের আদি দেবতা Osirisএর স্ত্রী এবং Horusএর মাতা। Isis অতি প্রথমে পৃথিবী এবং পরে চন্দ্রিমা বলিয়া পূজিত হইতেন। পরবর্ত্তী কালে, গ্রীক ও রোমানগণ বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করিয়া এই দেবীরই পূজা করিতেন। গ্রীকগণের Demeter এবং Io, এবং রোমানগণের Ceres এবং Isis Campensis এই দেবীরই নামান্তর মাত্র।

সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, মিশরীয় ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেও তাহাই পরিলক্ষিত হইবে।

মিশরে Osiris, Typhon, Isis এবং Horusএর ক্রমিক রাজত্ব।

Osiris সর্ব্বপ্রথমে মিশরের রাজা ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রজাবৃন্দকে কৃষিকার্য্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখাইয়া এবং দেশে নানাবিধ বিদ্যা এবং শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া মিশরীয়গণকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করেন। দেশের সুব্যবস্থা করিয়া, তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণান্তে মিশরে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা Typhon রাজ্যলোভে তাঁহাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নাইল (Nile) নদীতে নিক্ষেপ করেন। ইহার পর মিশরে Typhonএর প্রভাব বিস্তৃত হয়। Isis বহু অনুসন্ধানে স্বামীর মৃতদেহের বিভিন্ন অংশগুলি উদ্ধার করেন, এবং তৎপুত্র Horusএর সাহায্যে Typhonকে পরাভূত করিয়া উভয়ে পুনরায় মিশরে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

মিশরীয় ধর্ম্মের ইতিহাস ও হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের ঐক্য।

এই আখ্যায়িকার অন্তরালে যে মিশরীয় ধর্ম্মের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সুপণ্ডিত Frazer এবং Sayce তাঁহাদের গ্রন্থ-সমূহে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিশরে সর্ব্বপ্রথমে Osirisএর পূজা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে, তৎস্থানে Typhon, এবং পরে Isis ও Horus এর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতেও সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত ছিল, এবং পরে তাহা লুপ্ত হইয়া ক্রমে মহাদেব, শক্তি, এবং তাহার পর বিষ্ণু প্রাধান্য লাভ করেন।

Osiris ও ঈশ্বর একই শব্দ।

ভারতে যখন যে দেবতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার পূজকগণ তাঁহাকে ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মিশরের Osirisও ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এবং Osiris একই শব্দের রূপান্তর মাত্র।

Osiris এবং ব্রহ্মা। চতুর্ব্বেদ, এবং চতুর্ভাগে বিভক্ত মিশরীয়গণের আদি গ্রন্থ Books of Harmonia of Hermes

Osiris যেরূপ সর্ব্বপ্রথমে মিশরে বিদ্যাচর্চ্চা এবং শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, ব্রহ্মাও সেইরূপ ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ প্রণয়ন করেন এবং অন্যান্ত

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেদ যেরূপ চারি অংশে বিভক্ত, Osiris প্রণীত মিশরীয়গণের আদি ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানগ্রন্থও (Books of Hormonia or Hermes) সেইরূপ চারি ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বেদের সহিত ইহার বিষয়গত সাদৃশ্য ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে, Nonnus (২) তাঁহার পুস্তকে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে এইমাত্র সংগ্রহ করা যায় যে, উহা বহু প্রাচীন গ্রন্থ, এবং পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উহা রচিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের মতে বেদও সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান।

Typhon এবং মহাদেব।

সুপ্রসিদ্ধ Mr. Bryantএর মতে Babon Typhon দেবের নামান্তর। শিবের অন্য নাম 'ভগবান' অথবা 'ভুবন' (ভুবনেশ্বর) এই 'ভগবান' অথবা 'ভুবন' এবং Babon একই শব্দ হইতে উৎপন্ন এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে। মিশরে Typhon অথবা Babon এর পূজাপদ্ধতির সহিত ভারতীয় শিবপূজা-পদ্ধতির যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। শিবপূজায় কুম্ভগাত্রে ত্রিকোণাকৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়, Osiris এবং Typhonএর পূজাতেও ঠিক ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের হয়ত পুরাকালে কোন গূঢ় অর্থ ছিল। শিব-বাহন বৃষ ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ আদৃত এবং পূজিত, পুরাকালে মিশরে এবং গ্রীসে বৃষের এইরূপ সম্মান ছিল। ভারতে শিব যেরূপ সংহারকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, মিশরে Typhonও তদ্রূপ জ্ঞানে পূজিত হন।

Horus এবং হরি (বিষ্ণু)। Horusএর চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রা।

Horus এবং বিষ্ণুর (হরি) মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। Horus এবং হরি একই শব্দ বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ভ্রমণকারী Abbe Pluche তাঁহার "History of the Heavens" নামক পুস্তকে দুইখানি চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একখানা মিশর দেশের একটী mummyর

(২) Nonnus খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত তৎপ্রণীত "Miscellany" সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে বহু লুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ, এবং তাহা হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত আছে।

(৩) উপর, এবং অপরখানা Isis দেবীর কোন মন্দিরে প্রাপ্ত। প্রথম চিত্রে, Horus একখানা সিংহাঙ্কিত পালঙ্কে শায়িত আছেন। তাঁহার পার্শ্বের সুপ্তির সাহায্যের জন্য Anubis (৪) দণ্ডায়মান, এবং তাঁহাকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে Isis দেবী দণ্ডায়মানা। পালঙ্কের নিম্নে Horusএর চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রার চিহ্নস্বরূপ চারিটী ঘট অবস্থিত।

এই চিত্রের অর্থ এই যে, যখন Sirius (৫) নক্ষত্র উদয় হইত, মিশরীয়গণ তখন নাইল নদীর জলপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেন। জলপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে নাইল-তটপ্রদেশসমূহের কৃষিকার্য্যাদি বন্ধ হইত; সুতরাং ঐ সময় Horus বিশ্রাম করিতেন। জলপ্লাবনকর্ত্তা Anubis (Dogstar অথবা Sirius নক্ষত্রস্থ দেবতা) Horusএর বিশ্রাম অথবা নিদ্রার হেতুস্বরূপ হওয়াতে যেন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। চতুর্মাসান্তে নাইল যখন আবার স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিত, তখন কৃষিকার্য্যের ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া যেন Isis (পৃথ্বীদেবী) Horusএর নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন। পালঙ্ক-নিম্নস্থ ঘট চারিটী যেন চারি মাসের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান।

চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রার মধ্যে তৃতীয় মাস অন্তে Horus পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় চিত্রে, Horus পূর্ব্বের সেই সিংহাঙ্কিত পালঙ্কে যেন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া উপুড় হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। পালঙ্কনিম্নে চারিটীর পরিবর্ত্তে তিনটী ঘট। এই চিত্রের অর্থ এই যে, চারিমাসের মধ্যে তিনমাস গত হইলে Horus পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ তখন জলপ্লাবন প্রায় শেষ হইয়া আসাতে, Horus

(৩) মিশরদেশে মোম এবং নানাবিধ মশলা দ্বারা এক অদ্ভুত উপায়ে মৃতদেহসকল এমন কি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত রক্ষিত হইত। সেই সকল সযত্ন-রক্ষিত মৃতদেহকে mummy বলে।

(৪) Anubis মিশরদেশীয় দেবতা। ইনি মৃতদেহসকলের রক্ষাকর্ত্তা। ইহার শরীর মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু মস্তক কুকুরের ন্যায়। গ্রীক দেবতা Hermes এবং রোমান দেবতা Mercury ইহারই রূপান্তর মাত্র।

(৫) Sirius আকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইহার অপর নাম Dogstar, অথবা Canicula; মিশরীয়গণের বিশ্বাস ছিল যে এই নক্ষত্রের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাইল নদীর জল-প্লাবন উপস্থিত হইত।

গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিতেছে, অর্থাৎ মিশরীয়গণ বর্ষা ঋতুর অন্তে পুনরায় কৃষিকার্য্যাদির জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

ক্ষীরসমুদ্রে শেষনাগের উপর বিষ্ণুর চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রা। বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

হিন্দুশাস্ত্রেও বিষ্ণুর ক্ষীরসমুদ্রে শেষনাগের উপরে চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রা বর্ণিত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছেন এবং নিদ্রান্তে দেবগণ বিষ্ণুকে গাত্রোত্থান করিবার জন্য স্তবস্তুতি করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণু আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে শেষ নাগের উপর নিদ্রিত হন, ভাদ্র মাসের ঐ তিথিতে তিনি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন; হিন্দুগণ ঐ তারিখে জলযাত্রা নামক উৎসব করেন। (এখন ইহা তত প্রচলিত নাই)। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু তাঁহার চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করেন।

Horus এবং বিষ্ণুর চতুর্মাসব্যাপী নিদ্রার তুলনা।

ভারতীয় এবং মিশরীয় এই দুইটী ব্যাপার আলোচনা করিলেই Horus এবং হরি (বিষ্ণু) যে একই দেবতা, তদ্বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। স্বীকার করি, এতদুভয় ব্যাপারের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু দেশকালভেদে সহস্রফণ শেষনাগের পরিবর্ত্তে সিংহাঙ্কিত পালঙ্ক, লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে Anubis এবং দেবগণের পরিবর্ত্তে Isis হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

Osiris, Horus এবং Typhon যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এ বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ প্রযুক্ত হইল, স্মরণাতীতকালের ব্যাপারসমূহের পক্ষে ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিশদরূপে অবতারণা করা অসম্ভব। নিম্নে আরও দুই একটী উল্লেখ করিতেছি।

মিশরীয় Hieroglyphics.

Abbe Pluche বলেন যে, Alexandria নগরীর সন্নিকটস্থ Canopus নামক স্থানের দেবীমন্দিরে এরূপ কয়েকটী ঘট রাখা হইত, যাহাতে বিশেষ

বিশেষ চিহ্ন দ্বারা জনসাধারণকে জলপ্লাবনের হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞাপন করা হইত। নাইলের জলবৃদ্ধি-সংবাদ সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটসমূহে ᅲ অথবা ⊥ চিহ্ন দেওয়া হইত। মিশরে সর্ব্বদাই এইরূপ নানা-বিধ অর্থবোধক চিহ্ন (Heiroglyphics) ব্যবহৃত হইত। Osiris দেবের পূজায় △ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

মিশরীয় Hieroglyphics এবং হিন্দুদিগের যন্ত্রচিহ্ন।

মিশরীয় Canob, গ্রীক Canopus এবং সংস্কৃত কুম্ভ শব্দের একই অর্থ, এবং বোধ হয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। মিশরে যেরূপ Canobএর উপরে নানা-বিধ অর্থবোধক চিহ্ন অঙ্কিত হইত, ভারতেও সেইরূপ অধিকাংশ দেবদেবীর পূজাতেই কুম্ভের উপর নানাবিধ চিহ্ন (যন্ত্র) অঙ্কিত হইয়া থাকে। কুম্ভের উপরে বৈষ্ণবগণ 卐 চিহ্ন, শৈবগণ ✡ চিহ্ন, এবং শাক্তগণ ↙ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন। এই সকল যন্ত্রের অর্থ এবং বিশেষত্ব তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভারতীয় এবং মিশরীয় পূজাপদ্ধতিতে এই সমস্ত সাদৃশ্য বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক।

শমীদেবী এবং Semiramis.

হিন্দুদিগের গণেশ, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতে শমীদেবীর উপাখ্যান বর্ণিত আছে। অগ্নি-অবতার ঔর্ব্বশের কন্যা উর্ব্বশী অথবা শমীদেবীর সহিত নোয়ার পৌত্র পুরুরবার বিবাহ হয়। পরে ইঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়া স্থাবর-পতি (অশ্বত্থ) এবং শমীবৃক্ষে পরিণত হন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বমনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও বিচরণ করিতে পারিতেন। এই পুরুরবা এবং পুরাণোক্ত ঐল, পারসীক লৈলন সাহ, গ্রীক Ninus এবং তামুলী নীলন একই ব্যক্তি এবং পূর্ব্বোক্ত স্থাবরপতি এবং মিশরীয় Staurobates একই ব্যক্তি। তদ্রূপ হিন্দুদিগের শমীদেবী এবং মিশরীয় ও গ্রীক Semiramis একই দেবী। হিন্দু-শাস্ত্রে যেরূপ শমীদেবী ও স্থাবরপতির (অশ্বত্থ) উপাখ্যান বর্ণিত আছে, মিশরে

এবং গ্রীসেও সেইরূপ Semiramis ও Staurobates (Ninus) এর গল্প প্রচলিত আছে। উভয় দেশেই ইঁহারা আদিপুরুষ হইতে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ। উভয় আখ্যায়িকাতেও বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাণে লিখিত আছে যে, শমীদেবীর জন্মস্থান তিহোত্র (অথবা ত্রিহোত্র) অর্থাৎ আধুনিক সাতলেজ নদী-তীরস্থ তেহোরা অথবা তেহরা নামক স্থান। প্রাচীন মিশরে ঐ স্থান তাহরা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শমীদেবী এবং Semiramis প্রকৃত পক্ষে একই দেবী।

অর্ঘ ও Argo.

প্রাচীন হিন্দুগণ পৃথিবীকে নৌকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মনে করিতেন এবং অদ্যাপিও হিন্দুগণ পূজাদিতে নৌকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্রে পুষ্প, জল ইত্যাদি রক্ষা করেন। তাহাকে হিন্দুগণ অর্ঘ এবং মিশরীয়গণ Cymbium বলিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Captain Wilford এর মতে, এই অর্ঘ এবং মিশরীয়গণের সুবিখ্যাত Argo নৌকা একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন। অর্ঘ হইতে মহাদেবের নাম অর্ঘনাথ হইয়াছে। Plutarchএর মতে Osiris Argo নৌকার চালক ছিলেন, সুতরাং তিনিও Master of Argo (আর্গোনাথ) ছিলেন। কথিত আছে, হিন্দুগণ যেরূপ অর্ঘের পূজা করিতেন, মিশরীয়গণও সেইরূপ Argoর পূজা করিয়াছিলেন; এই সকল প্রমাণ দ্বারা Captain Wilford বলিতে চাহেন যে অর্ঘ এবং Argo মূলতঃ একই পদার্থ। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান তাঁহার উর্ব্বরমস্তিষ্কের পরিচায়ক হইলেও আমাদের নিকট নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচ্যদেশীয় ব্যাপারে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

মিশরীয়গণ ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

ভারতে ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অগ্রে অগ্রে গঙ্গাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন। ভগীরথের রথচক্রের চিহ্নদ্বয় পরস্পর চারি ক্রোশ ব্যবধান ছিল। ভগীরথ ঐ চিহ্নদ্বয়ই গঙ্গার সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের বিবরণ যে প্রাচীন

মিশরীয়গণ অবগত ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত Philostratus Alexandria নগরীর সুবিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ এবং দার্শনিক Apolloniusএর জীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে Philostratus বলেন, যে, Apollonius ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার মতে গঙ্গা একদা সমস্ত তটভূমি জলপ্লাবিত করিয়া দেশের প্রভূত ক্ষতি করে। ইহার পর গঙ্গার পুত্র ভগীরথ গঙ্গার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। গঙ্গা তদবধি উক্ত নির্দ্দেশানুসারে প্রবাহিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করে এবং শতমুখী হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হয়।

ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন ও Herculesএর Nile আনয়ন।

কথিত আছে, মিশরীয় দেবতা Osirisএর আদেশে Hercules Ethiopia হইতে নাইল নদী আনয়ন করেন। মিশর দেশের প্রচলিত এই উপাখ্যান হয় ত ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন হইতে উৎপন্ন।

চীনে ভারতীয় প্রভাব।

চীন দেশেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে, Hoangho নদী তটভূমি প্লাবিত করিয়া দেশের বহু ক্ষতি করায়, চীন সম্রাট Yu, Hoanghoর উৎপত্তি স্থান হইতে উহার গতি এবং সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহার সহিত ভারতীয় এবং মিশরীয় প্রবাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাতেও বিবেচ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

জীবন-শেষে।

দিবসের শেষে রজনী আসিল কেশেতে তারার চুম্‌কি পরি',
ঘোমটায় ঢাকা মু'খানি খুলিল, সারা ধরা গেল হাসিতে ভরি'।
জীবন-দিবার শেষে কি এমনি,—এমনি কি ওগো মধুর রাতি?
এমনি শুভ্র হাসিটুকু তা'র,—এমনি কি সুধা-জ্যোস্না ভাতি?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

মণি ও ছাগশিশু।

[গাথা]

১

ছাড়িয়া দুরন্তপনা শিশু মণিলাল
একদিন কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
শুষ্ক মুখ, ম্লান দৃষ্টি, উত্তপ্ত কপাল
শয্যাবুকে পড়িল ঢলিয়া ;
কাঙ্গালিনী বিধবার সে যে গো বুকের হার,—
দুখিনীর একমাত্র সান্ত্বনার ধন ;
সে দুরন্ত শিশু আজ কেন গো এমন ?

২

সংসারের শত কাজ ফেলে রাখি দূরে
কাঙ্গালিনী আসিল ছুটিয়া,
পীড়িত সন্তানটীরে বুকে চেপে ধরে
তন্দ্রাহীন রহিল পড়িয়া ;
ঘোর বিকারের ঝোঁকে শিশুটী উঠিত ব'কে,
অমনি সে বিধবার আঁখি ছল ছল
বিসর্জ্জিত শতধারে তপ্ত অশ্রুজল।

৩

সাত দিন, সাত রাত ছাড়ি নিদ্রাহার
যাচিল সে কাঁদিয়া কাতরে—
"রক্ষাকালী—ফিরে দে মা মণিরে আমার,
পূজা দিব ষোড়শোপচারে" ;
সে আকুল প্রার্থনায় পাষাণ গলিয়া যায়,
তাই বুঝি দেবতার টলিল আসন,
আবার লভিল মণি নূতন জীবন।

৪

বিধবার স্পন্দহীন বক্ষের মাঝার
প্রাণ পুনঃ উঠিল জাগিয়া ;
সাদরে দেবীর পদে দিতে উপহার
ছাগশিশু আনিল কিনিয়া।
মণি কিছু বুঝিল না, মণি কিছু জানিল না,
শুধু সেই নবাগত অতিথির সনে,
খেলিত সে সারা দিন আপনার মনে।

৫

পাতা ভাঙ্গি, জল আনি সাথীটীরে তা'র
প্রতিদিন খাওয়াইত শিশু—
তা'রা যেন দুই বন্ধু বড় আপনার
একে নর অন্যে কিন্তু পশু !
এ বন্ধুত্ব সুগভীর যেন নহে পৃথিবীর,
তাই তা'রা মুক্ত করি হৃদয় দু'খান
যত স্নেহ পরস্পরে করেছিল দান !

৬

নিজ মনে, কানে কানে ছাগশিশুটীর
ঢালিত সে শ্রান্তিহীন ভাষা,
বাক্‌শক্তি শূন্য ছাগ—নীরব, গভীর—
বিনিময়ে দিত ভালবাসা ;
অপলকে ধীরে ধীরে মণিরে দেখিত ফিরে,
সে চাহনি ফুটাইত কত শত কথা,
কত প্রীতি, মর্ম্মোচ্ছ্বাস, কত কৃতজ্ঞতা !

৭

শেষে ঘনাইয়া এল বিয়োগের দিন !—
গ্রামে আজ রক্ষাকালী পূজা ;
পুরোহিত আজ্ঞা দিল নির্ম্মম কঠিন,
শুনিল সে আজ্ঞা চতুর্ভুজা—
আজ্ঞা দিল—"ছাগটীরে স্নান করাইয়া ফিরে
শীঘ্র এনে দাও দেখি নিকটে আমার"
আপনি চলিল মণি উল্লাসে অপার।

৮

উল্লাস—কেননা মণি কেমনে বুঝিবে
সাথিটীরে হারাইবে আজ ;
পূজা।—হায়, নগ্নশিশু কেমনে জানিবে,
ছদ্মবেশে ঘাতকের কাজ।
চন্দন-কুসুমে শির, বিভূষিয়া ছাগটীর,
পুরোহিত দিল যবে ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে
তখনো ফুটিছে হাসি মণির আননে।

৯

শেষে, একি। সবিস্ময়ে বিস্ফারিত আঁখি
মণিলাল দেখিল পলকে—
ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গ উঠেছে ঝলকি',
"কালু" তা'র 'হাড়িকাট'-বুকে।
রুদ্ধ কণ্ঠ, বদ্ধ স্বর, বারণের অবসর
নাহি আর ; ওই, অহো, করিল ছেদন—
রক্তধারে কলঙ্কিত পূজার প্রাঙ্গণ।।

১০

কম্পিত আড়ষ্ট মণি বিয়োগ-কাতর
যন্ত্রণার অশ্রু চোখে দোলে—
"মা, আমার কালু"—হায় ফুটিল না স্বর
ছুটে এল জননীর কোলে ;
রক্তসিক্ত মাটী আনি' সন্তানের শিরে দানি',
যেমনি কল্যাণকামী দাঁড়াল দুখিনী—
মুক্ত আত্মা ধরাপৃষ্ঠে লুটাইল মণি।

১১

"কি করিলি সর্ব্বনাশী—বলি, আছাড়িয়া
পড়ে মাতা শ্যামাপদোপর ;
সবিস্ময়ে পুরোহিত দেখিল চাহিয়া—
দেবীমূর্ত্তি কাঁপে থর থর।
একি—একি অমঙ্গল! কে কা'রে বুঝা'বে বল্?
কে বুঝা'বে—এ ত নহে ছাগ-বলিদান,
এ যে রে প্রণয়ে বাঁধা—বুকে বুকে টান।

১২

পলায়েছে পুরোহিত—নাহি দীপাবলী—
পূজা-গৃহে কেহ নাহি আর,
মৃতদেহ মণিলাল—তা'রে বুকে তুলি'
অভাগিনী করে হাহাকার!
শ্মশানের হাসিরাশি, শূন্য গৃহে দোলে আসি,
আর বুঝি দিব্য চক্ষে দোলে বিধবার
রক্তমাখা খড়্গখানি জগৎ-মাতার।

১৩

শেষ রাতে সংজ্ঞাহীনা শুনিল বা ওই
কে যেন রে দূরে গেয়ে যায়—
"জননী রাক্ষসী নয়, রক্ষাকালী সে যে,
সে কি কভু সন্তানেরে খায়!
হৃদয়ে হৃদয় টানে, কে না জানে, কে না জানে?
যে প্রেমে জগৎ বাঁধা বিধাতার পায়—
বলিদানে তারে কিরে ভাগ করা যায়?"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কুরেশের গুরুভক্তি।

ভারতের দক্ষিণে চোলদেশ। চোলদেশের রাজধানী রাজেন্দ্রচোলপুরম। আজ রাজধানীতে বড় কোলাহল। রাজসভায় আজ কুরেশ নামে এক বৈষ্ণবের বিচার। অপরাধ রাজবিদ্রোহ। প্রজাবর্গ বিচার দেখিতে শশব্যস্তে রাজপুরাভিমুখে গমন করিতেছে।

মহারাজা রাজেন্দ্রচোলম্ রাজবেশে সিংহাসনে সমাসীন। তাঁহার ললাটে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন, এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা দেখিয়া তিনি যে শৈব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। রাজার দক্ষিণে রাজমন্ত্রী নালুরাণ, বামে অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারী, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি, অদূরে সশস্ত্র সেনাপতি, চতুষ্পার্শ্বে সভাসদগণ শৈবপণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে অসংখ্য প্রজাবর্গে রাজসভা লোকারণ্য। দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান।

বহুজন-সমাগম সত্ত্বেও রাজসভা নীরব নিস্তব্ধ; যেন সূচিকাপতন-শব্দটিও শ্রুত হয়। বৈষ্ণব কুরেশকে দেখিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক।

রাজ-আদেশে যথাসময়ে কুরেশ রাজসভায় আনীত হইলেন। মন্ত্রী নালুরাণ সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে বলিলেন। বিদ্রোহীর প্রতি সম্মান দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইলেন এবং বুঝিলেন এই বিদ্রোহী নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি নহেন। কুরেশ উপবিষ্ট হইলে সকলে সাগ্রহে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কুরেশ পরম বৈষ্ণব। তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি রামানুজাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। তাঁহার পরিধানে গৈরিকবাস, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, কণ্ঠে তুলসীমালা, ললাটে নাসিকায় তিলক শোভিত, মুণ্ডিত মস্তকে শিখা, দক্ষিণহস্তে দীর্ঘ দণ্ড, বামহস্তে কমণ্ডলু এবং তাঁহার প্রসন্ন বদনে সুধাবর্ষী হরিনাম!

কুরেশের পবিত্র সন্ন্যাস বেশ, নির্ভীক ভাব এবং নয়নের সরল দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার অপরাধ-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইলেন। তাঁহারা পরস্পরে অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই মহাত্মা রাজবিদ্রোহী ইহা বড়ই অসম্ভব কথা; ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। আহা বৈষ্ণবের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইতেছে। না জানি ইঁহার অদৃষ্টে আজ

কি আছে! কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে চোলরাজের ইঙ্গিত-অনুসারে মন্ত্রী নালুরাণ কুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

সাধুবর! অদ্য শ্রীরঙ্গম্ হইতে রাজদূত ফিরিয়া আসিয়াছে। এবারেও তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে। তাহারা রামানুজাচার্য্যের পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়াছে। আপনিই যে আপনার গুরুদেবকে পলায়নের সুবিধা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার বেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজদূতকে প্রতারিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি নিশ্চয়ই আচার্য্যের সংবাদ জ্ঞাত আছেন, কিন্তু রাজ-আদেশে দূত যখন দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গমে গমন করে, সে সময় আপনি মহারাজের পুনঃ পুনঃ আদেশ সত্ত্বেও আচার্য্য-সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ করেন নাই, অথচ আপনারই কৌশলে তিনি পলায়নে সমর্থ হইয়াছেন। আপনি ইচ্ছা করিয়াই রাজকার্য্যে বাধা প্রধান এবং রাজ-আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন। এই দুই কারণে আজ আপনি বিদ্রোহী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছেন। আপনার পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি মহারাজ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মাত্মা সাধু ব্যক্তি, তাহাও আমাদের অবিদিত নাই। আপনাকে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় দণ্ড প্রদান করিতে হইতেছে ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি দোষী, দোষী ব্যক্তির দণ্ডদান রাজার কর্ত্তব্য, একথা বলাই বাহুল্যমাত্র। এক্ষণে আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

কুরেশ। মন্ত্রিবর! আপনি যাহা বলিলেন সমুদায় সত্য। আমি অপরাধী আমাকে যে দণ্ড প্রদান করিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব। আমার বলিবার কিছু নাই।

এই সময়ে রাজা মন্ত্রীর হস্তে একখণ্ড কাগজ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া দিলেন।

মন্ত্রী। পণ্ডিতবর! আপনি দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইলেও আপনাকে দণ্ড প্রদান করিতে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিনাদণ্ডে মুক্তি পাইতে পারেন। দেখুন মহারাজা শৈবমত প্রচারের জন্য রাজ্যের সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে আমি শৈব এই কথা লিখাইয়া লইতেছিলেন ইহা ত আপনি জানেন এবং আপনার গুরু রামানুজাচার্য্যকে

ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করা হয় তাহাও এই কার্য্যের জন্য,—ইহাও আপনার অজ্ঞাত নাই। তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরু তাঁহাদ্বারা উক্ত স্বাক্ষর করাইতে পারিলে মহারাজা শৈবমত-প্রচারে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু আপনার চাতুরীতে তাহা সিদ্ধ হইল না। এক্ষণে আপনাকেই উক্ত স্বাক্ষর করিতে হইবে। এই কাগজ লউন; ইহাতে আমি শৈব একথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিন।

কুরেশ। (চমকিত ভাবে) সে কি কথা! আপনি বিচক্ষণ জ্ঞানী হইয়া এরূপ অন্যায় আদেশ কিরূপে করিতেছেন। আমি শৈব নহি, মিথ্যা করিয়া শৈব একথা কিরূপে লিখিয়া দিব? ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ রাজার ইহা ধর্ম্ম নহে।

মন্ত্রী। ন্যায় অন্যায়ের বিচারে আপনার প্রয়োজন কি? আপনি বিদ্রোহী, রাজ-আদেশ পালন করিতে বাধ্য, অতএব আদেশ পালন করুন।

কুরেশ। কখনই নহে। জীবন ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।

মন্ত্রী। দেখুন, এখনও ভাবিয়া দেখুন। মহারাজ আপনাকে মুক্তি দিবেন, এবং আপনার ইচ্ছামত পুরস্কার প্রদান করিবেন। নচেৎ ভীষণ দণ্ড প্রদান করিতে মহারাজ বাধ্য হইবেন।

কুরেশ। মহাশয়! দণ্ডের ভয় কি দেখাইতেছেন? আমি ত দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত হইয়াই রাজদূতের সহিত আসিয়াছি। আর পুরস্কারের কথাই বা কি বলিতেছেন, আমার গুরুদেবকে যে অপমানের হাত হইতে ভগবান রক্ষা করিলেন ইহাই আমার পরম পুরস্কার, অন্ত পুরস্কারে আমার প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রী। কেন বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন? রাজার সন্তোষের জন্য না হয় এই কাজটা করুন। পুরস্কারের কথা ছাড়িয়া দিন।

কুরেশ। মন্ত্রিবর! রাজার রাজা পরম রাজা ভগবান বিষ্ণু আমার উপাস্য দেবতা। আমি তাঁহার দাস। অন্য রাজার সন্তোষ অসন্তোষে আমার প্রয়োজন কি? আমি দোষী, আমাকে দণ্ড দান করুন।

চোল-রাজ এতক্ষণ কোনও কথা কহেন নাই। এক্ষণে তিনি কুরেশের অবাধ্যতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধনয়নে কুরেশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণব। আর একবারমাত্র তোমায় বলিতেছি, তুমি স্বাক্ষর করিবে

কি না? যদি না কর তবে তোমায় ভীষণ দণ্ড প্রদান করিব। তোমার মান-রক্ষার জন্য এবং দয়াপরবশ হইয়া আমি তোমার আচরণ এতদিন সহ্য করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তাহার শেষ। এখনও বল স্বাক্ষর করিবে?"

কুরেশ। মহারাজ! আপনার যথেষ্ট দয়া। কিন্তু আমি আপনার দয়ার প্রত্যাশী নহি। আপনার যাহা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করুন। মহারাজ! কে কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? ভগবান বিষ্ণুই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, আমি তাঁহারই দাস। দাসকে লইয়া তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।

বিষ্ণুদ্বেষী শৈব রাজা বার বার কুরেশের মুখে বিষ্ণু-প্রশংসা শুনিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তিনি তখনই মন্ত্রীকে বলিলেন:—"মন্ত্রিন্! তুমি এখনই এই দুষ্টের দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ইহাকে তাড়িত করিবার আদেশ দাও।"

রাজার এই অভাবনীয় নির্ম্মম আদেশ শুনিয়া মন্ত্রী এবং সভাস্থ সমুদায় ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহ কেহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজসভা-পরিত্যাগের জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ বা সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, বুঝি বা তাহাদের সম্মুখেই এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধিত হইয়া যায়।

মন্ত্রী নালুরাণ অন্তরে বৈষ্ণব ছিলেন, রাজভয়ে প্রকাশ্যে শৈব আচারে থাকিতেন। এক্ষণে কুরেশের এই দণ্ডের জন্য তিনি নিজেকেই দোষী স্থির করিলেন। কারণ রামানুজাচার্য্যকে ধরিয়া আনিবার পরামর্শ তিনিই রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

দণ্ডের কথা শুনিয়া কুরেশের দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অনেকের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইল। রাজা তখন উপহাস করিয়া বলিলেন,—"কি এখন রোদন করিতেছ কেন? এইবার ভয় হইয়াছে বুঝি? এখন স্বাক্ষর করিবে?"

কুরেশ। হায় মূঢ়! আমার রোদনের মর্ম্ম তোমরা কি বুঝিবে? আমি কি চক্ষু হারাইবার ভয়ে রোদন করিতেছি? তাহা নহে। আমি যে, আমার এই চক্ষু দ্বারা আর প্রিয়তম গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইব না,—এই ভাবিয়াই আমার চক্ষে জল পড়িতেছে। নচেৎ আমার এত সৌভাগ্য যে আমার এই চক্ষু-দানে আমার গুরুদেবের জীবন-রক্ষা হইবে, আহা ভগবানের এই অধম

দাসের প্রতি সত্যই কি এত দয়া হইবে! ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে?

কুরেশের গুরুভক্তি দেখিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণ চমকিত হইল। তাহাদের দেহ যেন কণ্টকিত হইল। হায়! এহেন মহাত্মার এই ভীষণ দণ্ড ভাবিয়া তাহাদের হৃদয় আকুল হইল। সকলে মহাকোলাহল করিতে লাগিল।

ক্ষণেকের জন্য রাজারও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা নিমেষ-মাত্র। তিনি কোলাহলে বিরক্ত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কহিলেন,—"ওরে ভণ্ড বৈষ্ণব! অচিরে তোর আশা পূর্ণ হইবে, চিন্তা নাই। গুরুভক্তি লইয়া এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"

রাজ-আদেশে কুরেশ তখনই স্থানান্তরিত হইলেন। রাজাও বিরক্তচিত্তে সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা চলিয়া যাইলে প্রজাবর্গও কোলাহল করিতে করিতে রাজসভা পরিত্যাগ করিল।

রাজ-অনুচর এক বিজন প্রান্তরমধ্যে কুরেশকে লইয়া গিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিল। অসম-সহিষ্ণু মহাত্মা কুরেশ ক্ষণকালের জন্যও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখ মলিন হইল না। সদানন্দ-প্রাণে দুঃখ বা নিরানন্দ স্থান পাইল না। তিনি প্রসন্নমনে উচ্চৈঃস্বরে সুধামাখা হরিনাম গান করিতে করিতে শ্রীরঙ্গমের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী—

কাজির বিচার।

তূলা চুরি।

দিল্লী সহরে আব্বাস মিয়া খুব ধনী লোক। ব্যবসায়, বাণিজ্য করিয়া আব্বাস অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। চাকর, নফর, দাস, দাসী মুন্সী, খাজাঞ্চী, জমাদার, দফাদার সর্ব্বদাই আব্বাস বণিকের প্রকাণ্ড গৃহ সরগরম করিয়া রাখিত। চাকর-বাকর সকলেই তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কিছু না কিছু অংশ হস্তগত করিবার জন্য সর্ব্বদাই কৃতচেষ্ট থাকিত। আব্বাস সাহেবও বুঝিতেন যে, তাঁহার মালপত্র সদাই চুরি হয় কিন্তু কোন প্রকারেই তিনি চোর ধরিতে কৃতকার্য্য হইতেন না।

অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে আব্বাস সওদাগর তূলার কারবার করিতেন। একদিন তাঁহার গুদাম হইতে পঁচিশ বস্তা ভাল তূলা অপহৃত হইল। আব্বাস সাহেবের বড় রাগ হইল। এইরূপভাবে চুরি হইলে কুবেরের ভাণ্ডারও অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে, আব্বাস সওদাগর ত সামান্য ব্যক্তি। মহা বিরক্তভাবে গাত্রে পিরহান, আচ্‌কান পরিয়া, মাথায় জরির টুপি দিয়া, শুঁড়ওয়ালা জরির লপেটা জুতায় পাদুটী আবৃত করিয়া তিনি কাজীর বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাজি মহাশয় ভারী বিচক্ষণ ব্যক্তি, লম্বা দাড়ী নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আচ্ছা মশায় আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি আজকের মধ্যেই আপনার চোর ধরিয়া দিব, আপনার যত কর্ম্মচারী ও ভৃত্য আছে, সকলকেই একত্র করিয়া একটা ঘরে বসাইয়া রাখিবেন। আমি ঠিক বেলা তিনটার সময় আপনার বাটীতে যাইব।"

আশ্বস্তচিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া কুর্নীশ করিতে করিতে আব্বাস গিয়া নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আব্বাস মিয়ার বৈঠকখানা-গৃহ, তাঁহার ভৃত্য-বর্গে পরিপূর্ণ। সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়া আছে, কেহ ঘুণাক্ষরে জানে না, কি কারণে তাহাদিগের প্রভু আজ এসময়ে তাহাদিগকে এস্থলে সমবেত করিয়াছেন। সেই বৃহৎ গৃহের একপার্শ্বে বহুমূল্য কার্পেট বিস্তৃত। সেই

কার্পেটের উপর দুইখানি মখমল-মণ্ডিত শূন্য কুরসী; তাহাতে জরির কাজ করা। সম্মুখে মার্ব্বল পাথরের ছোট একটী মেঝের উপর একটী বড় নিপুণ কারিকরের হস্তনির্ম্মিত একটী রূপার গাছে সোণার গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একটী অতি সুদৃশ্য গোলাপ-পাস। টেবিলের একপ্রান্তে মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তক—একখানি কোরাণ সরিফ রক্ষিত ছিল। প্রতীক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যখন লোকে প্রতীক্ষার কারণ জানে না; তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকা বড় শক্ত। কাজেই আব্বাস সওদাগরের কর্ম্মচারিবৃন্দ সোণার ফুল দেখিতেছিল, ভেল্‌ভেটের চেয়ার দেখিতেছিল, ছাদের উপর চাহিয়া বরগা গুণিতেছিল, দেওয়ালে অঙ্কিত গোলাপফুল, সারসপাখী, পাগলা হাতী প্রভৃতি এক একবার দেখিতেছিল বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি হইতেছিল না। সকলের মনেই সেই এক প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছিল,—মজলিসের কারণ কি? ঠিক বেলা তিনটার সময় গৃহমধ্যে আব্বাস মিয়া ও কাজি সাহেব প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ প্রকোষ্ঠ-মধ্যস্থ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। সওদাগর একখানি চৌকীতে প্রভূত বিনয়-সহকারে কাজিকে বসাইয়া আপনি অপরখানিতে উপবেশন করিলেন। সকলে আপন আপন আসনে পুনরায় উপবেশন করিলে জলদগম্ভীর স্বরে কাজী সাহেব বলিলেন—"আব্বাস মিয়া আপনি আজ এ মজলিস আহ্বান করিয়াছেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব ছিল, সুতরাং নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সকলে শুনিতে লাগিল। সওদাগর বলিলেন—"মহাশয় এই সকল ব্যক্তি আমার কর্ম্মচারী। ভগবান জানেন, আমি ইহাদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় পালন করি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন নিমকহারাম ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমার মালপত্র চুরি করে। আজ তিন দিন হইল আমার পঁচিশ বস্তা তুলা চুরি গিয়াছে। আপনি দেশের কাজি, চোর ধরিয়া তাহার শাস্তি বিধান করুন, আপনার নিকট এই প্রার্থনা।"

বণিকের কথা শেষ হইলে সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়া লোকে আগ্রহসহকারে কাজির বিচার দেখিবার জন্য উৎসুক হইল।

কাজি আব্বাসের কথা শুনিয়া মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া সেই সভাস্থ সকলের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। চাহিয়াই কিন্তু তিনি হাসিয়া ফেলিলেন,

দারুণ বর্ষার পর সূর্য্য উঠিলে স্বভাবের যেমন শোভা হয়, কাজিসাহেবের গাম্ভীর্য্যের পর সেই হাসিটুকু তাঁহার মুখকে তেমনি সুন্দর করিয়া তুলিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার মোকদ্দামা বিচার করিতে আমার আর কষ্ট হইল না। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। ঐ দেখুন যে ব্যক্তি আপনার তূলা চুরি করিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার দাড়িতে তূলা লাগিয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া কাজি সাহেব সেই সমবেত কর্ম্মচারিমণ্ডলের দিকে চাহিলেন। বাস্তবিক কাহারও দাড়িতে তূলা লাগিয়া ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, সে ভয়ে ও বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি তূলা মুছিবার জন্য আপনার দাড়িতে হাত দিল। তখন সকলে হাসিয়া উঠিল, সেই ব্যক্তিই যে চোর সেবিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

কাজি সাহেব এই চোরকে যথাবিধি শাস্তি দিলেন।

মনিব ও চাকর।

তিহারাণ সহরের ওসমান মির্জ্জা আপনার লতিফ নামক কৃতদাসকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, আর তাহাকে তিনি বিশ্বাসই বা না করিবেন কেন? তাহার পিতা বদরবক্স, ওসমানের পিতা হাফেজ মির্জ্জার স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। ওসমান মির্জ্জার ঘরদোয়ার, বাক্সপেঁটারা, সকলেরই চাবীকুঞ্জী ঐ লতিফ বান্দার নিকট থাকিত। কিন্তু একদিন সুবুদ্ধি লতিফের কুবুদ্ধি ঘটিল। সে প্রভুর অনেক টাকার ধনরত্ন, হীরা-জহরত, মালপত্র হস্তগত করিয়া তিহারাণ সহর হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ওসমান মির্জ্জা কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা চাপড়াইয়া পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, পথে ঘাটে বিশ্বাসঘাতক লতিফের অনুসন্ধান করিল; কিন্তু যে গিয়াছে, সে আর আসে না। তিনি সমগ্র তিহারাণ সহরে লতিফের কোন চিহ্নই পাইলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা আসিল। তিহারাণের পথে ঘাটে বাড়ীর ছাদে বাগ-বাগিচায় ঝুপ ঝুপ করিয়া কত বৃষ্টি পড়িল। আকাশের উপর দিয়া কালো কালো কত মেঘ ভাসিয়া গেল। সদ্যঃ পরিষ্কৃত কত ঘরবাড়ী বর্ষার বারিধারায় মলিন হইয়া গেল। কত ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীর শৈবালাবৃত হইল; ওসমান মির্জ্জা ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করিল, তাহার ধর্ম্মের ইমামদিগের নিকট সে

কত আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। লতিফের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তাহার দেশের বণিকগণ বিদেশ হইতে বাণিজ্য করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই ওসমান মির্জ্জা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত—"খাঁ সাহেব, আপনারা কেহ আমার বেইমান, নেমকহারাম বান্দাকে কোন দেশে কি দেখিয়াছেন?" তখন তাহারা হাসিয়া বলিত,—"আজ্ঞে সাহেব, আপনার বান্দা ধরা ব্যতীত বিদেশে আমাদের একটু আধটু নিজেদের কাজ ছিল।"

শেষে যখন শরতের শেষে মেঘমুক্ত হইয়া তিহারাণের আকাশ আবার ঘন নীলিমা ধারণ করিল, তখন ওসমান স্বয়ং দেশভ্রমণে বাহির হইল। অনেক সহর ঘুরিয়া, অনেক নদনদী, মাঠ-ঘাট পার হইয়া ওসমান শেষে বদকসান সহরে আসিয়া উপনীত হইল।

সেদিন রোমজান মাসের শেষ হইয়াছে, তাঁহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় ছোটছেলের হাঁশুলির মত ছোট একটু চাঁদ নীল আকাশে দেখা দিয়াছিল। তাই সেদিন মুসলমানগণ ঈদপর্ব্বোৎসবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। হাজার হাজার লোক বদকসান সহরের পথে পথে নানাবর্ণের পোষাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোলাকুলি করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছিল। বিদেশী ওসমান অপরিচিতের মত পথে পথে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক মসজিদের নিকট আসিয়া ওসমান দেখিল,—সম্মুখেই তাহার এতদিনের অন্বেষণের সামগ্রী—লতিফ বান্দা। লতিফের এখন আর কৃতদাসের পোষাক নাই, এখন এক রামধনুকের রঙের সাটিনের আচকানে তাহার অঙ্গ সুশোভিত। মাথায় বহু মূল্য টুপি, সবুজ গর্ণেটের পাইজামা, পায়ে মখমলের জুতা এবং গলায় লালরেশমের রুমাল বাঁধা; হাতের আংটীর ত কথাই নাই। তাহাকে দেখিবা মাত্র বিদ্যুতের মত বেগে গিয়া ওসমান তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং "চোর" চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রত্যুৎপন্নমতি লতিফও ওসমানকে জড়াইয়া "চোর" "চোর" শব্দে গগন ভেদ করিতে লাগিল। উৎসবের দিন মজা দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিল। কে চোর, কে সাধু কেহ ঠিক করিতে পারিল না। সহরকোতয়াল আসিয়া উভয়কে কাজির নিকট ধরিয়া লইয়া গেল।

কাজির নিকট গিয়া ওসমান মির্জ্জা আপনার দুঃখের কাহিনী যথাযথ বিবৃত করিল। লতিফ তাহার অপেক্ষা কাতরকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, সকলই মিথ্যা, এ আমার বান্দা ছিল। আমার বহুমূল্য ধন-রত্নাদি চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। ইহারই অনুসন্ধান করিতে আমি এদেশে আসিয়াছিলাম। আজ ইহাকে মস্‌জিদের নিকট দেখিতে পাইয়া মনের আনন্দে ধরিলাম। তখন সে নিজে বাঁচিবার জন্য উল্টা চাপ দিয়া আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সৃষ্টি করিল।

বলা বাহুল্য, কাজি মহাশয় বড়ই সমস্যায় পড়িলেন। কে চাকর, কে মনিব, তাহা কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি বলিলেন—"তোমরা দুইজনেই বদ্‌মায়েস, তোমাদের উভয়েরই মস্তক ছেদন করিব।" এই বলিয়া তিনি একটী কাঠের উপর উভয়েরই মস্তক রাখিতে বলিলেন। এক ভীমকায় জহ্লাদ শাণিত তরবারি-হস্তে তাহাদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কাজি বলিলেন—"উভয়েই ভগবানকে স্মরণ কর, এখনই উভয়েরই গর্দ্দান যাইবে।" অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কাজি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জহ্লাদ দু'জনকেই মারিও না, যে ভৃত্য কেবল তাহারই মাথা কাট।" বলিবামাত্রই ভয়ে লতিফ মাথা তুলিল, তখন কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, লতিফই ভৃত্য এবং ওসমান প্রভু।

কাজির বিচারে লতিফের শাস্তি হইল এবং আপনার অপহৃত ধনের অধিকাংশ পাইয়া সানন্দচিত্তে ওসমান মির্জ্জা তিহারাণ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবি-প্রেমিকের পত্র।

প্রীতিভাজনেষু—

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি আর এখন কবিতা লিখিতেছি না কেন। তাহার উত্তরে আমাকে বলিতে হইবে যে, এখন আমার রচনার সময় নহে। এখন আমি পাষাণীর প্রেমের অটল অটুট পাষাণ-কারায় বন্দী।

জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন কেবল 'কলস ভাসায়ে জলে' নিষ্ফল নিশ্চেষ্টতায় বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা যায় এবং মাঝে মাঝে 'গাহন করিয়া' আপনাকে হারাইতেও বাসনা হয়। এইরূপ আত্মহারা হওয়ায় যে একটা সুখ আছে, আপনার সত্তা মাঝে মাঝে লোপ করিয়া দেওয়ায়, আপনার ব্যক্তিত্বের জড়শৃঙ্খলটাকে মাঝে মাঝে খুলিবার চেষ্টায় যে একটা আনন্দ আছে, তাহা আত্মসর্ব্বস্ব হিসেবীর দল (Calculators) জানে না। আপন জীবনের ভার আপনার ঘাড়ে সময়ে সময়ে এমন করিয়া চাপিয়া বসে যে, সেটাকে মাঝে মাঝে যাত্রা-পথের বৃক্ষতলে না নামাইলে, পশারিণীর মত কবির ডাকে আত্মভোলা হইয়া পা ছড়াইয়া না বসিলে যেন জীবন দুর্ব্বাপ্য হইয়া পড়ে। তাই ঐ ভ্রমর কুসুমের বক্ষকারায় বন্দী হইয়াই তৃপ্ত। কবি কোন্ ভরসায় স্বেচ্ছাবন্দী দাস বিনা বেতনের মালাকার হইয়া সুন্দরীর উদ্যানে কুটীর বাঁধিয়াছিল!

শিক্ষার ও বিদ্যার জটিল পাকের গোলোকধাঁধা হইতে বাহির হইয়া পড়ায়, ক্ষণকালের জন্য নিজের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাবত্তা, উচ্চাদর্শ ও ঔদ্ধত্য ভুলিয়া যাওয়ায় প্রাণে যে আনন্দ আসে, তাহা কবিত্বের যশে, জ্ঞানের গৌরবে, জনসংঘের মধ্যে সম্মানমণ্ডিত মুহূর্ত্তগুলিতে অথবা অন্য কোনবিধ ভোগ-সুখে পাওয়া যায় না। পরাজয়ে এত আনন্দ, এত গরিমা কোন সাংগ্রামিক শাস্ত্রে বলিয়াছে কি?

আমার সাধ হয় জীবনে আর অগ্রসর হইয়া প্রয়োজন কি? আমি যদি আমার জীবনের প্রভু হইতাম, জীবন-রথের সারথি হইতাম, তাহা হইলে বল্গা ধরিয়া জীবনকে এইখানেই থামিতে বলিতাম। জীবন-যৌবন যদি এইখানেই দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে বড় সুখের হয়। তাই নিবিড় আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে সত্যের আঘাতে সব স্বপন বলিয়া মনে হয়।

> "খুলো না দিগন্তদ্বার,—সত্য-তেজোজালে
> মায়ার জোনাকী দগ্ধ হবে পালে পালে।"

স্বপনের পর কঠিন নিষ্ঠুর জাগরণ আছে তাহা জানিয়াই ত এই স্বপনের মোহাঞ্জন নেত্রে লইয়াছি। চুম্বনে চিরদিন দ্রাক্ষাধারা বহিবে না, কটাক্ষও চিরদিন ভুলাইবে না। তবুও স্বপনকেই বরণ করিতেছি। ভরসা,—জাগরণকেও, শাশ্বত সত্যকেও অম্লানবদনে, অক্ষুব্ধচিত্তে, ফুলের পরিণতি ফলের ন্যায়—বরণ করিতে

পারিব। যে বিদ্যুতের আলোকে অভিসারে বাহির হইয়াছে, সে মেঘগর্জ্জন ও বারিপাতকে ভয় করে না, বক্ষে বজ্রবেদনা লইতেও তাহার আপত্তি নাই। ভবিষ্যৎ ত সে আপনা হইতেই জানে। জাগরণ তাহার কাছে অতর্কিত অবস্থায় দেখা দেয় না। তাই আমি বেশ নিশ্চিন্তমনেই সুপ্তি-জাগরণের পাগড়ী বদল করাইয়াছি, স্বপ্ন ও সত্যের মালা বদল করাইয়া বিবাহ দেওয়াইয়াছি। তাই যদিও জানিতেছি যে, মধু ও মদিরার মাদকতা হয়ত একদিন হারাইয়া যাইবে, পরশনে রোমাঞ্চ থাকিবে না, কদম্ব ফুটিবে না, লাবণ্যের মায়াপুঞ্জ হাতে করিয়া ধরিতে অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া মিলাইয়া যাইবে, তথাপি আমি এখন কবিত্ব-প্রণয়ের মোহাঞ্জন নেত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে পারিব না।

'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
আমায় জাগায়ো না।'

এই স্বপ্নাবেশ, এই মত্ততা এখন এতই প্রবল যে, শান্ত ও সমাহিতচিত্তে কবিতা-রচনা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। হৃদয় এখন আলোড়িত হইতে থাক্। উদ্দাম প্রকৃতির এই উন্মাদ নর্ত্তনের অবসানে মথিত হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যদি কবিতালক্ষ্মী আবির্ভূতা হন, তাহা হইলে তখন এই দীনভক্ত তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া লইবে। ইতি

তোমার
শ্রীকবি।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান দিল্লী।*

পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধা, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা, অসংখ্য ভূপতি-নৃপতি-সেবিতা দিল্লী আজ ভারতবর্ষের রাজধানী। ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং স্বমুখে দিল্লীর বক্ষে ভারতের রাজধানী-স্থাপনের মহীয়সী ঘোষণা-বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। দিল্লী আবার ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে।

---

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ East and west নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত Delhi—ancient and modern নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

দিল্লী নানাবিধ ঘটনা-পরম্পরা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছে। আজিও দিল্লীর স্থানে স্থানে পুরাতনের সেই ক্ষীণ স্মৃতি-দর্শনে হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দের ও বিষাদের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। যিনি দিল্লীতে গিয়াছেন অথবা প্রকৃত কবির মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দিল্লীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, দিল্লীর কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে তিনি হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস কিছুতেই দমন করিতে পারেন না।

দিল্লী কত শত অত্যাচার-উৎপীড়নের শক্তিশেল স্মিতমুখে বক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিউটিনী বা সিপাহী বিদ্রোহের ব্যোমস্পর্শী অনল-শিখা দিল্লীকে ভস্মীভূত করে; কাশ্মীর গেট ও বহির্ভাগস্থ ভগ্ন প্রাচীর আজিও তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দাহন করেন। সে দাহনের দাহিকা শক্তি সকলই ভস্মীভূত হইয়াছিল—পতঙ্গের ন্যায় সকলই দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছিল, বাকী ছিলেন কেবল অসুরমায়া। তিনি স্বর্ণ-রত্ন-হীরা-মুক্তা-মাণিক্যাদি-সংযোগে বহুযোজনব্যাপী একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সে প্রাসাদের শোভা-বর্ণনা কবির কল্পনাতীত। স্বর্ণোৎপল-শোভিত স্ফটিকস্বচ্ছতোয় সরোবর, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত প্রাসাদস্তম্ভ, কুঙ্কুম-সুবাস-নিস্রাবী প্রস্রবণসমূহ এবং নন্দন-কানন-সদৃশ পুষ্পবাটিকা-সমূহ দেখিয়া দেশ-দেশান্তরাগত রাজন্যবর্গ বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। কেহ কেহ বা বিশুষ্ক ভূমি-জ্ঞানে স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরে পতিত হইয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন।*

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই স্বর্গসম শোভাসম্পন্ন স্বর্ণ-প্রাসাদে অভাবনীয় উৎসব-সহকারে প্রবেশ করিলেন। সে প্রাসাদে অগণ্য ঋষি, মহর্ষি, রাজা, মহারাজ সমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাক্যকুশল দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্! আপনি প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন ত? ব্যবসায়ীদিগকে ন্যায্যভাবে শুল্ক দিতে হইতেছে ত? কৃষিজীবীরা রাজকীয় সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত নহে ত? স্থপতি ও শিল্পজীবীরা যথাযোগ্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয় ত? ব্যবসায়-বাণিজ্য শুল্কবিহীন ত? রাজা স্বয়ং নিদ্রা, আলস্য, মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির বশীভূত নহেন ত?"

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "দেবর্ষে! আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নানুযায়ী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধির নিরন্তর চিন্তা ভিন্ন আমার অন্য কোন চিন্তা নাই।"

তদনন্তর নারদ বলিলেন যে, তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের প্রভৃতির সভামণ্ডপ দেখিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায় এত উজ্জ্বল এত মনোহর এত নয়নানন্দদায়ক, হৃদয়তৃপ্তিকর সভা আর কোথাও দেখেন নাই।

দেবর্ষি নারদ সেই সভায় রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলেন, যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অ-বশীভূত রাজাগণকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

সেই যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের আসন কে গ্রহণ করিবেন, ইহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। অধিকাংশ লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞেশ্বর-পদে বরণ করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু চেদি রাজ্যের অধিপতি শিশুপাল ও তাঁহার পরিচালিত সম্প্রদায় এই মতের প্রতিকূল হইল। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে সেইস্থলেই হত্যা করিলেন।

শিশুপালের দলস্থ লোকসমূহ সরোষে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল, পাণ্ডবদ্বেষী কৌরবগণের অন্তরে তদ্দর্শনে হিংসানল প্রজ্জলিত হইল। তাহারা এযাবৎকাল পাণ্ডবগণের বিনাশ ও অনিষ্ট-সাধনের উপায় চিন্তা করিতেছিল, এতদিনে একটি সুবিধা ঘটিল বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

যুধিষ্ঠির কৌরব-নায়ক দুঃশাসন কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় আহুত হইলেন; কিন্তু কৌরব-চক্রে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিতে হইল।

এই ঘটনার পর হইতেই ইন্দ্রপ্রস্থের অবনতি সূচিত হইল। মহাভারতের বিশ্ববিশ্রুত সমরানল নির্ব্বাপিত হইবার পরও হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এই হস্তিনাপুর এক্ষণে মিরাট জেলায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পরিত্যক্ত গ্রাম!

ইহার পরবর্ত্তী এক সহস্র বৎসরের দিল্লীর ইতিহাস আমরা কিছুই জানি না—জানিবার উপায়ও নাই। প্রথম শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় রাজা দিল্লু বর্ত্তমান দিল্লী হইতে প্রায় পঞ্চ মাইল বা আড়াই ক্রোশ দূরে দিল্লী সহর নির্ম্মাণ করেন।

কুতব মিনারের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ধব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কিন্তু কথিত আছে যে, এই লৌহস্তম্ভ জনৈক ব্রাহ্মণ ভূপতি নির্ম্মাণ করেন। এই স্তম্ভের মূলভাগ পাতালে বাসুকীদেবীর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার বংশ জগতে চিরদেদীপ্যমান থাকিবে,—প্রজাবর্গ এই কথা বলায়, ভূপতি স্তম্ভটীকে খনন করিতে আদেশ করেন। স্তম্ভটী খনন করা হইলে, তাহার মূলদেশ শোণিতার্দ্র দৃষ্ট হয় এবং তিনি পুনরায় ইহা প্রোথিত করিতে আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু শত শত লোকের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা ভূগর্ভে প্রবেশ করিল না, তখন সকলে বলিল—"কিল্লি সি দিল্লী ভাই রাজ ভাই মাৎহীন" অর্থাৎ স্তম্ভটী শিথিল হইল, রাজাও মূর্খ হইলেন।

কেহ কেহ বলেন, এই কথা হইতে দিল্লীর উৎপত্তি।

উপরোক্ত লৌহস্তম্ভটী রায় পৃথোরা-নির্ম্মিত (পৃথ্বিরাজ), এ কথাও কেহ কেহ বলেন, কিন্তু ইহার যে কোন ভিত্তি আছে, সেরূপ অনুমিত হয় না।

দিল্লীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে তিনটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১) এই নগরী আলগা জমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; (২) দিল্লু নামক জনৈক জমিদারের নামানুসারে ইহার নাম দিল্লী হইয়াছে; (৩) রাজা দলীপ নামে জনৈক রাজার নামানুসারে ইহার নাম দিল্লী হইয়াছে।

পৃথ্বিরাজের সময়ে ১২০০ শত সংবতে এই দিল্লী নগরী পুনঃনির্ম্মিত এবং "রায় প্রিথোরা' নামক দুর্গ তৈয়ারী হয়। এই দুর্গটী এখনও বিদ্যমান আছে। কুতব মিনারের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাসাদের গঠন-প্রণালী-দর্শনে মনে হয় যে ইহা হিন্দু রাজার বাসগৃহ ছিল। আর যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই পৃথ্বিরাজের বাসস্থান ছিল।

এখন মোগল শাসনাধীন দিল্লী-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সাহাবুদ্দীনের প্রতিনিধি ঘোর বংশীয় কুতবুদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কুতবের নিকট একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। উহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার নিকটে প্রসিদ্ধ কুতব মিনার—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। এই স্তম্ভটী ২৩৮ ফিট উচ্চ এবং ৩৭৮টী সিঁড়ি আছে।

এদেশে প্রবাদ এই যে, তাঁহার কন্যা প্রতিদিন ভোজনের পূর্ব্বে নীলবসনা

যমুনা-দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় জনৈক হিন্দুরাজ এই কুতব মিনার নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মিনারের গঠন-প্রণালী দেখিয়া এই প্রবাদের সত্যতা-সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। কারণ ইহা মুসলমান-জন-সুলভ রুচি-অনুযায়ী নির্ম্মিত।

কুতবুদ্দিনের পর গিয়াসুদ্দিন তোগলক ইহার চারি মাইল পূর্ব্বে ১৩১১ খ্রীঃ অব্দে তোগলাকাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। এইস্থানের এখন একটু ক্ষীণ ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয় মাত্র। তাঁহার পুত্র মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইবন বতুতা বলেন যে, দিল্লী তখন প্রায় পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত, প্রাকার-বেষ্টিত, অষ্টবিংশতি সিংহদ্বার-সম্পন্ন এক সুবিশাল সহর ছিল। ১৩৪১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী হইতে ফেরোজাবাদে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। এইখানেই ফিরোজা অশোকস্তম্ভ আনিয়া স্বকীয় প্রাসাদের শিখরদেশে স্থাপিত করেন। তৎপরে তৈমুর আসিয়া এই সহর লুণ্ঠন করে। ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দে লোদী-বংশীয় রাজারা এই সহর ত্যাগ করিয়া আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তৎপরে মোগল সম্রাট বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ ও ইহা হস্তগত করেন। ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মোগল-শাসন ভারতে বিদ্যমান ছিল। বাবরের রাজত্বকালে আগ্রা ভারতের রাজধানী ছিল। তৎপুত্র হুমায়ুন ইন্দ্রপ্রস্থান্তর্গত "পুরাতন কেল্লা"র পুনরুদ্ধার করেন। তৎপর আফগান রাজ সের শাহ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা সহরটী পরিবেষ্টিত করেন—এই প্রাচীরের চূড়া এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই চূড়া এখন 'লাল দরজা' নামে পরিচিত। তাঁহার পর সেলিম, বর্ত্তমান দুর্গের নিকট সেলিমগড় নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানটী এত দৃঢ় যে কেহ ইহার সংস্কার না করিলেও পূর্ব্ববৎ চাকচিক্যময় রহিয়াছে। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লী তত প্রয়োজনীয় স্থান বলিয়া অনুমিত ছিল না। সাজাহান সাজাহানাবাদ নগর নির্ম্মাণ করেন। রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ এই সাজাহানাবাদকে দিল্লী নামে অভিহিত করিতে মর্ম্মে বড়ই আঘাত পান!

বর্ত্তমান দিল্লী সাজাহানাবাদের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বার্ণিয়ার বলেন যে, এই দিল্লী যমুনার পূর্ব্ব তীরে চক্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং যমুনার উপর দিয়া নৌকার সেতু ছিল। রাজ-প্রাসাদের তুলনা অন্য কোন প্রাচ্যদেশীয় রাজ-প্রাসাদের

সহিত হইতে পারিত না। চারিদিকেই প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ছিল। অসংখ্য বণিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, স্থপতি, শ্রমজীবী প্রভৃতির কোলাহলে নগরটী সর্ব্বদা মুখরিত ছিল। দুর্গের চতুর্দ্দিকে সুগভীর পরিখা ছিল। পরিখার পশ্চাতে আবার সুন্দর সুগন্ধি কুসুম-সমাকীর্ণ পুষ্পোদ্যান ছিল। ফৈজ বাজার, উর্দ্দু বাজার, খিকাজ বাজার—সহরের এই তিনটী প্রধান রাজপথ দিল্লীর মধ্যে তখন উল্লেখযোগ্য ছিল। এই উর্দ্দু বাজারে নানা জাতীয়, নানা ভাষাভাষী লোকের সমাবেশ হইত। তাহাদের কথিত হিন্দী, পারশী, তুর্কী, প্রাকৃত প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাচীন দিল্লীর সহিত তুলনায় বর্ত্তমান দিল্লী ঠিক বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। দিল্লী হইতে পূর্ব্বে জুতার মসৃণ চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানী হইত। স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত হার, টুপি, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতির জন্য দিল্লী এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। এখনও এই সমস্ত বস্তু দিল্লী হইতে রপ্তানী হয় বলিয়া বাণিজ্যস্থান হিসাবে দিল্লীর গৌরব যথেষ্টই আছে।

দিল্লীতে আর সে প্রাচীন মহাপুরুষগণ এবং মোগল-প্রাসাদের গগনস্পর্শী স্বে উচ্চ চূড়া আর নাই! এখন দিল্লী সহর কেবল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বণিকে পরিপূর্ণ। তাহারা যেমন বিলাসী তেমনই আমোদপ্রিয়। তাহাদের মধ্যে প্রাচীন দিল্লীবাসীর ন্যায় পরোপকার-প্রবৃত্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ক্ষণস্থায়ী আমোদের জন্য বর্ত্তমান দিল্লীবাসী শত শত মুদ্রা চক্ষুর পলকে হাসিতে হাসিতে ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু দ্বারে দাঁড়াইয়া অনাহারে প্রপীড়িত অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, চলচ্ছক্তিরহিত কেহ বুকে করাঘাত করিয়া হৃদয়-বিদারী চীৎকার করিলেও তাহাদের হস্ত হইতে একটী পয়সা ভ্রমক্রমে স্খলিত হয় না। দিল্লীবাসী এখন আফিমের সমাদর বুঝিয়াছে—অক্ষক্রীড়ায় নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। *

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর অধিবাসীর যেরূপ সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ছিল, এখন ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। দিল্লীবাসী পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর সেই আল্‌গা চাপ্‌কান, চোগা,

---

* লেখক অনুবাদক মাত্র। মুল প্রবন্ধোক্ত এ সকল কথার যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। এ সম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিলে তাহা সাদরে প্রকাশিত করিব।—অর্ঘ্য-সম্পাদক।

পাজামা, পাগড়ী, শাল ব্যবহার করে না। এখন দিল্লীবাসীর অঙ্গে পাশ্চাত্য-সভ্যতানুমোদিত কোট প্যাণ্ট টুপি শোভা পাইতেছে।

কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতির তুলনায় দিল্লী শিক্ষা-সম্বন্ধে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। দিল্লীতে কেবল একটি মিশনারী কলেজ আছে। তদ্দ্বারা ঐ নগরস্থ সমগ্র শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ অসম্ভব। দিল্লীতে হিন্দু-কলেজ নামে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী দ্বারা একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে চারি পাঁচটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এতদ্ব্যতীত একটি সাধারণ লাইব্রেরীও আছে।

প্রজাবৎসল মহামান্য লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর দিল্লীতে আবার ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছেন। আমরা আশা করি; তিনি ও তাঁহার গভর্ণমেণ্ট দিল্লীর পুরাকীর্ত্তি সকল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও তাহাদের সংস্কার সাধন করিয়া ভারতবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইবেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বুদ্ধনির্ব্বাণ-সম্বৎ।

শেষ বুদ্ধ শাক্যমুনির দেহত্যাগের দিন হইতেই নির্ব্বাণ সম্বতের আরম্ভ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কালনিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। এ বিষয়ে সমুদয় ঐতিহাসিকেরই এক একটী পৃথক মত আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক—Vincent A. Smith সাহেব বলেন,—"Buddha died early in the reign of Ajatsatru."*

অজাতশত্রু সকলেরই মতে ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩২ (কেহ বলেন ২৫) বৎসর রাজত্ব করেন। তাহা হইলে নির্ব্বাণাব্দ বোধ হয় ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৬৮ খৃঃ পূঃ মধ্যে হওয়া কর্ত্তব্য। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের ভবিষ্যৎ রাজন্য-বংশাবলীতে অজাতশত্রু চন্দ্রগুপ্তের (মৌর্য্য) ২৮৩ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে তিনি চন্দ্রগুপ্তের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যে ৩১৬ হইতে ২৯২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা সর্ব্বজনসম্মত। † তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পুরাণেও অজাতশত্রুর

---

* Early History of India, V. A. Smith, P. 33.
† A Brief History of the Indian people by W. W. Hunter, P. 77.

রাজ্যপ্রাপ্তি ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বেই। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকাল বায়ুপুরাণে ১৭ ও মৎস্য-পুরাণে ১৯ বৎসর বলা হইয়াছে। অতএব পুরাণমতে অজাতশত্রুর রাজত্ব-কাল ৫০০ খৃ: পূ: হইতে ৪৮৩ বা ৪৮১ খৃ: পূ: পর্য্যন্ত; বুদ্ধ-নির্ব্বাণও এই কাল মধ্যে হওয়াই উচিত।

ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলীয় মতে নির্ব্বাণকাল ৫৪৪ খৃ: পূর্ব্বে; কিন্তু তিব্বতীয় মতে উহা ৯৪৯ ও ৮৮২ খৃ: পূর্ব্বে। অশোকস্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, ঐ স্তম্ভ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দের ২৫৬ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের রাজত্ব-কালে অর্থাৎ ২৭২ হইতে ২৩১ খৃ: পূ: মধ্যে ঐ স্তম্ভ নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হয়। অতএব এই শিলালিপি-মতে বুদ্ধনির্ব্বাণ-সম্বৎ নিশ্চয়ই ৫২৬ হইতে ৪৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্বের মধ্যে। এই মত সমর্থন করিয়া V. A Smith সাহেব বলেন,—"the date must have been 487 B.C. approximately."

কিন্তু অনেকেই এই ব্যাপার লইয়া উৎকট মীমাংসা করিয়াছেন। দুই একটী উদাহরণ দেওয়া গেল—

M. Abel Rernsut বলেন,—" He (অশোক) was the great grand-son of King Pingcha or Pinposolo (বিম্বিসার)......and flourished a century subsequent to the Nirvana of Sakyamuni. .... As the foundation of nearly all the religious edifices in ancient India is attributed to this sovereign and referred to 116 years after the Nirvana, the ninth year of the Regency of Koungho, 833 B.C."* তাহা হইলে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ-সম্বৎ হইল ৮৩৫খৃ: পূর্ব্বে!

M. M. Klaproth বলেন—" This is Asoka (in Chinese Ayu) who reigned one hundred and ten years after the Nirvana of Sakyamuni."

ইঁহার মতে নির্ব্বাণ-সম্বৎ ৩৮২ খৃ: পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ।

M. Abel Rernsut বলেন,—' Mahakasyapa the first successor of Sakyamuni in the capacity of patrich, withdrew to the hill Kakutapada to await the advent of Maitreya in the fifth year of Hiowang of the Cheou, 905 B.C., 45 years after Nirvana, when Ananda (বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য) was 94 years old."

তবে বৌদ্ধনির্ব্বাণ ৮৬০ খৃ: পূ: হইতে আরম্ভ বলিতে হয়। আনন্দের বয়স অনুসারে দেখা যাউক। আনন্দ ৯৯৯ খৃ: পূ: জন্মগ্রহণ করে। যদি মহাকাশ্যপের কাকুতাপাদ পর্ব্বতে যাইবার সময়ে আনন্দের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর হয়, তাহা হইলে সেই কাল হয় ৯০৫ খৃ: পূর্ব্বে। তাহা হইতেই গণনা করিলে বুদ্ধনির্ব্বাণ-সম্বৎ পাওয়া যাইবে ৮৬০ খৃ: পূর্ব্বে।

Fa Hian ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণার্থ আগমন করেন, তাঁহার সময় নির্ব্বাণ

* See Pilgrimage of Fabian, Chap. X. note 3. Bangabasi reprint.

হইতে ১৪৯৭ বর্ষ অতীত। অতএব নির্ব্বাণ-সম্বৎ যে খৃঃ পূর্ব্ব ১০৯৮ অব্দে তাহাও ধারণার অতীত! এই Fahianই তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের আরও এক স্থানে লিখিয়াছেন,—'সিন্ধুতটের বৌদ্ধগণ বলিতেন যে, মৈত্রেয়ের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি-স্থাপনের সময় ভারতের শ্রমণগণ কর্ত্তৃক ঐ নদীর পরপার্শ্বে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ মূর্ত্তি-স্থাপন শাক্যমুনির নির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পর Cheo বংশের Phingwingএর রাজত্বকালে সম্পাদিত হয়।"

এখন Phingwing ৭৭০ খৃঃ পূর্ব্বে রাজা হন ও ৭২০ খৃঃ পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা হইতে শাক্যের মৃত্যুকাল নির্দ্ধারিত করা যায়। ১০৭০—১০২০ খৃষ্ট পূর্ব্বের মধ্যে ইহা অসম্ভব হইলেও পূর্ব্ব কালনির্ণয় অপেক্ষা একটু নিম্নে!

তার পর হিউয়েং সাং কুশীনগরে আসিয়া বলিতেছেন,—"এইখানে ইষ্টক-নির্ম্মিত এক বৃহৎ বিহার আছে, তন্মধ্যে তথাগতের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মস্তক উত্তর দিকে; দেখিয়াই বোধ হয় যেন প্রভু আমার নিদ্রিত। এই বিহারের পার্শ্বেই অশোকরাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। তথায় একটী প্রস্তর-স্তম্ভও আছে, তাহাতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে; কিন্তু কোন্ বৎসরে বা মাসে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি যে, বুদ্ধ পৃথিবীতে আশী বৎসর বাঁচিয়াছিলেন ও বৈশাখের শেষার্দ্ধ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবসে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সর্ব্বাস্তবাদিগণ বলেন যে, তিনি কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন তাঁহার নির্ব্বাণের পর ১২০০ বৎসর গত হইয়াছে, কেহ বলেন ১৫০০; কিন্তু এখনও পূর্ণ ১০০০ বৎসর গত হয় নাই।"

খৃষ্টের ৭ম শতাব্দীতে (৬৩০—৬৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) হিউয়েন্ সাং ভারতে আগমন করেন, তখনও যদি নির্ব্বাণকাল হইতে ১০০০ বৎসর গত না হইয়া থাকে, তবে নির্ব্বাণ-সম্বৎ যে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বের পর নয় তাহা নিশ্চিত। ১৫০০ বা ১২০০ গত হইয়া থাকিলে ৮০০ ও ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে নির্ব্বাণ-অব্দ হয়। ইহার সমর্থনে W. W. Hunter সাহেব বলেন,—"He spent the night preaching, and in comforting a weeping desciple........ He died calmly at the age of eighty, under the shadow of a fig tree in 543 B.C.*

ঐতিহাসিক John Clark Marshman বলেন,—"The death of Gautuma, is fixed by the general concurrence of authorities, in the year 550 before our era." †

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের বৌদ্ধ ইতিকথার মতে নির্ব্বাণ ৫৪৪ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ বিক্রম সম্বতের ৪৮৭ বর্ষ পূর্ব্বে (৫৭+৪৮৭ খৃঃ পূর্ব্বে) সংঘটিত হয়।

* W. W. Hunter's Brief History of Indian people. P. 64.

† The History of India. Marshman. P. 11.

কিন্তু ঐ কাল যে খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। তাহার প্রমাণ,—

(১) Smith সাহেব বলেন,—"Paramartha author of the Life Vasubandhu places the teachers Vrishna-gana and Visdhya-vasu who flourished in the 5th century A.D. as living in the tenth century after the Nirvana." এই মতানুসারে বুদ্ধিনির্ব্বাণ হইল খৃষ্ট জন্মের পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে।

(২) ৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত Cantonএর "বিন্দু বিবরণে" (Dotted records) নির্ব্বাণ বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৭৫টী বিন্দু দর্শিত হইয়াছে। তবে নির্ব্বাণ সম্বৎ (৯৭৫—৪৮৯) ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে হয়।*

(৩) "অজাতশত্রুর যৌবরাজ্যসময়ে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের মাতুল-পুত্র ও শিষ্য দেবদত্ত বৌদ্ধসংঘমধ্যে দারুণ বিরোধানল প্রজ্বলিত করেন, অজাতশত্রু তাহার সমর্থক ও সহায়রূপে দণ্ডায়মান হন।" † এই কথা ঠিক হইলে বৌদ্ধনির্ব্বাণ-সম্বৎ হয়, ৪৯১।১৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বে।

(৪) Dr. Tbet ৪৮২ খৃঃ পূঃকে নির্ব্বাণের আনুমানিক কাল মনে করেন। তিনি বলেন,—"it is the most probable date we are likely to obtain."*

তার পর অজাতশত্রুর সময়ে শাক্যের নির্ব্বাণ হইলে তাহাও পঞ্চম শতাব্দীতে বলিয়া বোধ হয়। আর অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রায়ই এই মতের সমর্থন করেন; কিন্তু প্রকৃত নির্ব্বাণ-বর্ষ কোন্ সময়ে, তাহার নির্দ্দেশ এক প্রকার সাধ্যাতীত।

অশোক-স্তম্ভলিপি অনুসরণ করিয়া Prof. Bulmann বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ ৪৮৩—৪৭১এর মধ্যে। তাহা অনেকটা সত্য, কিন্তু বুদ্ধনির্ব্বাণ-সম্বৎ যে, ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৭০ খৃঃ পূর্ব্বের মধ্যে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। ঐ কাল মধ্যে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ এই মত সমর্থন করিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক নির্ব্বাণের বিভিন্ন কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

W. A. Smith	বলেন	...	৪৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্বে
Dr. Tbet	"	...	৪৮২ "
Prof. Ferguson	"	...	৪৮১ "
Alexander Cunningham	"	...	৪৭৮ "
Maxmuller	"	...	৪৭৭ "

তাহা ত হইল, কিন্তু শাক্যমুনির নির্ব্বাণ কোন বৎসরের বৈশাখের শেষার্দ্ধ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবসে, তাহা কেহ বলিয়া দিবেন কি?

শ্রীতারানাথ রায়।

---

* Takakusa. J. R. A. S. 1905. P. 51.

† শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৬।

* J. R. A. S. 1906. P. 667.

অর্ঘ্য,

তৃতীয় কল্প, ১ম খণ্ড।

যোগেন্দ্র-কথা।

"বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের কতক পরিচয়াভাস গত ভাদ্র মাসের "অর্ঘ্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মাসে ধারাবাহিকরূপে সেই মহাপুরুষের জীবন-কথা প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা; কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। আমাদের ইচ্ছা যে অনিচ্ছায় অপূর্ণ, এমন কথা হয় ত কেহ কেহ ভাবিতে পারেন; কিন্তু তাহা নহে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ইহসংসারে আজীবন আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তিনি যে "বঙ্গবাসী"তে লিখিতেন, তাঁহার অসাধারণ লিপি-নৈপুণ্য ছিল, "বঙ্গবাসী"র প্রথম প্রকাশের পর অনেকেরই সেরূপ ধারণা ছিল না। এক দিন আধুনিক প্রবীণ সাহিত্যসেবক শ্রীযুত বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের নিকট এ সম্বন্ধে যে সন্ধান পাইয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই কৌতুকাবহ ও চিত্তাকর্ষক। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারা যায়। "বঙ্গবাসী"র লেখা-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কৃতিত্ব-পরিচয় তাঁহার জীবিতাবস্থায় কতক পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সকল গ্রন্থাদির রচনায় সাহিত্যের সম্পদ সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায় অনেকেই দেশের, অধিকাংশ সাহিত্যসেবীই তাহা জানিবার অবকাশ বা সুযোগ পান নাই। তাঁহার কোন গ্রন্থে তিনি আপনাকে রচয়িতা বলিয়া পরিচয় দেন নাই। নামালিপ্সতা তাঁহার আত্মগোপনের প্রধান কারণ। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জীবন-কথার বহু-তথ্য সন্ধানের জন্ত আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে। তাঁহার জীবন-তথ্য জানিবার ঐকান্তিক প্রয়াস আছে তাই কোন আয়াস-স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত না হইলেও তথ্য-সংগ্রহে সহজ সুযোগ পাই নাই। তাঁহার সকল কথা জানেন,—এমন লোকের সন্ধানে আমাদিগের সময়ের

অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফলে, তাঁহার জীবন-কথা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার পক্ষে একটা অন্তরায় আসিয়া ঘটিয়াছে।

শ্রীযুত বিহারিলাল সরকার মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সহিত বিংশতি বর্ষ কাল বিজড়িত। "বঙ্গবাসী"তে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল, "বঙ্গবাসী"তে যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখনীর রেখাপাত মাত্র হইত না। তিনি একজন অসাধারণ অধ্যবসায়শীল, সুদক্ষ, সুচতুর কর্ম্মবীর,—বিহারী বাবুর এইটুকু মাত্র ধারণা ছিল। "বঙ্গবাসী"তে প্রথম প্রথম "গহনা-রহস্য" প্রভৃতি যে সকল লেখা প্রকাশিত হইত, বিহারীবাবুর ধারণা ছিল যে, তাহা প্রবীণ প্রাজ্ঞ রসভাবোদ্দীপক-রচনা-পটু কবি-দার্শনিক শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত। "বঙ্গবাসী"তে কার্য্য করিবার প্রথম অবস্থায় একদিন শ্রীযুত বিহারিলাল সরকার মহাশয় প্রুফ দেখিতেছিলেন, সেই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিহারী বাবু যে প্রুফটী দেখিতেছিলেন, তাহা যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই লেখা। সে লেখার অপূর্ব্ব রস-রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া বিহারী বাবু বলিয়া ফেলেন,—চন্দ্রশেখর বাস্তবিকই বাণীর বরপুত্র। এমন রচনা চন্দ্রশেখর না হইলে আর কাহারও হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন,—ইহা এমনই কি লেখা?" বিহারীবাবু তখন যোগেন্দ্রচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলেন,—"সে কি মহাশয়, এমন রচনার আপনি নিন্দা করিতেছেন!" যোগেন্দ্রবাবু একটু মৃদু হাসিলেন, বিহারী বাবুর একটু সংশয় হইল। তিনি বলিলেন,—"মহাশয় যে চন্দ্রশেখরের 'গহনা-রহস্য' 'ননদ-ভাজ' প্রভৃতি লেখায় আপনার 'বঙ্গবাসী' উজ্জ্বল হইয়াছে, আজ তাঁহারই লেখা আপনার অনুমোদিত নহে। যোগেন্দ্রচন্দ্র আবার একটু মৃদু হাসিলেন। তখন বিহারী বাবু বলিলেন,—"তবে ইহা চন্দ্রশেখরের লেখা নহে?" অবশ্য বিহারী বাবুর তখনও বিশ্বাস, ইহা চন্দ্র-শেখরের না হয় নাই হউক, যোগেন্দ্রচন্দ্রের ত নহেই। পরে অবশ্য কর্ম্মসূত্রের ঘনিষ্ঠতায় বিহারী বাবু জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই লেখাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের; আর "গহনা-রহস্য" প্রভৃতি লেখাও যোগেন্দ্রচন্দ্রের। সে বিপুল বিরাট কৃষ্ণকায় চিরগম্ভীর যোগেন্দ্রচন্দ্র যে অমন রসরচনা করিতে

পারেন, ঘোরতর অবিশ্বাসের পর বিহারী বাবু যদি একটু বিস্মিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র চিরকালই আত্মনির্ভর। তাঁহার শক্তি চিরকালই অন্তর্মুখী। এই অন্তর্মুখী শক্তির প্রভাবে তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী হন নাই। সত্য সত্যই যিনি আত্মনির্ভর, তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী হইতে পারেন না। এ দৃষ্টান্ত কেবল মানবে নহে, পশুজীবনেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহশাবক ক্ষুধায় কাতর হইলেও অপর কাহারও কর্ত্তৃক নিহত পশু গ্রহণ করে না। এমন কি তাহার মাও যদি শিকার আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করে, সে তাহা স্পর্শ করে না। সে নিজ বাহু-বলে শিকার করিতে চাহে। পশুজীবনে যাহা দেখিতে পাই, মানব-জীবনে তাহার দৃষ্টান্তাভাব হইবে কেন? যোগেন্দ্র-চরিত্রে সে দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত। হয়ত তাঁহাকে কখনও নানা কার্য্য-বৈচিত্র্যে পরমুখাপেক্ষিতার প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে; কিন্তু যখনই তিনি বুঝিয়াছেন যে, পরমুখাপেক্ষিতাই তাঁহার কার্য্যের পরিপন্থী বা প্রতিবিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে সেই পরমুখাপেক্ষিতার সুদৃঢ় চৈন প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অদ্য তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে আজিকালি "টেলিগ্রাফ" নামক একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। "টেলিগ্রাফ" সুপরিচালিত ও সু-সম্পাদিত। যোগেন্দ্রচন্দ্র এই "টেলিগ্রাফ" সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইহাকে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ইহা প্রকাশিত হইত। প্রথমতঃ বহুবিজ্ঞ ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ সুলেখক শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে যোগেন্দ্রচন্দ্র ইহার সম্পাদক-পদে নিয়োজিত করেন। ত্রৈলোক্যনাথ কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লেখনী-সঞ্চালনে অসাধারণ শক্তিশালী। একদিন স্বর্গীয় রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বিলাতে ত্রৈলোক্যনাথের সহিত বসিয়া ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য-সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-

স্তুতিঘের পরিচয়ে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ হেন ত্রৈলোক্যনাথকে "টেলিগ্রাফে"র সম্পাদন-ভার সমর্পণ করিয়া যোগেন্দ্র চন্দ্র নিশ্চিন্তই হইয়াছিলেন। দৈনিক "টেলিগ্রাফ" কিরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে অবশ্য তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। "বঙ্গবাসী"তে যে মত অভিভাষিত হইয়া থাকে, "টেলিগ্রাফে" সেই মতই চলে, অবশ্য যোগেন্দ্রচন্দ্রের ইহাই বাঞ্ছনীয় ছিল। ফলে কিন্তু একটু গোল হইল। ক্রমে "টেলিগ্রাফে"র মত একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া "বঙ্গবাসী"র মতের কিছু বিরোধী হইয়া পড়ে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথকে সসম্মানে 'টেলিগ্রাফ' ও "বঙ্গবাসী"র মত-সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বলেন,—"বঙ্গবাসী'তে যে মত চলে চলুক, 'টেলিগ্রাফে' ঠিক সেই মত নাই বা চলিল, তাহাতে ক্ষতি কি? "টেলিগ্রাফ" ত স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত, স্বতন্ত্র সংবাদপত্র।" যোগেন্দ্রচন্দ্র বলেন,—"তাহা কিরূপে হইবে? যদি একজন যাত্রার অধিকারী যাত্রা করিতে করিতে একদিকে বলে,—বিলেত যাও, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিও না, জাতিভেদ মানিও না, ইহজন্মে পরজন্মে অবিশ্বাস করিও না, আবার অন্য দিকে যদি ঠিক ইহার উল্টা বলে, তাহা হইলে কেমন হয় বল দেখি? তাহা হইলে লোকে বুঝিবে না কি?"

একদিন অপরাহ্নে যোগেন্দ্রচন্দ্র "বঙ্গবাসী" অফিসে একটু নিভৃতভাবে বিহারী বাবুকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন,—"বিহারী বাবু আপনি ইংরেজী লিখুন।" বিহারী বাবু বলেন,—"এ আবার কি কথা! আমি বাঙ্গালা লিখ্‌তেই পোনেরটা ব্যাকরণ ভুলি, ত ইংরেজী লিখিব কি? ইহাতে যোগেন্দ্র বাবু বলেন যে, আপনাকে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, এবং আমিও ইংরেজী লিখিব; নইলে 'টেলিগ্রাফে' 'বঙ্গবাসী'র মতটুকু বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। ইহার পর আর কোন কথা হইল না। মাসখানেক পর একটা রব উঠিল, "টেলিগ্রাফে" যোগেন্দ্রচন্দ্রের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "বঙ্গবাসী"তে যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে বিহারী বাবু যে ধারণাটুকু পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, "টেলিগ্রাফে"র লেখার বার্ত্তায় বিহারী বাবুর সে ধারণার পোষণ সে পর্য্যন্ত অপসারিত হয় নাই। ফলে

প্রকৃত তথ্য-প্রকাশে বিহারী বাবুর অবিশ্বাস-পোষণটা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার পর যোগেন্দ্রচন্দ্র-লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ "টেলিগ্রাফে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে রুষ-জাপান-যুদ্ধ সম্বন্ধে "টেলিগ্রাফে" যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, সে সকল প্রবন্ধের তুলনা অনেক শক্তিসম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপত্রেও পাওয়া যায় নাই। অবশ্য তাবার তুলনায় ধৃষ্টতা আসিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের নীতি, যুদ্ধের গতি, যুদ্ধের ঘটনা, যুদ্ধের বর্ণনা "টেলিগ্রাফে" যেমন বিশদ ভাবে প্রকটিত হইত, আমরা বলিতে পারি অনেক শক্তিশালী ইংরেজী পত্রে সে ভাবের অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হইত। "সিভিল মিলিটরী গেজেট", "পাইওনীয়র" প্রভৃতি সংবাদপত্র সেই সকল প্রবন্ধের প্রতিষ্ঠাখ্যাপনে কুণ্ঠিত হইতেন না। যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই সময়ের "টেলিগ্রাফে" গ্রীষ্ম-সম্বন্ধে এমন একটি রসাল অনুবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, শক্তিশালী ইংরেজ সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সিভিল মিলিটরী গেজেট" তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ভগবৎ-প্রেরণায় 'টেলিগ্রাফে"র প্রবন্ধে চমৎকারের চিক্কণ আলোকে সত্য সত্যই একদিন দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই প্রেরণায় সেই সময় বিহারী বাবু "টেলিগ্রাফে" লিখিবার জন্ত প্রবুদ্ধ হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়েন। "বঙ্গবাসী"র কার্য্যাবসানে বিহারী বাবুকেও প্রতি সপ্তাহে টেলিগ্রাফে একটি করিয়া ইংরেজী প্রবন্ধ, কখনও দুই চারিটী অনুবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। কেবল শক্তিশালী যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রেরণায় বিহারী বাবু কোনক্রমে সে সময় বিপদুদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় বিহারী বাবু "টেলিগ্রাফে" পল্লীগ্রামের জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। একদিন বিহারী বাবুকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"সত্য সত্যই কি যোগেন্দ্রচন্দ্রের ইংরেজী লেখার অভ্যাস ছিল, আর আপনার—?" বিহারীবাবু বলেন,—"এক সময়ে যোগেন্দ্র চন্দ্রের অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হইবার পর তিনি আর সে অভ্যাস রাখেন নাই, এইরূপই জানিতাম। তবে 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত কার্য্যসূত্রে তাঁহার যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তখন কার্য্যসূত্রে তাঁহাকে ইংরেজীর

আলোচনা করিতে হইত। এই সময়ে তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে অনেক ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র কিরূপ অধ্যবসায়ে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্য করিতেন, কিরূপ ইংরাজী ভাষায় তাঁহাকে কার্য্য পরিচালন করিতে হইত, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এই কার্য্যসূত্রে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় সুরেন্দ্রনাথ এই সব কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছিলেন। অবশ্য বলিয়াছি ত, 'বঙ্গবাসী'র কার্য্যকালে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে কোনও পরিচয় প্রকাশ করিতেন না। পরন্তু তিনি এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতেন যে, তিনি ভাল ইংরেজী জানেন না। প্রকাশ্যে এইরূপই বুঝিতাম, ভিতরের কথা কেমন করিয়া বলিব। তবে এইটুকু জানি, যে দিন তিনি আমাকে 'টেলিগ্রাফে' ইংরেজী লিখিতে বলেন, সেই দিন হইতে তিনি নানাবিধ ইংরাজী ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া 'বঙ্গবাসী'র কার্য-অবসানে রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত তাহা পড়িতেন। এই সময়ে তিনি কত ইংরেজী গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব অবশ্য আমার হাতে এখন নাই, তাঁহার বাড়ীর লাইব্রেরী কতকটা তাহার পোষক প্রমাণ।"

এই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের কাল রোগের সূত্রপাত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র "বঙ্গবাসী"র ভার কতকটা বিহারী বাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন বটে, কিন্তু "টেলিগ্রাফে"ই তিনি জীবনপাত করিয়াছেন। "টেলিগ্রাফে"র জন্য অজস্র ব্যয়, অবিরাম পরিশ্রম তাহার উপর "বঙ্গবাসী"র লেখা, ছাপা প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, বিষয়াদির নির্দ্ধারণ, তাহার উপর আফিসের আর্থিক অবস্থাদির পরিদর্শন ইত্যাদি সকল কার্য্যের উপর যোগেন্দ্রচন্দ্র "টেলিগ্রাফে"র রচনা ও ইতিহাস-পাঠ-পরায়ণতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দেহে আর কত সহিবে? তিনি অসাধারণ বিরাট কর্ম্মবীর ছিলেন বলিয়াই তাই এত কাজের পাষাণ-চাপেও তাঁহাকে অধৈর্য্যের আকুলতা এক মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শ করিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বাস্থ্যোদ্ধারের সংকল্পে তিনি মধুপুরে যাইলেন। যিনি কর্ম্মী, তাহার কর্ম্মে কি বিদায় চলে! মধুপুরেও

প্রকাণ্ড আফিস। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারী। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে খাতাপত্র, বিপুল গ্রন্থ, অপর্য্যাপ্ত বিজ্ঞাপনপত্র,—প্রত্যহ দস্তুরমত আফিসের কাজ হইত। যোগেন্দ্রচন্দ্র শয্যাশায়ী। চারিদিকে কর্ম্মচারী। ক্ষুধা নাই, বিষম অরুচি; তাহার উপর নিত্য একটু একটু জ্বর। কিন্তু কার্য্যের বিরাম নাই। বেলা ১০টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত আফিসের নিয়ম-সঙ্গত অবিরাম কার্য্য। কেহ বিজ্ঞাপনের কাগজ ভাঁজিতেছে, কেহ বিজ্ঞাপন পাঠাইবার নাম লিখিতেছে, কেহ কাগজ মুড়িতেছে, কেহ টিকিট মারিতেছে, কেহ ডাকঘরে দৌড়িতেছে, কেহ হিসাব করিতেছে, কেহ চিঠি-পত্র লিখিতেছে,—সেই একমাত্র কর্ম্মবীরের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে সকলেই—সকল কর্ম্মচারীই কর্ম্মে ব্যস্ত; যোগেন্দ্রচন্দ্র কেবল তাহা পরিদর্শন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। কলিকাতা হইতে যে সকল সংবাদপত্র সেখানে প্রেরিত হইত, তিনি সেগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। তাঁহার মধ্য হইতে কোন্ বিষয় হইতে তিনি স্বয়ং লিখিবেন, কোন্ বিষয়ে এখানে লিখাইতে হইবে, কি ভাবে লিখিতে হইবে, এই সব স্বয়ংই তিনি মীমাংসা করিতেন। স্বহস্তে তাঁহার লিখিবার শক্তি ছিল না; যাহা কিছু তিনি লিখিবার মানস করিতেন, তাহা লিখাইতেন। সে অন্তিম শয্যায় রোগের যন্ত্রণায় যোগেন্দ্রচন্দ্র যেন সুস্থ হাস্যে, অমলিন আস্যে নিজেই সকল কার্য্য করিতেন। অফিসের কার্য্যাবসানে রাত্রিকালে সেই পড়া, আর "টেলিগ্রাফে'র জন্য সেই প্রবন্ধ লেখা। পূর্ব্বে তিনি একটু অসুস্থবস্থায় হাজারিবাগে গিয়াছিলেন। তখন হাজারিবাগে মণিপুর রাজকুলচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন এই সময় বন্দী মণিপুররাজের দুরবস্থার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। নির্ব্বাসিত কুলচন্দ্রের মর্ম্মবেদনার কথা শুনিয়া সে রোগ-নির্য্যাতিত বেদনা-হত যোগেন্দ্রচন্দ্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুলচন্দ্র ইংরাজ রাজপক্ষ হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। অনেক দিনই তাঁহাকে সপরিবারে নিরশনে থাকিতে হইত। মর্ম্মে বেদনা ফুটিলে ভাষার উচ্ছ্বাসে ভাব ফুটিয়া উঠে। কুলচন্দ্রের কথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিল, সে আঘাতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়-তন্ত্রী অব্যক্ত অস্ফুট ভাব-ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিয়া উঠিল। সেই ঝঙ্কারের রেশ পরিব্যক্ত ভাষায় তাড়িত

বেগে যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখনীমুখে আসিয়া সঞ্চারিত হইল। যোগেন্দ্রচন্দ্র "টেলিগ্রাফে'র জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিহারী বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন "বঙ্গবাসী'তে এই করুণ ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠে। "টেলিগ্রাফে" সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। আমরা সে প্রবন্ধ পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। সে প্রবন্ধ পড়িয়া আমাদের মনে হইল যেন আমাদের বুকের হাড় মড় মড় করিয়া খসিয়া পড়িল। সে সময়ে আমরা এমন একজনও "টেলিগ্রাম"-পাঠীকে দেখিতে পাই নাই যে, সে প্রবন্ধ পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল। লেখার ঐহিক ফল কিছু হয় নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই সেই লেখার করুণ-ঝঙ্কারে ভগবানের আসন টলিয়াছিল। আজ কুলচন্দ্র নাই, আজ যোগেন্দ্রচন্দ্র নাই, আজ সে দৈনিক টেলিগ্রাফ নাই, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের শেষ মুহূর্ত্তে যে করুণ বেদনার করুণ সুরে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, আমাদের মনে হয়, এখনও যেন তাহার প্রতিধ্বনি কর্ণে কর্ণে ঝঙ্কারিত এই আমাদের বঙ্গভূমির, আমাদের ভারতভূমির ঘাটে, পটে, মাঠে, অন্দরে বাহিরে পর্ব্বতে জলধিজলে সর্ব্বত্রই তরঙ্গায়িত হইতেছে। ০

এই শেষ। যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই শেষ। তাঁহার অমানুষিক অধ্যবসায়ের ও তাঁহার লিখন-নিশানার এই শেষ। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার লেখা আজ তাঁহার নিশানা রহিয়াছে। আর কি বুঝাইতে হইবে, —যোগেন্দ্রচন্দ্র অধ্যবসায়ের কিরূপ পূর্ণ অবতার!

মুসলমান-শাসনকালে গোয়েন্দা।

অনেকের ধারণা ভারতে গোয়েন্দা-বিভাগের সৃষ্টি ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে হয় নাই। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। আধুনিক ভারতে যেমন গোয়েন্দার অমানুষিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ গোয়েন্দা-বিভাগ ছিল। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা ভারতের অতীত যুগের গোয়েন্দাবিভাগের আলোচনা না করিয়া সেদিনের মোগল শাসনকালে যে গোয়েন্দাবিভাগ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলিজী তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে সুশৃঙ্খল ভাবে গোয়েন্দাবিভাগ প্রচলিত করেন। তৎপূর্ব্বে এই বিভাগের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা তত সুশৃঙ্খল ছিল না। সুতরাং এক হিসাবে আলাউদ্দীন খিলিজীকে এই গোয়েন্দাবিভাগের পরিচালক বলা যাইতে পারে। আকবরের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ ফেরিস্তা-প্রণীত ইতিহাসের একস্থলে উল্লিখিত আছে যে, দিল্লীর কোতয়াল ফকিরুদ্দিনের পুত্র হাজি মাওলা-কৃত বিদ্রোহ-দমনের পর, আলাউদ্দীন ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ-ভয়ে ভীত হইয়া দেশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার মন্ত্রদাতাগণের অনেক প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তিনি প্রথমতঃ শাসন-সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুসন্ধান, লোকের দুঃখকষ্ট-নিবারণ এবং গোপনে লোক-চরিত্র-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রত্যেক নাগরিকের অতি গোপনীয় পারিবারিক সংবাদ পর্য্যন্ত অবগত হইতেন। শুধু তাহাই নহে,—অতি দূর প্রদেশসমূহেও প্রতি মুহূর্ত্তে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তিনি সে সংবাদও রাখিতেন।

তোগলক বংশের রাজত্বকালে এই গোয়েন্দা-বিভাগ অধিকতর সুশৃঙ্খল হয়। দেশের প্রান্তবাসী প্রত্যেক লোকের নাম ও ব্যবসায়াদির অনুসন্ধান লইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা সেই সকল বিবরণ রাজার নিকট প্রেরণ করিতেন। বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন বতুতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন; তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একস্থলে এই মর্ম্মে লিখিত আছে ঃ—

মহরম-উল্-হরম মাসের ১লা তারিখে আমরা সিন্ধুনদে উপনীত হইলাম। এই নদী হইতে সুলতান মামুদ তোগলকের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। যখন আমরা এই নদীতে উপস্থিত হইলাম, তখন রাজকীয় চরগণ আমাদের আগমনবার্ত্তা শাসনকর্ত্তার নিকট জানাইলেন।

তিনি সিরিয়া, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি রাজকীয় চরগণকে সংবাদ প্রদান করিতে দেখেন নাই। কাজেই এই ঘটনা তাঁহার নিকট কিছু নূতন বলিয়া প্রতীত হইল; কারণ তিনি আবার লিখিতেছেন:—

এই সকল রাজকীয় চর বা সংবাদ-দাতা প্রত্যেক পর্য্যটকের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিত। পর্য্যটকের আকৃতি কিরূপ, তাহার বেশভূষা কিরূপ, তাহার সহিত কতজন ভৃত্য ও গৃহপালিত পশু আছে এবং তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় বা যাইবেন,—এই সমস্ত বিষয় সংবাদ-লেখকেরা শাসনকর্ত্তার নিকট লিখিয়া পাঠাইত।

তোগলক বংশের পর সৈয়দ ও লোদী বংশ ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাহাদের রাজত্বকাল কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কাজেই উক্ত দুই বংশের রাজত্বকালীন বিস্তৃত ইতিহাস-লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। তিনি কেবল রাজ্যের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি অধিক দিনও রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই; বাবরের পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি সের শাহ শূরের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারায় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং উপরোক্ত সম্রাট্দ্বয়ের রাজত্বকালে গোয়েন্দা-বিভাগের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। হুমায়ুনের পর আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকাল এক প্রকার শান্তিময় ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে গোয়েন্দা-বিভাগের জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ ছিল এবং সর্ব্ব-প্রকারের সংবাদ এই বিভাগে প্রেরিত হইত। প্রসিদ্ধ "আইন-ই-

আকবরী”তে গোয়েন্দা-বিভাগ-সম্বন্ধে একস্থলে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই :—

এই গোয়েন্দা-বিভাগ রাজকার্য্য-সমাধার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। গোয়েন্দা-বিভাগ পূর্ব্বে ছিল বটে, কিন্তু সম্রাট্ আকবরের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে এই বিভাগ দ্বারা বিশেষ কোন প্রকার ফল হয় নাই। এই বিভাগের কার্য্য-সম্পাদনের জন্য চতুর্দ্দশজন টেপুকৃচীজ্ নামধারী লোক আছে, তাহাদের মধ্যে দশজন পর্য্যায়ক্রমে দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করে। যদি কখনও কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ উপরোক্ত কর্ম্মচারিগণ অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত অতিরিক্ত লোক কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। ইহাদিগকে কোতয়াল বলে। ওয়াকিয়াব-নবিসেরা নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর লিখিত বিবরণ লয়। যথা,—সম্রাট্ স্বয়ং কি করেন, তিনি কি কি আদেশ প্রচার করেন, কোন্ সম্ভ্রান্ত লোকের আগমন ও গমন হইল, কোন্ কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হইল, কখন শান্তি-প্রতিষ্ঠা হইল, এবং সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু-বিবরণ। এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ সম্রাটের নিকট পঠিত হইলে এবং তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত হইলে, দারোগা তাঁহার শীল ইহার উপর অঙ্কিত করেন, তাহার পর ইহা পারওয়ান্চীর ও মীরআরজের নিকট তাহাদের শীল মুদ্রিত করিবার জন্য প্রেরিত হয়। এইভাবে যে বিবরণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে যাদ্শাট্ বলে। তাহার পর যে কর্ম্মচারীর হস্তাক্ষর খুব ভাল, সে যাদ্শাট্-খানিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং তাহার উপর তাহার শীল লাগাইয়া যাদ্শাটের সহিত ইহার বিনিময় করে। এই সংক্ষিপ্ত যাদ্শাট সে ওয়াকিয়াব-নভিস ও মীর আরজের শীল লাগায়।

উল্লিখিত বিবরণপাঠে আমরা স্বতঃই বুঝিতে পারিতেছি যে, কিরূপ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে মোগল-শাসনকালে গোয়েন্দা-বিভাগ পরিচালিত হইত।

আকবর প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনি এই গোয়েন্দা-বিভাগের সহায়তা ব্যতীত এই চেষ্টা ফলবতী করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক আগন্তুকের আগমন-সংবাদ রাজার

নিকট প্রেরিত হইত। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক স্যর্ জন হকিন্স্ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপসমূহে যাইবার পথে একবার সুরাট নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেখানে মোকারাব খাঁ তাঁহার সহিত অভদ্র ব্যবহার করিলে তিনি আগ্রায় আগমন করেন। তাঁহার আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা না থাকায় তিনি অতি সংগোপনে সহরে একটি বাটীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন—

১৬০৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে যখন আমি আগ্রা সহরে গৃহানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ গেল যে, আমি আগ্রায় আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণকে কেন আমাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয় নাই বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে রাজদূতের ন্যায় আমাকে সংবর্দ্ধন করিয়া তৎসমীপে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

অতঃপর তাঁহার অবস্থান-গৃহ শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল এবং মহাসমারোহের সহিত তিনি সম্রাট্-সমীপে নীত হইলেন। তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সম্রাট্ তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিলেন।

স্যর্ হকিন্স্ একস্থলে লিখিতেছেন—আমি তুর্কী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ দেখিয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমাকে তাঁহার দর্শকমণ্ডলীর সাক্ষাতের কক্ষে আহ্বান করিলেন। তাহার পর তিনি আমাকে বলিলেন যে, আমার প্রতি মোকারব খাঁর অসদাচরণের কথা তিনি শুনিয়াছেন এবং তিনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন। সম্ভবতঃ মোকারব খাঁর শত্রুরা সম্রাটের কাছে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছিল; কারণ প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের পশ্চাতে তখন গোয়েন্দা থাকিত।

স্যর হকিন্সের উল্লিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মোগল সম্রাটেরা দেশীয় ও বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের উপর কিরূপ তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন।

মেনুসী পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ সাজাহান ও আওরেঙ্গজেবের দরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ইটালীয় ভাষায় তাঁহার জীবন-স্মৃতি লিখিয়া

গিয়াছেন। ভারতীয় সিবিল সার্ভিস বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মিঃ আরভিন্ সেই জীবন-স্মৃতিখানিকে আবার ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদের একস্থলে লিখিত আছে—

"Throughout his reign Aurenzeb had such good spies that they knew (if it may be said so) even men's very thoughts."* অর্থাৎ আওরেঙ্গজেবের এরূপ সুদক্ষ গোয়েন্দাদল ছিল যে, তাহারা লোকের মনের ভাব পর্য্যন্ত জানিত। আবার তাহার পরেই এই মর্ম্মে লিখিত আছে—

এইভাবে আওরেঙ্গজেব একদিন রাত্রিতে শুনিলেন যে, আলিবর্দ্দী খাঁর স্ত্রী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীকে আদেশ করিলেন তোমার স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আইস। আর একদিন রাত্রিতে তিনি শুনিলেন যে, একটি বিপণির তোরণদ্বার পড়িয়া যাওয়ায় তিনটী ফকির তাহার তলে চাপা পড়িয়াছে। পরদিন অতি প্রত্যূষে শীকারে যাইবার সময় আওরেঙ্গজেব সেই বিপণির নিকট আসিয়া সহসা তাঁহার হস্তীর গতিরোধ করিলেন এবং মৃতদেহগুলিকে বাহির করিবার আদেশ করিলেন। সমভিব্যাহারী লোকজন সকলেই সম্রাটের এই অসম্ভাবিত আদেশে স্তম্ভিত হইলেন। মৃত্তিকা খনিত হইলে ফকির কয়েকজনকে টানিয়া বাহির করা হইল এবং তৎপরে রাজাদেশে তাহাদের সমাধি হইল। অন্যান্য মৃতদেহগুলিরও সৎকারের আদেশ ও তাহার নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থ দিলেন। বলা বাহুল্য যতক্ষণ না মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি সেইস্থানে অবস্থিত ছিলেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সমস্ত প্রকারের সংবাদ মীর আরজই তাঁহার নিকট পাঠাইত; কিন্তু আওরেঙ্গজেব এই নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট যত কিছু সংবাদ প্রেরিত হইত, রাত্রিতে বেগমেরা তাহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। ইহাতে শুধু আওরেঙ্গজেবই যে স্বকর্ণে

---

* Storia do Mogor P. 18.

সমস্ত বিষয় শুনিবার অবসর পাইতেন, তাহা নহে; বেগমেরা ইহাতে রাজনীতি শাস্ত্রে দিন দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন।

অবশ্য সম্রাট্ যে সকল সময়ে সত্য সংবাদই পাইতেন একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। আওরেঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অকৃতকার্য্যতা কেবল মিথ্যা সংবাদ-প্রাপ্তির জন্যই ঘটিয়াছিল।

সুতরাং গোয়েন্দা-বিভাগ যে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ছিল না, এমন ধারণার মূল্যে কোন সত্য নাই।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বসন্তে।

কানন-মাঝে একটা কেমন
হচ্ছে যেন কানাকানি,
কি যেন কি গোপন কথা
হয়ে গেছে জানাজানি।
অশোক ভাবে আকুল হয়ে
অকালে আজ ফুটব নাকি,
ভ্রমর বলে কোমর এঁটে
আজকে বেজায় উঠব ডাকি!
কুঁড়ির ভিতর গুমরে ম'রে
পলাশ আজি দিচ্ছে উঁকি,
ব্যাপার দেখে হাসছে আজি
বনের যত খোকাখুকী।
কি হয়েছে বল্‌লে পরে
ফ্যালফেলিয়ে কেবল চায়;
প্রজাপতি আপন মনে
ফুলের বনে মধুই খায়।

পাপিয়াটি গাইথ ব'লে
করছে যখন আহা উহু ;
মরচে পড়া গলা ঝেড়ে
হঠাৎ কোকিল ডাকল কুহু।
পবন আজি কেমন কেমন
করছে বড় মাথামাথি,
নবীন পাতা ঝিকমিকেয়ে
করছে আজি তাকাতাকি।
বনরাণী হঠাৎ দেখে
শিমুলে তার অধর রাঙা,
সারী দেখে শুকের আজি
কথা কেমন ভাঙা ভাঙা।
আমি বলি পথের তরু
বল না কিগো, কথাই শুন্,
মুকুলভরা আকুল পরাণ
রসাল আজি হেসেই খুন।
করিবরের সকল শরীর
আজকে মদের গন্ধময় ;
নদীর পরে মরাল হেরে
'মরালী ত মন্দ নয়'।
বুলবুলটির গান শুনে আজ
গোলাপ সুখে চলতে রয়,
সবাই আজি উদাসপরাণ
নাইক বনে চলতে ভয়।
বানর-গালে হাত বুলাবার
পড়ে গেছে বিষম ধুম,
শিঙের কোমল কণ্ডূয়নে
মেষের চোখে আসছে ঘুম।

আমি বলি হরিণবালা
ব্যাপার কিগো বল না হায়!
মৃগনাভির গন্ধে ভরা
মৃগের গা সে চেটেই যায়।
সারস আজি বৈরাগী ঘোর,
ঠেলে চলেন মাছের ঝাঁক;
বেড়ে গেছে আজকে রাতে
চক্রবাকীর করুণ ডাক।
কিরাত ফিরে ফুলের বনে
হারিয়ে ফেলে ধনুক-বাণ।
রাখালছোঁড়া দুপুর রাতে
বাঁশরীতে ভাঁজছে তান।
বাঘিনীর আজ হিয়ার ক্ষুধা
পেটের ক্ষুধা গেছে কমে,
কৃষ্ণসারের নয়ন দুটী
পরশে কার পড়ছে নমে।
ব্যাপারখানা জিজ্ঞাসিলে
কয় না কথা জেলের মেয়ে,
নদীর ঘাটে গা ডুবিয়ে
গান গায় আর হাসে চেয়ে।
কৃষকবালার ভিজছে কাপড়
কলস ভেসে যাচ্ছে জলে
চাষার ছেলে কাঁটা ভেবে,
যবের গাছটা উপড়ে ফেলে।
বৌমা আজি পোড়ান ভাজা
চুণ না দিয়ে সাজেন পান,
গিন্নী আজি কিসের ঘোরে
গালটা দিতে ভুলেও যান।

চড়ার জোরে　　　　নৌকা ঠেকে
হুঁস তবে পান আজকে মাঝি,
মাছটা ছুঁড়ে　　　　শামুকগুলো
করছে জড় জেলে আজি।
শুধাই যদি　　　　গুরুম'শায়
ব্যাপারখানা কি রকম ?
গুরুম'শায়　　　　শোনেন শুধুই
পায়রাগুলোর বকবকম।
ত'বিল গোল,　　　　ঠিকের ভুল,
কেরাণী মুছে মাথার ঘাম ;
বড় সাহেব　　　　নাম-সহীতে
লেখেন নিজ মেয়ের নাম।
উকীল বাবু　　　　টানেন শুধু
গুড়গুড়িটে—তামাক নাই ;
কোর্টে বসেই　　　　গুণগুণাচ্ছেন
কড়া-হাকিম—দেমাক নাই।
ছাত্র দেখেন　　　　গণিত খুলে
কণ্বঋষির তপোবন,
খাতার পাতায়　　　　পুত্র রচে
চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ।
আমরা দেখি　　　　হঠাৎ ভোঁদা
কবি হ'ল লিখছে গান,
কবি আজি　　　　বেজায় ভাবুক
গাইতে গাইতে লিখেই যান।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব।

শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র একজন ধনী সদ্‌গুণবিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আদিম নিবাস উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে। রাজা ভ্রমরের অত্যাচার-ভয়ে তিনি পৈতৃক বাসাবাটীর মায়া ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাত সন্তান; তন্মধ্যে পঞ্চম সন্তান জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে পাঠাভ্যাস করিতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পাঠশেষে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পতিব্রতা সতী শচীদেবী অশেষগুণালঙ্কৃতা। তাঁহার প্রশান্ত পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহারই গর্ভে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল গুরুপরিবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমাধবপুরী, কেশবভারতী, ঈশ্বরপুরী, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত, পণ্ডিত শ্রীবাস ও বিদ্যানিধি হরিদাস ঠাকুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পবিত্রসলিলা ভাগিরথী-পাদধৌতা নবদ্বীপ রাজধানী বিদ্যাসমৃদ্ধির জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় দর্শন, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের যেরূপ বিশেষ চর্চ্চা হইত, তাহা হিন্দুস্থানের আর কোনস্থানে হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু পণ্ডিতগণের হৃদয় নীরস শাস্ত্র-চর্চ্চায় শুষ্ক ও ভক্তিশূন্য হইয়া গিয়াছিল। শিষ্যগণও বেদবেদান্ত ও ষড়দর্শনের ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। তাহারা পতিতপাবনী ভক্তিগঙ্গার তীরে বসিয়া কেবল শুষ্ক বালুকারাশি সংগ্রহ করিতেছিল। সকলেই তর্কবাগীশ ও ঘোর অবিশ্বাসী, তর্ক করিয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিতে উদ্যত। ধর্ম্ম আচারগত ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে মায়াবাদের এই ভীষণ অবনতি; অন্যদিকে সুরাপানে ও শোণিত-পাতে তন্ত্রের বিষম অধোগতি। বসুন্ধরা পাপপূর্ণা হইয়া উঠিল; জগতে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। এই দুর্দ্দিনেও কতিপয় অল্পসংখ্যক বৈষ্ণবপণ্ডিত পথভ্রান্ত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহারা নবদ্বীপের জ্ঞানসমৃদ্ধি ও ভক্তিহীন-

তার পরিচয় পাইয়া ব্যথিতচিত্তে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেন। বৈষ্ণবগণ জ্ঞানকর্ম্ম হইতে ভক্তির আসন অনেক উচ্চে নির্দ্দেশ করিলেন এবং তাঁহারা একত্র কৃষ্ণপূজায়, কৃষ্ণকথায় ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবদ্বীপবাসী অপর সকলকে বিষয় ও বিলাস-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া, তাঁহাদের দুঃখের সীমা ছিল না। একে তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাহার উপর সকলেই অধর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের হিতকর উপদেশাবলি কেহই গ্রাহ্য করিত না। আচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কিছুতেই তাহাদের মুক্তির উপায় স্থির করিতে পারিলেন না অবশেষে গভীর চিন্তার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ না হইলে আর কিছুতেই সকলের নিস্তার নাই। আচার্য্য অদ্বৈত কৃষ্ণাবতরণ-অভিলাষে তুলসী ও গঙ্গাজলে কৃষ্ণপূজা করিতে বসিলেন। অশ্রুবারি দরদর ধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। ভক্তিগদ্‌গদ্‌স্বরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—"হে গোপীমোহন, রাধিকারঞ্জন তোমার বড় সাধের স্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য আজ পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহার মুক্তি সাধন করিতে পারিবে না। হে নবীন-নীরদবরণ, বঙ্কিমনয়ন! শ্যামকলেবরে সুশোভন পীতধড়া পরিয়া তোমার সেই মদনমোহনবেশে আর একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হও। হে ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। নচেৎ পৃথিবী রসাতলে যাইবে। কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে, নাথ, এস।" ভক্তের কাতর আহ্বান শ্রবণ করিয়া ব্রজেন্দ্রকুমার বৈকুণ্ঠে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মানবগৃহে অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রেমময়ি আরাধিকে রাধিকে! ধরাতলে আবার পুণ্যের হাহাকার ও পাপের অট্টহাস উঠিয়াছে। ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ জীবগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমাকে যাইতে হইবে। ভক্তগণ গলদশ্রুনয়নে কাতরকণ্ঠে আমাকে ডাকিতেছে। যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া যে নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম, ও করুণা মানবগণকে শিক্ষা দান

করিলাম, সে সকল তাহারা বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে। বসুন্ধরা আবার অশেষ দুঃখ ও পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মানবহৃদয় হইতে প্রেম ও ভক্তি দূর হইয়া গিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা প্রভৃতির জ্বলন্ত বহ্নিরাশি অনবরত তাহাদিগকে পরিদগ্ধ করিতেছে। আমি পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে অবতীর্ণ হইয়া ধরাতল প্রেম-অশ্রুনীরে প্লাবিত করিব। দ্বাপরে তোমাদিগকে নয়নাসারে ভাসাইয়াছি, এবার আমার নেত্রদ্বয় দিয়া প্রেম-গঙ্গা বহিয়া পড়িবে। এবার বৈরাগী সাজিব; রমণীর সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না। বাঁশীর পরিবর্ত্তে করে দণ্ড আর কমণ্ডলু লইয়া অসংখ্য জীবের দ্বারে দ্বারে নামামৃত বিতরণ করিয়া বেড়াইব। একাধারে যুগলমিলনবেশে ধরাতলে নিষ্কাম ব্রজ-প্রেমের অভিনয় করিব। কখন নন্দ-যশোদার ভাবে বিহ্বল হইয়া বাৎসল্য-প্রেমে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিব, কখন ব্রজের রাখালবেশে মধুর সখ্য ও দাস্য ভাবের অভিনয় করিব, কখনও বা বিরহক্লিষ্টা ব্রজাঙ্গনার ভাবে বিভোর হইয়া আপনার জন্য আপনিই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব। তোমার বিরহযন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব। এবার ভিতরে শ্যাম, বাহিরে গৌরমূর্ত্তি।” এই বলিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রেমময়ী রাধিকাকে নিজ বক্ষঃমধ্যে আলিঙ্গন করিলেন। যুগলদেহ একাঙ্গ হইল, গৌরহরির কি ভুবনমোহন রূপরাশি! প্রভু প্রেমামৃতপানে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। প্রেমাশ্রুধারা বক্ষঃস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। গোলকবাসী পরমানন্দে “হরি হরি” বলিয়া উঠিল। হরিনামধ্বনি ত্রিভুবন ধ্বনিত করিল।

ভগবান যথাকালে শচীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। ১৪০৬ শকে মাঘ মাসের শেষভাগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে শচীদেবী উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। দম্পতী অপত্যধনে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিতান্তঃকরণে বিষ্ণুর চরণ আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে শীঘ্রই তাঁহাদের শুভ্রকলেবর বলদেবের ন্যায় এক দিব্যকান্তি সুকুমার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; নবপ্রসূত সন্তান বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইবে বলিয়া তাহার নাম বিশ্বরূপ রাখা হইয়াছিল। পুত্র-

মুখদর্শনে দম্পতীর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহারা গোবিন্দের রাতুল চরণকমল ধ্যান করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তখন পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শচীদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। দেবীর শরীরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির সঞ্চার হইল। তিনি একদিন সুনীল অম্বরদেশে দৃষ্টি করিয়া আছেন,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজল অভ্রনিচয় বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি তখন তন্ময়চিত্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল যেন গগনমণ্ডলে এক দিব্যমূর্ত্তি লোক আসিয়া স্তুতিগান করিতেছে। জগন্নাথ মিশ্র একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন,—এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহার হৃদয় হইতে শচীদেবীর হৃদয়ে গমন করিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এবার নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। হৃষ্টচিত্তে কায়মনোবাক্যে তাঁহার শালগ্রামের পূজা করিতে লাগিলেন। গর্ভ ক্রমশঃ ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হইল। তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া জগন্নাথের মনে ভীতির সঞ্চার হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া বলিলেন যে, এই মাসেই শুভলগ্নে এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অনন্তবিস্তৃত সুনীলাম্বরে দু'একটি সন্ধ্যাতারা বৃক্ষশাখার অন্তরালে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। মলয় পবন সদ্যঃপ্রস্ফুট কুসুমনিচয়ের সৌরভ বহন করিয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। নগরবাসীরা এখনও আবিরকুঙ্কুম লইয়া ক্রীড়ারত। দোলযাত্রা-উপলক্ষে সকলেই হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতেছে। তাহার উপর সেদিন আবার চন্দ্রগ্রহণ। সন্ধ্যাকালে নগরবাসীরা স্নানাভিলাষে পুণ্যসলিলা জাহ্নবীতীরে সমবেত হইয়াছে। নদী-সৈকত ও সলিলরাশি আবিরকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। পতিতপাবনী ভাগীরথীর সলিলে অবগাহন করিয়া পাপরাশি ধৌত করিবার জন্য তাহারা শুভলগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নদীতীরে মহামেলা বসিয়া গিয়াছে। সজ্জিত বিপণিসমূহে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। বৈষ্ণবগণ প্রাণ ভরিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। আনন্দ ও ভক্তির স্রোতে আজ নবদ্বীপ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত আচার্য্য প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া

কেবল হরিনাম গায়িতেছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ ও আসন্নাপ্রসবা শচী-দেবীও পবিত্রান্তঃকরণে শ্রীহরির চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। যথাকালে শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। শচীদেবী এক অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র প্রসব করিলেন। কলঙ্কময় চন্দ্রের আর কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। নবদ্বীপে হরিনামের বন্যা আসিয়া পড়িল। দশদিক হর্ষে হাসিয়া উঠিল। স্থাবর জঙ্গম আনন্দে বিহ্বল হইল। ভাগীরথীর পুণ্যসলিল-রাশি প্রসন্নমনে হরিনাম গায়িতে গায়িতে কুলুকুলু তানে সাগরপানে বহিয়া চলিল। কৃষ্ণনাম ও হরিধ্বনিতে ত্রিভুবন মুখরিত হইয়া উঠিল। নবজাত শিশুও যে ভূমিষ্ঠ হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্নানশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকার যৌতুক লইয়া সদ্যঃজাত শিশুকে দেখিতে আসিলেন। শিশুর মস্তকে ধানদূর্ব্বা দিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দিব্যগৌরবর্ণ দেহ দেখিয়া সকলেরই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গেল। অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী জগৎপূজ্যা সীতাঠাকুরাণী, শ্রীবাস পণ্ডিতের ব্রাহ্মণী মালিনী প্রভৃতি কুললক্ষ্মীগণ সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, ধান্য দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, চন্দন, দধি, বস্ত্র, নারিকেল প্রভৃতি উপকরণে নৈবেদ্য সাজাইয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া গোপনে জগন্নাথ মিশ্রকে বলিলেন যে, এই শিশুর সর্ব্বাঙ্গে সুলক্ষণময় মহাপুরুষের চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হৃষ্টচিত্ত জগন্নাথ মুক্তহস্তে সকলকে নানাবিধ যৌতুক দান করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভারত ও মিশর।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী সপ্তসাগরবেষ্টিত সপ্তদ্বীপে বিভক্ত। প্রাচীন মিশরীয়গণ ও গ্রীকগণও এইরূপ বিভাগের বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ের প্রমাণের জন্য অতি বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ বিভাগ মিশরীয়গণ অবগত ছিলেন।

এ বিষয়ে নানা পুস্তকাদি পড়িয়া আমাদের যাহা ধারণা হইয়াছে, সময় এবং সুবিধা হইলে তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে। তবে, এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আফ্রিকাকে হিন্দুগণ শঙ্খদ্বীপ বলিতেন। তখন, মিশর প্রভৃতি আফ্রিকার শুধু উত্তর ভাগের বিষয়ই হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। এখনও উহার বহুস্থানের নাম সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতটের এক সুবিস্তীর্ণ অংশ অদ্যাপি লেঙ্ঘ, অথবা লেঙ্ঘিটান নামে খ্যাত। এই লেঙ্ঘ এবং লেঙ্ঘিটান বোধ হয় শঙ্খ এবং শঙ্খস্থান শব্দের রূপান্তর। লোহিত-সাগরের পশ্চিমতটবাসী অর্থাৎ উত্তরমিশর এবং Aethiopiaর সমুদ্রতটবাসী অসভ্যজাতিসমূহ (যাহাদিগকে গ্রীকগণ Trogolodytes বলিতেন) অদ্যাপি Shangalas বলিয়া খ্যাত। এই Shangalas শব্দ সংস্কৃত শঙ্খ অথবা শঙ্খায়ন হইতে উৎপন্ন; এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ভৌগোলিক পণ্ডিত Strabo খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন ভ্রমণোদ্দেশ্যে মিশরে গিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য Shangalas নামক অসভ্য জাতিসমূহ শঙ্খনির্ম্মিত কণ্ঠভূষণ ব্যবহার করিত। হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলে Trogolodytes অথবা Shangalasগণকে Sukim আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহারা Suka অথবা গুহায় বাস করিত। Suka এই ও শঙ্খ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শঙ্খাসুর এবং শঙ্খদ্বীপের অধিবাসিগণ শঙ্খমধ্যে বাস করিত। বোধ হয় শঙ্খের ন্যায় গুহায় বাস করিত বলিয়াই তাহাদিগকে এইরূপ বলা হইয়াছে। পুরাণে শঙ্খমুখ নাগের বর্ণনা আছে। সে ইচ্ছানুসারে সর্প এবং

আফ্রিকা এবং শঙ্খদ্বীপ।

শঙ্খায়ন জাতি এবং Shangolas.

শঙ্খাসুর এবং এবং শঙ্খদ্বীপের অধিবাসিগণ শঙ্খমধ্যে বাস করিত।

মনুষ্য এই উভয়বিধ আকার ধারণ করিতে পারিত। সে শঙ্খদ্বীপে শঙ্খমধ্যে বাস করিত। কথিত আছে যে, তাহার নিশ্বাসের সঙ্গে এমন বিষাক্ত উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইত যে, তাহার বাসস্থানের শতযোজনের মধ্যে কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী জীবন-ধারণ করিতে পারিত না। শঙ্খমুখ নাগ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়, কিন্তু তাহার সন্তানগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছে এবং তাহাদের নিঃশ্বাসও পুর্ব্বোক্ত প্রকার বিষাক্ত। Captain Wilford অনুমান করেন যে, সাহারা মরুভূমিস্থ Hubub পর্ব্বত হইতে যে অত্যুষ্ণ বায়ু সমগ্র মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, হিন্দুগণের পুরাণে গল্পাকারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অথবা তখন হয়ত উক্ত বায়ুর ঐরূপ ব্যাখ্যাই প্রচলিত ছিল। মিশরেও তখন Heredi নামক এক সর্পের ঐরূপ গল্প প্রচলিত ছিল।

শঙ্খমুখনাগের উত্তপ্ত ও বিষাক্ত নিশ্বাস এবং Hubub পর্ব্বতের উত্তপ্ত এবং বিষাক্ত বায়ু।

শঙ্খমুখনাগ এবং Heredi.

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুগণের মিশর প্রভৃতি দেশে গতিবিধি ছিল। মিশরের নৃপতি প্রথম টলেমি (Ptolemy I)বীর, সুলেখক এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। Alexanderএর দিগ্বিজয়ের সময় তিনি তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। Alexandria নগরীর ভুবনবিখ্যাত পুস্তকাগার এবং museum তিনিই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সভায় Demetrius, Euclid, Diodorus প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। এই প্রথম টলেমি (Ptolemy I) তাঁহার গ্রন্থাদিতে হিন্দুদিগের নিকট বহুবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, Alexandria নগরীতে তিনি বহু ভারতীয় হিন্দু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

মিশর নৃপতি Ptolemy.

Ptolemyর সময়ে হিন্দুগণের মিশরে গতিবিধি ছিল।

Mercus Aureliusএর সমসাময়িক সিরিয়া দেশের বিখ্যাত দার্শনিক

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দুগণ সিরিয়াদেশে এবং শঙ্খদ্বীপে তীর্থ করিতে যাইতেন।

পণ্ডিত Lucian খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতীয় তীর্থযাত্রী হিন্দুগণ সিরিয়ার অন্তর্গত Bambyke নামক স্থানে Mabog দেবী (পুরাণে ইনি মহাভাগা দেবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন) দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুগণ তখন মধ্যে মধ্যে কুশদ্বীপে (শঙ্খদ্বীপে) Napatha নামক স্থানে জ্বালামুখী প্রস্রবণদ্বয় দর্শন করিতে আসিতেন। উহাও হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান ছিল এবং উহার প্রথমটীতে Tigris নদীর সন্নিকটে অনায়াসা আখ্যাযুক্তা মহাভাগা দেবীর মন্দির ছিল। বিখ্যাত গ্রীক ভৌগোলিক পণ্ডিত Straboও তাঁহার গ্রন্থে ঠিক ঐস্থানে অবস্থিত Anaias দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অনায়াসা এবং Anaias একই দেবী।

Baltic সমুদ্রে হিন্দু।

বাগ্মী Ciceroর সমসাময়িক ঐতিহাসিক Cornelius Nepos তাঁহার গ্রন্থে কতিপয় Indi (হিন্দু)র উল্লেখ করিয়াছেন। Baltic সমুদ্রে তাঁহাদের নৌকাডুবি হওয়াতে তাঁহারা কয়েকজন সমুদ্রতটে উঠিয়া জীবন রক্ষা করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে. প্রাচীন হিন্দুগণের মিশর কেন এমন কি Baltic সমুদ্রেও গতিবিধি ছিল।

এই সমস্ত ব্যাপার হইতে বোধ হয় নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট ইউরোপের বহু স্থান, মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশও সুপরিচিত ছিল। প্রাচীনগণ তখন আফ্রিকা বলিলে কেবল আফ্রিকার উত্তরাংশই বুঝিতেন এবং আফ্রিকাতে ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতি-সমূহের রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের নামই আফ্রিকা হইল।

সংস্কৃত 'আপরিক' শব্দ হইতে আফ্রিকার উৎপত্তি।

সংস্কৃত 'পর' শব্দ কখনও কখনও পূর্ব্বদিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—যথা, পর-গণ্ডিকা। অতএব, 'অপর' শব্দের অর্থ পশ্চিম। উত্তর ভারতে অপ্রচলিত হইলেও সিংহলে সংস্কৃত ভাষায় 'অপরিক' শব্দে পশ্চিম বুঝায়। Captain Wilford অনুমান করেন যে, এই 'অপর' অথবা 'অপরিক' হইতে আফ্রিকা নামের উৎপত্তি, কারণ আফ্রিকা ভারতের

পশ্চিমদিকে অবস্থিত। হিব্রু বাইবেলে Ophir অথবা Auphir অর্থ পশ্চিম। Bishop Lowth বলেন যে, এই Ophir অথবা Auphir হইতেই আফ্রিকা শব্দের উৎপত্তি। গ্রীক Ibericus অথবা Iberica, ল্যাটিন Apricus শব্দও আফ্রিকা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অপর অথবা অপরিক, Ophir অথবা Auphir, Ibericus অথবা Iberica, Apricus অথবা Africa যে একই শব্দের বিভিন্ন রূপমাত্র, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এবং বেদে বহুস্থানে নাইল নদীর উল্লেখ আছে।

নাইল নদীর আখ্যাসমূহ।

হিন্দুশাস্ত্রাদিতে নাইল নদীর নীলা, কালী, অসিতা শ্যামলা, অঞ্জনাভা, কৃষ্ণা, নহুষি (পুরাণোক্ত দেব-নহুষ হইতে Captain Wilfordএর মতে দেবনহুষ এবং গ্রীক Dionysus একই ব্যক্তি), ঐটী (মহাদেবের পুরাণোক্ত অবতার ইত অথবা ঐত হইতে) অগুপ্তা, ত্রিতনু প্রভৃতি বহু আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। হিব্রু, গ্রীক এবং রোমানগণও নাইল নদীর Nous অথবা Nus, Aetos, Aegyptos Triton, Nile প্রভৃতি বহু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই Nous অথবা Nus এবং নহুষি, Aetos এবং ঐতী Aegyptos এবং অগুপ্তা, Triton এবং ত্রিতনু, Nile এবং নীলা যে একই নদীর বিভিন্ন নাম মাত্র এবং হিব্রু, গ্রীক ও রোমানগণ যে ঐ সকল নাম সংস্কৃত নাম হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহাকালী রাজরাজেশ্বরীরূপ ধারণ করিয়া কালীনদীর তীরে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণা হন। তদবধি ঐ নদীর নাম কালী হইয়াছে। নীলা (Nile of Ethiopia), নন্দা (Nile of Abyssinia), এবং অস্থিমতী অথবা ক্ষুদ্রকায়া কৃষ্ণা Tacazze or liltle Abay), এই নদীত্রয় একত্র নীলা অথবা কালীনামে প্রসিদ্ধ ছিল।

নাইল এবং নন্দার সঙ্গমস্থল হিন্দুর তীর্থস্থান।

কৃষ্ণা (নীলা) এবং নন্দা নদীর সঙ্গমস্থল অথর্ব্ববেদে অতি পবিত্রস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ঃ—

"ভদ্রা ভগবতী কৃষ্ণা গ্রহনক্ষত্র মালিনী,
সর্ব্বেশনিশঙ্গমনি বিশ্বস্য জগতো নিশা;
অগ্নিচৌরনিপাতেষু সর্ব্বগ্রহনিবারণে,
দক্ষা ভগবতী দেবী নন্দয়া যন সঙ্গতাঃ
সর্ব্বপাপ প্রশমানি ভদ্রে পারমসি মহী,
সীতা শীতসমাযোগাৎ পরং যান নিবর্ত্ততে।"

—অথর্ব্ববেদ।

নাইলনদীর উৎপত্তি স্থান।

নীলা অথবা নাইল নদীর উৎপত্তিস্থানের নাম হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শর্ম্মস্থান। এতৎসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, শর্ম্ম-স্থান সোমগিরির অন্তর্ব্বর্ত্তী অজাগর এবং শীতান্ত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী দেব-সরোবর হইতে নীলা অথবা কালীনদীর উৎপত্তি। আফ্রিকার অধি-বাসিগণ এই দেবসরোবরকে অদ্যাপি Deœ Lunœ বলে। দেব এবং Deœ একই শব্দ; এবং Lunœ শব্দের অর্থ হ্রদ অথবা সরোবর। হিন্দুগণ বোধ হয় আধুনিক Lupata Rangeকে অজাগর এবং Zambre হ্রদের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতাবলীকে শীতান্ত বলিতেন। সোমগিরি প্রাচীন এবং আধুনিক ভূগোলবিদ্গণের নিকট সুপরিচিত। Strabo, Juba, Ptolemy প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের গ্রন্থে এই পর্ব্বতশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন আফ্রিকার ঐ স্থানের পর্ব্বতমালার সাধারণ নাম হিন্দুগণ সোমগিরি দিয়া-ছেন। মিশরীয় গ্রীক, রোমান, হিন্দু প্রভৃতি সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, ঐস্থান চন্দ্র (সোম) দেবের বিশেষ প্রিয়। অদ্যাপি সেই স্থানের বহু হ্রদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির যে নাম প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই চন্দ্র-সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। Nusaptis সংস্কৃত নিশাপতি (চন্দ্র) শব্দ হইতে উৎপন্ন। কাহারও কাহারও মতে এই Nusaptis হ্রদ হইতেই নীল নদীর উৎপত্তি। সোমগিরি এবং দেবসরোবরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ-সমূহ পুরাণে চন্দ্রিস্থান বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,

সোমগিরি।

যে, ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রদেব স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার নাম চন্দ্রী হয়। লজ্জায় তিনি শঙ্খ-

চন্দ্রিস্থান।

দ্বীপান্তর্গত দেবসরোবরের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতসমূহে গুপ্তভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে সূর্য্যদেবের ঔরসে তাঁহার বহুসংখ্যক সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। সেই সন্তানগণ পুলিন্দ নামে খ্যাত হয়. এবং তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিত না। তদ্দেশীয় নৃপতিহীন, ভ্রমণশীল, অসভ্য Pulinda জাতি সেই পুলিন্দগণের বংশধর।

পুলিন্দজাতি।

স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, যে নীলা (কালী) নদী শর্ম্মস্থানের অন্তর্গত সোমগিরির নিকটবর্ত্তী অজাগর এবং শীতান্ত পর্ব্বতমধ্যস্থ দেবসরোবর অথবা নিশাপতি হ্রদ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া মহাহাস্তশীল জাতির আবাসস্থলের সন্নিকটস্থ পদ্মবন নামক হ্রদে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করে। পরে দেবতাগণের আবাসস্থান কালীতটের মধ্য দিয়া বর্ব্বরদেশ, শঙ্খদ্বীপস্থ হেমকূট পর্ব্বত, তপঃ অরণ্য, কণ্টকদেশ অথবা মিশ্রস্থান এবং পরে এক নিবিড় অটবীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শঙ্খাব্ধিতে মিশিয়াছে। পুষ্পবর্ষ নামক স্থানে নীলা নদী এবং নন্দা নদী মিলিত হইয়াছে; এবং তাহার কিঞ্চিৎ পর ক্ষুদ্রকায়া অস্থিমতী অথবা কৃষ্ণা এবং শঙ্খনাগা নীলাতে পড়িয়াছে। এই সঙ্গমস্থানসমূহ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ। পুলিন্দ, শার্ম্মিক, পল্লী, শঙ্খায়ন, কুটিলকেশ. শ্যামমুখ দানব, যবন প্রভৃতি জাতি নীলা (কালী) তীরস্থ দেশসমূহে বাস করিত, পুরাণাদিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। (ক্রমশঃ)

নাইল নদীর পুরাণ-বর্ণিত Course.

নাইলতটবাসী জাতিসমূহ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর।

গণিতাচার্য্য গৌরীশঙ্কর ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালী আজি যে প্রীতি-পরায়ণ, কর্ত্তব্য-শরণ আদর্শ অধ্যাপক হারাইল, তাহার তুলনা নাই। তিনি আধুনিক গণিত-অধ্যাপকগণের শিরোমণি ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, সে ক্ষতি শীঘ্র পূরণ হইবে এমন আশা নাই।

তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে মানুষ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবন—সাধনার এক উজ্জ্বল উদাহরণ! বিলাসকে তিনি চিরজীবনই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পরিশ্রম তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর 'জেনারেল এসেম্‌ব্লি'র কলেজে অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হন এবং সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাতচল্লিশ বৎসরকাল তিনি একভাবে ঐ একই কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। কোন প্রকারের অনুরোধ-উপরোধ বা প্রলোভন তাঁহাকে ঐ কলেজ হইতে সরাইতে সমর্থ হয় নাই। পাটনা কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহাকে অধ্যাপক করিবার জন্য কয়েকবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অভাবে 'জেনারেল এসেম্‌ব্লি'র ক্ষতি হইবে,—এই আশঙ্কায় তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যশলোভ বা অর্থলোভ তাঁহাকে কোন কালে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। একবার স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহাকে সিটি কলেজে অধ্যাপক করিবার জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধের উত্তরে গৌরীশঙ্কর বলিয়াছেন যে, "এ চাকরী লইলে আমার লাভ বটে, কিন্তু 'জেনারেল এসেম্‌ব্লি'র এই দুঃসময়ে কেমন করিয়া এ কলেজ ছাড়িয়া যাই?" গৌরীশঙ্করের হৃদয়ের এই মহত্ত্ব-দর্শনে আনন্দমোহন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"গৌরীবাবু! আপনার মত লোককে আমাদের কলেজে পাইলাম না বলিয়া আমাদের দুঃখ বটে, কিন্তু আপনার

হৃদয়ের মহত্ত্ব আজ আমাকে যে সুখ দিয়াছে তাহার কাছে দুঃখ সামান্য।” বাস্তবিকই এমন হৃদয়বত্তা, এমন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালী-জীবনে সুদুর্লভ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক-পদে ব্রতী হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা অসংখ্য। তিনপুরুষে তাঁহার কাছে পড়িতে দেখিয়াছি। কবিবর নবীনচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সাহিত্যরথী বিহারিলাল, অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্য্য ও কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কাছে একদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তিনি আউলিয়া দলভুক্ত ছিলেন। প্রত্যহ রাত্রিতে ছাতাটি বগলে করিয় তিনি সাধন-আগারে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। ঝড় বৃষ্টি বা অন্য কোন প্রতিবন্ধক তাঁহাকে এ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। তাঁহার মত ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ভক্তিপরায়ণ হিন্দু শিক্ষিত সমাজে একান্ত বিরল। গীতা তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবন-যাত্রার প্রণালী ও সেই জীবনের পরিণাম বাঙ্গালীর আদর্শ হইবার যোগ্য। তাঁহার চরিত্র হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তাঁহার সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়।

দীর্ঘজীবন-লাভের রহস্য।

—০:*:০—

এডিসনের উক্তি।

অকাল মরণ আসিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলিকে একে একে হরণ করিয়া লইতেছে। বলিতে কি, ১৩১৯ সালের ইতিহাসকে একরূপ অকাল মরণের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুখারাম ও অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ, প্রসিদ্ধ ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ ও কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ,—ইঁহাদের সকলেরই মৃত্যু অকালে ঘটিয়াছে। সুতরাং এ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এডিসন দীর্ঘজীবনলাভ-সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠক বর্গের নিকট উপস্থাপিত করিলে মন্দ হইবে না।

এডিসন সাহেবের বয়স এখন ৬৭ বৎসর। কিন্তু এ বয়সেও তিনি যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম। সম্প্রতি ফনোগ্রাফের উন্নতিসাধন জন্য তিনি ৪০ দিন একাদিক্রমে খাটিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রত্যহ ২২ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন এবং দুই ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইতেন। কারখানাতেই খাওয়া-দাওয়া করিতেন, কারখানার বেঞ্চে অথবা মেজেতেই শুইয়া পড়িতেন। শুইবামাত্রই তাঁহার ঘুম আসিত। কোন দিন তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। বরং তাঁহাকে প্রফুল্লই দেখা যাইত।

এডিসন সাহেবের কোন যুবা সহকারী একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি এই বয়সে এই পর পর ৪০ দিন কেমন করিয়া প্রত্যহ ২২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলেন?" এডিসন বলিলেন,—"তবে শুন। আমি ছেলে-বেলায় খবরের কাগজ বিক্রয় করিতাম। প্রত্যহ ভোর ৪টার সময় আমাকে বিছানা হইতে উঠিতে হইত। সারাদিন ও সন্ধ্যার অধিকাংশ সময় আমি কাগজ বিক্রয় করিতাম—একদণ্ড বিশ্রাম ছিল না। তারপর অনেক রাত্রি জাগিয়া আমি নূতন জিনিষ উদ্ভাবনের জন্য নানারূপ পরীক্ষা করিতাম। তখন হইতে কেবল তড়িৎ-বিষয়ক পরীক্ষা করিতেই আমি মনোযোগ দিতাম। এইরূপ অধিক রাত্রিজাগরণের জন্য আমার পিতা-মাতা কখনই আমাকে কোন কথা বলেন নাই। রাত্রি ১২টার আগে কোন দিনই আমার ভাগ্যে নিদ্রালাভ ঘটিত না। অথচ আমার শরীরে কখনও কোন অসুখ বা অস্বচ্ছন্দতা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহাও বলিতেছি। ভিনিস নগরের লুই কর্ণারো নামক এক ব্যক্তি অল্পাহার করিয়া প্রায় শতবর্ষাধিক জীবিত ছিলেন। আমার পিতামহ এই প্রসিদ্ধ ভিনিসীয় দীর্ঘজীবী ব্যক্তির ন্যায় অল্পাহার করিয়া ১০৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমার পিতামহের একরূপ ইচ্ছামৃত্যু ঘটিয়াছিল। কোন রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি অরোগ ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেহ-যন্ত্র বিকল হইয়া আসিতেছে, কোষসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণ আর দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না। পিতামহ এই সকল বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যু নিকট; আমার কন্যার বাটীতে যাইতেছি, তথায় যাইয়াই মরিব।" পিতামহের কথা ফলিল। তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু হইল। আমার

পিতার মৃত্যুও ঠিক এমনই ভাবে ঘটিয়াছিল, তিনিও পিতামহেরই মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ ও পিতৃদেবের এই ধারণা অতি শৈশব হইতেই আমার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং আমিও তাঁহাদেরই মত অল্পাহার করিতাম। ক্ষুধা থাকিলেও তাঁহারা আমাকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। প্রথম প্রথম হইতে খুব কষ্ট হইয়াছিল কি না তাহা মনে নাই, তবে শীঘ্রই এইরূপ অল্পাহার আমার অভ্যাস হইয়া পড়িল। আমার উদর এখন কোটরগত; কারণ আমি ইহাকে কোনদিন তুষ্ট করি নাই। এখন আহারে আমার তৃপ্তি নাই। খাওয়া হউক আর নাই হউক আমার সেদিকে লক্ষ্য নাই। বাঁচিব বলিয়াই আমি আহার করি—উদর-পূরণের জন্য নহে। বাঁচিবার জন্য যেটুকু দরকার, আমি সেই পরিমাণই আহার করিয়া থাকি। এই অল্পাহারের ফলে আমার পাকস্থলী কোনদিন অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যের ভারে প্রপীড়িত হইতে পারে না। প্রত্যহ অতিরিক্ত ভোজন করিলে পাকস্থলীর মধ্যে সেই প্রাত্যহিক ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ থাকিয়া যায়। উহা দেহের পক্ষে বিষের ন্যায় বিষম অনিষ্টকর। আমার এরূপ হয় না, কারণ আমি অল্পাহার করি। এইজন্য আমার শরীর সর্ব্বদা লঘু থাকে। মন সদাই প্রফুল্ল থাকে। শয়নমাত্রেই নিদ্রা হয়। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার পর অধিক ভোজ্যগ্রাহীদিগের দেহে ভার বোধ হয়, চোখের পাতা ভারী মনে হয় আমার সেইরূপ কোন কিছু কখনও হয় না। আমার স্বাস্থ্য এত ভাল যে, সামান্য নিদ্রাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষে বেশী ঘুমাইতে চায় কেন? ঘুমাইলে আরাম পাওয়া চায়; আর আরাম পাইলে মানুষ সে আরাম দ্বিগুণ লাভ করিতে যায়। অক্ষুন্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি কেন যে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা ঘুমাইবে, ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। আমার কথাগুলি আমার কল্পনার কথা নহে—আমি নিজের জীবনে এইগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফল প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।”

বৈজ্ঞানিকপ্রবর এডিসনের দীর্ঘজীবনলাভের কথা তাঁহারই কথায় আপনাদিগকে শুনাইলাম। এ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন; এবারে স্থানাভাব, আগামীবারে আমরা তাঁহার সে সকল কথা আমাদের পাঠক-পাঠিকাকে শুনাইব।

অর্ঘ্য,

তৃতীয় কল্প, ৮ম খণ্ড

ভারত ও মিশর।

—•:•:•—

এখন এই পুরাণবর্ণিত দেশ, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী প্রভৃতির সহিত প্রকৃত ব্যাপারের কতটা ঐক্য আছে, তাহা দেখা যাউক। দেবসরোবর এবং নিশাপতি হ্রদ যে Deœ Lunœ এবং Nusaptic তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত Diogenes এবং খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে Numindiaর নৃপতি Juba বলিয়া গিয়াছেন,

নাইল নদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে পৌরাণিক এবং পাশ্চাত্যমতের ঐক্য।

যে নাইল নদী সোমগিরির অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগর-সন্নিহিত হ্রদসমূহ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া প্রায় ২০ দিনের পথ (প্রায় ৩০০ মাইল) অদৃশ্য ভাবে মৃত্তিকাস্তরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া Massœsyli জাতির আবাসভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হয়। এই বর্ণনার সহিত নীলানদীর পুরাণ-বর্ণিত দ্বিতীয়বার জন্ম-পরিগ্রহের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে এবং পুরাণোক্ত মহাহাস্যশীল জাতি ও

মহাহাস্যশীল জাতি।

Massœsyli জাতি যে এক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। Diogenes ও Jubaর বর্ণনায় যে দ্বিতীয় হ্রদের উল্লেখ আছে তাহা এবং পুরাণবর্ণিত পদ্মবন, একই হ্রদ। পুরাণাদিতে বহু-

পদ্মবন ও পদ্মাদেবী

স্থানে লিখিত আছে যে, পদ্মাদেবী কালীনদীর তীরে কোটিপত্র পুষ্পের উপর বিরাজ করেন। এই কোটি-পত্র পুষ্প ভারতে জন্মে না। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Dr. Bruce বলেন যে, Ensete ও কোটিপত্র একই পুষ্প, এবং এই Ensete পুষ্প পদ্মবনে যথেষ্ট জন্মে। পদ্মবন নাম হইতেও ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন হিন্দুগণ এই Enseteকেই পদ্মজ্ঞানে হ্রদের নাম পদ্মবন রাখিয়াছিলেন।

Ethiopia, Nubia এবং Egyptকে প্রাচীন হিন্দুগণ কালীতট বলিতেন; কারণ এই তিন দেশই কালী (Nile) নদীর তটে। হিন্দুগণের মতে এই কালীতট দেবগণের আবাসস্থান ছিল; গ্রীকদেরও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, নাইল নদীর তীরে দেবগণ জন্মগ্রহণ করিতেন।

মিশর, দেবগণের বাসস্থান।

পুরাণ-বর্ণিত বর্ব্বর দেশ আধুনিক Barbara, তপঃ অরণ্য Thebais, শঙ্খাব্ধি Mediterranean Sea, অস্থিমতী অথবা ক্ষুদ্রকায়া কৃষ্ণানদী Tacazze অথবা ক্ষুদ্রকায়া Abay, শঙ্খনাগা নদী Mareb। নীলা নদীর তটবাসী যে পুরাণোক্ত জাতিসমূহের পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পুলিন্দ জাতি—Pulindas, শার্ম্মিকজাতি—Sharmicas, পল্লীজাতি—Pallis, শঙ্খায়ন জাতি—Shanghalas অথবা গ্রীকবর্ণিত—Troglodytes এবং কুটিলকেশ জাতি—Gaituli অথবা Gaityli নামে খ্যাত।

পুরাণোক্ত স্থান, নদী প্রভৃতির স্থাননির্দ্দেশ।

পুরাণোক্ত জাতিসমূহের **Identification.**

সহস্র সহস্র বৎসর পরে এখন শর্ম্মস্থানের সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; তবে Ethiopia এবং Abyssinia ও Azanএর কতক অংশ লইয়া যে ভূখণ্ড, তাহাই ঐ নামে খ্যাত ছিল। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, আদিপুরুষ সত্যব্রতের জয়াপতি, চর্ম্ম এবং শর্ম্ম নামধেয় তিন পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জয়াপতি পিতার বিশেষ প্রিয় পুত্র ছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি হিমালয়ের উত্তরস্থ সমস্ত রাজ্য এবং শর্ম্মকে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ প্রদান করেন। শর্ম্ম পিতাকে উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপে ভ্রাতৃদ্বয় দাসানুদাস হইয়া জীবন যাপন করেন। শর্ম্ম এবং তাঁহার সন্তানগণ বহুদিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নীলা অথবা কালীনদীর তীরে উপস্থিত হন। কালী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিতে পান যে, সেই দেশ তখন দৈত্য, দানব এবং অসভ্য-জাতিসমূহের আবাসভূমি। শর্ম্ম তখন তদ্দেশীয় অধিষ্ঠাত্রী পদ্মদেবীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মাদেবী

শর্ম্মস্থান।

ভারত হইতে শর্ম্ম এবং শার্ম্মিকগণের মিশরে আগমন।

তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হইয়া কালীতীরের যে স্থানে বসিয়া শর্ম্ম তপস্যা করিতেছিলেন, ঠিক সেইস্থানে দেবীর পূজার্থ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। শর্ম্মের সহচরগণ তদনুসারে সেইস্থানে দুই ক্রোশ দীর্ঘ, একক্রোশ প্রশস্ত এবং একক্রোশ উচ্চ এক পিরামিড (মন্দির) নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পদ্মাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নামানুসারে সেই পিরামিড পদ্মামন্দির অথবা পদ্মামঠ নামে খ্যাত হ[illegible] এই পিরামিড অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহার সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। শর্ম্ম এবং তাঁহার সন্তানগণ কালীতটে কিছুদিন বাস করেন। কিন্তু তথায় শনি (Saturn) এবং রাহুর (Typhon) রাজত্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া সোমগিরির অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবসরোবরের সন্নিকটস্থ দেশসমূহে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। শর্ম্মের নামানুসারে এইস্থান শর্ম্মস্থান নামে খ্যাত হয়। এই শর্ম্মস্থানে শর্ম্মের সন্তানগণ কালীনদীর সন্নিকট রূপবতী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত এই রূপবতী নগরীই শেষে প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট Rapta অথবা Raptu নামে পরিচিত হয়। Juba, Ptolemy প্রভৃতি এই Rapta অথবা Raptuকে Ethiopiaর প্রাচীন রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শার্ম্মিকগণের পিরামিড নির্ম্মাণ।

পদ্মামন্দির বা পদ্মামঠ।

শর্ম্মস্থানের প্রতিষ্ঠা।

Rapta অথবা Raptu নগরী প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মামন্দির অথবা পদ্মামঠে প্রতিষ্ঠিতা পদ্মাদেবী শার্ম্মিকদিগকে (শর্ম্মের বংশধরগণকে) যক্ষলিপি এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা দান করিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে। এই পদ্মামন্দির এবং মিশরের Byblos (আধুনিক Babel) নগর একই স্থান বলিয়া বোধ হয়। Babelএ পদ্মামন্দির অদ্যাপি Tower of Babel নামে খ্যাত। এই পদ্মামন্দির অথবা পদ্মামঠের (আধুনিক Babelএর) সন্নিকটে যে বৃহৎ নদী নাইলের সহিত মিলিত হইয়াছে, Ptolemy তাহাকে

শার্ম্মিকগণের মধ্যে যক্ষলিপির প্রচলন।

পদ্মামঠ এবং Tower of Babel.

Pathmeti এবং Julius Cæsarএর সমসাময়িক Sicily-নিবাসী বিখ্যাত ঐতিহাসিক Diodorus তাহাকে Pathmiআখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই Pathmeti এবং Pathmi যে পদ্মামঠ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা বলা বাহুল্য। পদ্মামঠ যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেই প্রদেশ অদ্যাপি Phthembuthi অথবা Phthemmuthi নামে খ্যাত আছে। এই আখ্যাদ্বয়ও পদ্মামঠের অপভ্রংশ, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মিশরের প্রাচীন নাম Potamitis এবং নাইল নদীর প্রাচীন নাম Potamos বোধ হয় পদ্মামঠ এবং পদ্মার রূপান্তরমাত্র।

পদ্মাদেবী এবং Isis। মিশরে যক্ষলিপি অথবা মিশরীয় বর্ণমালা প্রচার।

পদ্মাদেবী শার্ম্মিকগণকে যক্ষলিপি শিখাইয়াছিলেন, এরূপ পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বহুপ্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত Crinitus বলেন যে, পদ্মাসীনা Isis দেবী মিশরীয় অক্ষরের আবিষ্কর্ত্রী এবং তিনিই উহা সর্ব্বপ্রথমে মিশরদেশে প্রচলিত করেন। এই যক্ষলিপি এবং মিশরীয় লিপি যে একই বর্ণমালা এবং পদ্মাসীনা পদ্মাদেবী এবং পদ্মাসীনা Isis দেবী যে একই, তদ্বিষয়েও বোধ হয় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই সমস্ত ব্যাপার হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মিশরে সভ্যতা-উন্মেষের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে শার্ম্মিকগণ আফ্রিকাদেশে যাইয়া শর্ম্মস্থান নামক উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে রূপবতী (Rapti অথবা Raptu) নামক নগরী স্থাপন করেন। যে মিশরীয় পিরামিড পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহা সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শার্ম্মিকগণই নির্ম্মাণ করেন; এবং তাহা অদ্যাপি Tower of Babel নামে খ্যাত আছে। এতদ্ব্যতীত মিশরীয় বিদ্যার প্রথম উন্মেষ শার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃকই সাধিত হয়, কারণ পদ্মাদেবী (Isis) শার্ম্মিকগণকেই সর্ব্বপ্রথম যক্ষলিপি (Egyptian hieroglyphics) শিক্ষা দান করেন। বর্ণমালাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

শার্ম্মিকগণের কীর্ত্তিকলাপ।

এই শার্ম্মিকগণের পর ভারত ও পারস্য হইতে আরও কতিপয় জাতি মিশরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় পল্লীজাতির

ভারত হইতে মিশরে পল্লী-জাতির অভিযান।

নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। স্কন্দ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই পল্লীজাতির জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে শঙ্খদ্বীপে (আধুনিক আফ্রিকা) গমনের বর্ণনা আছে। কাশীধামের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত নরবিন্ধ্যা নদীর তীরে বিন্ধ্যাচলের সন্নিকটে পুরাকালে পল্লী অথবা পালী নামক এক জাতি বাস করিত। কৃষি এবং গোচারণই এই জাতির উপজীবিকা ছিল। উগ্রের পুত্র ঈর্ষু অথবা পিঙ্গাঙ্গ এই জাতির নৃপতি ছিলেন। ঈর্ষু অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন এবং ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি ছিলেন। তিনি কাশীযাত্রীদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা এবং অর্থসাহায্যাদি করিতেন। ঈর্ষুর ভ্রাতা তারাখ্য বিন্ধ্যন নামক পার্ব্বত্য জাতির নৃপতি ছিলেন। অধার্ম্মিক এবং দ্বেষপরায়ণ তারাখ্য ভ্রাতা ঈর্ষুর সদাশয়তায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। হতবীর্য্য ঈর্ষু তাঁহার পল্লীজাতির অনুচরগণসহ স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া মহাদেবের সাহায্যে শঙ্খদ্বীপস্থ কালীনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় শার্ম্মিকগণের সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথায় লোহিতবর্ণ মন্দার-পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে তাঁহারা পুণ্যবতী অথবা পুণ্যনগরী নামক মন্দির এবং নগরী স্থাপন করেন। উহা প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট মহাতীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। গ্রীকগণ যে দেশকে Merœ অথবা Merhoe বলিতেন, তাহা অনতিউচ্চ Mandara পর্ব্বতাবলীর মধ্যে অবস্থিত। Jesuitএর মানচিত্রে Merhœ নামক প্রদেশের মধ্যস্থলে Mandara নামক এক পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Mr. Bruce বলেন, যে Merhoe নামকস্থানে লোহিত-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত Madnara নামক পর্ব্বতাবলী অবস্থিত। তিনি বলেন, পুরাকালে এই স্থানে এক পশুপালক জাতি বাস করিত; সেই জাতি এবং তাহাদের নৃপতি Palli নামে খ্যাত ছিল।

পল্লীজাতির বিবরণ ও তাঁহাদের স্বদেশত্যাগ।

মন্দার পর্ব্বতে পল্লীগণের পুণ্যনগরীর প্রতিষ্ঠা।

Merhœ.

পুরাণোক্ত লোহিতবর্ণ মন্দার পর্ব্বত, পল্লীজাতি এবং পুণ্যবতী অথবা পুণ্যনগরী যথাক্রমে Mr. Bruce-বর্ণিত লোহিত-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত Mandera

পুণ্যনগরী এবং Merhoe.

hills, Palli জাতি এবং Meroe অথবা Merhoe প্রদেশ এইরূপ অনুমিত হয়। পুণ্যবতী অথবা পুণ্য-নগরীতে বহু বিদ্বান জনের বাস ছিল, এবং উহা তৎসময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে। সংস্কৃত 'মেই' শব্দের অর্থ 'বিদ্যার্থিনাম্ গৃহম্'। কালক্রমে রূপবতী অথবা রূপনগরী নাম লুপ্ত হইয়া ঐ নগরীর নাম মেই হইয়াছিল এবং গ্রীকগণের Meroe অথবা Merhoe ঐ মেই শব্দের অপভ্রংশ, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে।

পল্লীজাতির নৃপতি বলিয়া ঈর্ষুর নামও পল্লী হইয়াছিল; লুব্ধক নামে তাঁহার কোনও উত্তর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই লুব্ধকের পুত্র লিনাসু এবং লিনাসুর পুত্র মহাসুর অথবা যদুপ। লিনাসুর স্ত্রীর নাম যোগভ্রষ্ট অথবা যোগকষ্টা। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহাসুর অথবা যদুপ অজ্ঞাতে তাঁহার মাতা যোগভ্রষ্টা অথবা যোগকষ্টার সহিত সঙ্গত হন। যখন তিনি তাঁহার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন, তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় যদুপ প্রাণত্যাগ করেন। মিশর এবং গ্রীসেও ঠিক ইহার অনুরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সুতরাং সেই উপাখ্যান-সংশ্লিষ্ট Labadeus—লুব্ধক, Lains,—লিনাসু, Jocasta—যোগকষ্টা এবং Œdipus—যদুপ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

Labadeus.Lains,Jocusta, Œdpus যথাক্রমে লুব্ধক, লিনাসু, যোগকষ্টা এবং যদুপ।

পল্লীগণ যখন ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে চতুর্ব্বেদ লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, এইরূপ স্কন্দ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে। সুতরাং ইহা হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে মিশরে বেদ নীত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মিশরীয়গণের ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ (Books of Harmonia or Hermes) চতুর্ভাগে বিভক্ত ছিল। মিশরীয়-গণের বিশ্বাস যে, পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই আদিগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণেরও বিশ্বাস, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা বেদ রচনা করিয়াছিলেন। মিশরীয়গণের Books of Harmonia or Hermes এখন লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং

মিশরে বেদ।

বেদ এবং Books of Hermes

বেদের সহিত উহার বিষয়গত কোন সাদৃশ্য ছিল কি না, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন।

উল্লিখিত পল্লীজাতি এখনও ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন আখ্যাযুক্ত হইয়া বাস করিতেছে। রাজপুতানায় পালী অথবা ভীলজাতি, বারাণসী নগরীর উত্তরপূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতাবলী-নিবাসী কিরাত জাতি, এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ-নিবাসী হরিতজাতি এই পল্লীগণেরই বংশধর। এই সকল জাতি এখন অনার্য্য এবং অসভ্য বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু পুরাকালে ইহাদের রাজ্য সিন্ধুনদ হইতে শ্যামদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, হিন্দুশাস্ত্রাদিতে তাহার বহু উল্লেখ এখনও পাওয়া যায়। আধুনিক রাজপুতানা পূর্ব্বে পল্লীস্থান নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু রাজপুতগণ ক্রমে পল্লী অথবা ভীলদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন, এবং রাজপুতগণের নামানুসারেই ঐ প্রদেশের নাম রাজপুতানা হইয়াছে। পুরাকালে পল্লীগণ অত্যন্ত সাহসী এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিল; তাহাদের মধ্যে শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল এবং তাহারাই শাস্ত্রোক্ত পৈশাচী ভাষার আবিষ্কার করিয়াছিল। পল্লীগণের আবাসস্থলসমূহকে অদ্যাপি পল্লী, পলিতা, অথবা ভীলতা বলে। ঈর্ষুর বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণস্থ ভারতীয় রাজ্যের রাজধানীর নাম শ্রীপল্লী ছিল। এই শ্রীপল্লীর উল্লেখ পুরাণাদিতে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ভোপাল যেখানে অবস্থিত, শ্রীপল্লী বোধ হয় সেইখানেই অবস্থিত ছিল। মিশরনৃপতি Ptolemy তাঁহার গ্রন্থে ঐ স্থানকে শ্রীপল্ল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঈর্ষু অথবা পল্লীনৃপতির সন্তান বলিয়া পুরাণাদিতে পল্লীজাতিকে কোনও কোনও স্থানে পল্লীপুত্র আখ্যাও প্রদান করা হইয়াছে। এই পল্লীপুত্র শব্দ হইতেই বোধ হয় গ্রীকগণ ঈর্ষুর রাজধানী শ্রীপল্লীকে Palibothra অথবা Palipotra বলিতেন। রোমান পণ্ডিত Pliny বলেন যে, ভারতীয় Palibothri জাতির রাজ্য সিন্ধু নদ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিশরের বহু প্রাচীন ইতিহাসে এক পশুপালক জাতি এবং তাহাদের নৃপতি Orusএর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পশুপালক জাতিই পল্লীজাতি, এবং Orus ঈর্ষু এইরূপ অনুমিত হয়।

ভারতে পল্লীজাতি।

ঈর্ষুর ভারতীয় রাজধানী শ্রীপল্লী।

প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Justin খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিয়াছেন, যে পল্লীজাতি ভারত হইতে মিশরে নাইলনদীর তীরে যাইয়া বাস করেন। ইহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া পারস্য, Palestine এবং আরবদেশে যাইয়া অবশেষে মিশরে গমন করেন। Assyrian Lake (আধুনিক Persian Gulf)এর নিকটবর্ত্তী, এবং Euphrates ও Tigris-তীরস্থ Palestine দেশে পল্লীজাতি বহুকাল বাস করেন। পল্লীস্থান শব্দ হইতেই Palestine নামের উৎপত্তি। তদ্দেশীয় Garizim পর্ব্বতের প্রাচীন নাম Palitan অথবা Peltan, এবং এই উভয় শব্দই পল্লীস্থান শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Diodorusএর মতে প্রাচীন Palestine-নিবাসী Panchean জাতি ভারতবর্ষ হইতে তথায় আগমন করে। এই Panchean জাতি এবং পল্লীজাতি বোধ হয় অভিন্ন। Palestineএর সন্নিকটস্থ দ্বীপ Creteএর নৃপতি সুবিখ্যাত Minos বোধ হয় পল্লীজাতীয় ছিলেন। পল্লীগণ অদ্যাপি কিরাত নামে ভারতে বাস করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কিরাত শব্দ হইতেই বোধ হয় Crete অথবা Curetis নামের উৎপত্তি। হিব্রু বাইবেলে Peleti জাতি Palestineএ বাস করিত, এবং তদ্দেশে Krita নামে একটী স্থান ছিল, এইরূপ লিখিত আছে। এই Peleti শব্দ পল্লী এবং Kerethi ও Krita শব্দদ্বয় কিরাত হইতে উৎপন্ন। Palestineএর অন্তর্গত Gaza নামক স্থানে Cretoeus নামে খ্যাত এক Jupiterএর বহু পুরাতন মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই Cretœusই পল্লীজাতির পুরাণ-বর্ণিত দেবতা কিরাতেশ্বর, এইরূপ অনুমিত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আদি গ্রীক ঐতিহাসিক Heredotus লিখিয়া গিয়াছেন যে, Philitus নামক কোন ভারতীয় পশুপালক জাতি বহুকাল Palestineএ বাস করিয়া, পরে তথা হইতে মিশর দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই জাতি নাইল নদীর তীরে পশু চরাইত এবং ইহারাই শেষে পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। Ptolemp Phyllitœ নামে পল্লীজাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে পশুপালক পল্লীজাতি মিশরে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বিখ্যাত ভ্রমণকারী Mr. Bruceএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

পল্লীজাতির মিশরগমনের পথ।

পল্লীজাতি ও Palestine.

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

নববর্ষে।

নবীন তপন দিল দরশন
পূর্ব্বগগন-ভালে,
সোণার কমল ফুটিয়াছে যেন
* নীল সরসীর-জলে।
ধরার বক্ষে ছড়ায়ে পড়িছে
স্বর্ণ কিরণ-ধারা,
সুপ্ত জগৎ নিমিষে জাগিল,—
কল-কল্লোলে ভরা।
শত শত পাখী গাহিয়া উঠিছে
নব-বন্দনা গান,
ঝঙ্কার তুলি' মানব-হৃদয়ে
আশার মোহন তান।
বিগত বরষে যে পেয়েছে শত
নিরাশার ঘোর ব্যথা,
নব বরষের ঊষা-সমাগমে
উঠিছে তুলিয়া মাথা।
আজি এ নবীন আশার সাগরে
ভাসিল তরণী মোর,
ওহে দয়াময়, রেখো দূরে যত
বিপদ-ঝঞ্ঝা ঘোর।
দাও হৃদে বল, করিতে সংগ্রাম
ভীষণ-উর্ম্মি-সনে,
তোমার আশিষে পাইব গো কূল
হেন আশা আছে মনে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

সৎ-সঙ্গ।

—•:*:•—

সে একজন পরম বৈষ্ণব; শ্রীহরি নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চরণ-পদ্ম ধ্যান করিয়া সে দিন অতিবাহিত করিত। পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যে সে মিশিত না; আপন মনে জপ, তপ, পূজা এই সব লইয়াই থাকিত।

বনের মধ্যে তাহার বাস। প্রাঙ্গণে তুলসী-মঞ্চ। নিকটস্থ গ্রামের নর-নারীগণ দয়া পরবশ হইয়া যাহা কিছু আহার্য্য-সামগ্রী দিত, সে তাহা ভগবানকে উৎসর্গ করিয়া নিজে কিছু প্রসাদ খাইত আর অবশিষ্ট দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করিত। ছোট ছোট ছেলেরা তাহার কাছে আসিত না, কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গ বড় ভালবাসিত। তাহার বিশ্বাস ছোট ছোট ছেলেরা এক একজন ভগবানের এক একটী অংশ। একদিন সে তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া উদ্বৃত্ত ফল, মূল ও বাতাসা প্রদান করিল। তাহার পর হইতে তাহারা প্রায়ই তাহার নিকট আসিত। ক্রমে তাহাদিগকে লইয়া সে একটী কীর্ত্তনের দল করিল। সে কীর্ত্তন করিতে করিতে কখনও বা উন্মত্তবৎ নৃত্য করিত, কখনও বা ভাবাবেশে নিস্পন্দভাবে থাকিত আর ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া গান গায়িত।

তাহার কুটীরখানি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ সংস্কারের কথা বলিলে সে বলিত, "শরীর যখন জীর্ণ হ'বে—ভেঙ্গে যখন পড়ে যাবে তখন কি কর্‌বে? এমন একটী জিনিস প্রাণপণ শক্তিতে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক যার বলে স্থির থাক্‌তে পার্‌বে।"

তার সেই ভাঙ্গা ঘরের মট্‌কা খঁ'য়ে বর্ষার জল অবিরল-ধারায় পড়্‌ত, শীতের শিশির গুঁড়ি গুঁড়ি হ'য়ে প'ড়ে ঘরের মেঝে ভিজিয়ে দিত, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যকিরণ ফাঁক দিয়ে এসে ঘরের ভিতর পড়্‌ত, শুক্ল পক্ষে চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঘরটী ভ'রে যেত আর কৃষ্ণপক্ষে বাহিরের অন্ধকাররাশি ঘরে ঢুকে জমাট বেঁধে থাক্‌ত। ঘরখানি এমনই জীর্ণ।

যে কেহ তাহার নিকট আসিত, সে তাহার আবেগভরা চক্ষু দুটী দেখিয়া, তাহার অমৃত-ময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইত আর "নাম-

গ্রহণ" করিত। এই রকমে এক, দুই, তিন করিয়া ক্রমে ক্রমে সে হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলিল।

সে অঞ্চলের জমিদারের ইহা সহ্য হইল না; তিনি বলিলেন, "যে বেটা জাত হারায় সেই বেটা বৈষ্ণব হয়। লোকটা পূর্ব্বে মুসলমান ছিল, এখন হিন্দু বৈষ্ণব হ'তে চায়। বেটাকে জব্দ করতে হ'বে!"

জমিদার বাবু জানিতেন না যে, বৈষ্ণবটীর অতীত জীবন কিরূপ রহস্য-পূর্ণ কিম্বা জানিলেও সেটা স্বীকার করিতে সম্মত নন।

যে গ্রামে জমিদারবাবুর বাস তাহার নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে এক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের যখন কাল হয়, তখন তাঁহার একটী ছয় মাসের ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণপত্নী ছয়মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু-টীর মায়া কাটাইয়া স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় আরোহণ করেন।

এক মুসলমান প্রতিবাসী ঐ ছেলেটীকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-সন্তান যবন-গৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালকের আর যাবনিক আচার-ব্যবহার ভাল লাগিত না; সে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিত। সে আশ্রয়দাতার নিকট হইতে পলাইয়া আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু এ যে নাগপাশ—ছিন্ন হইতে দেয় না।

যখন তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, সে কাতরকণ্ঠে "হে মধুসূদন! আমায় উদ্ধার কর" বলিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইত! তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে ব্রহ্মণ্যশক্তি এত দিন লুক্কায়িত ছিল, তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল! বালক অনেক কষ্টে যবন-গৃহ হইতে মুক্ত হইল।

এই বৈষ্ণবই সেই বালক,—মুসলমান নহে—ব্রাহ্মণ-সন্তান হিন্দু জমি-দারের হিন্দু প্রতিবাসী।

দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে; পাখীরা সব কুলায় ফিরিয়াছে। সাধু ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া বাহিরে বসিয়া আছে। তাহার গলায় তুলসীর মালা, আর গায়ে নামাবলী।

চঞ্চল-শিশুর মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি আকাশে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে; চাঁদের আলো কখন বা ম্লান হইতেছে, আবার কখন ফুটিয়া উঠিতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণব জপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, কলিযুগে যে দিনান্তেও একবার ভগবান শ্রীহরির নামামৃত পান করিবে, সে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে,—তাই সে যখন তখন জপ করিত।

এমন সময়ে এক রমণী কুটীর-প্রাঙ্গণে আসিল; সে তুলসীকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবের সম্মুখে বসিল। বৈষ্ণব আপনহারা হইয়া জপ করিতেছে। রমণী পরমাসুন্দরী; দেশভরা তাহার রূপের প্রশংসা,—সেই অহঙ্কারে মাটীতে তাহার পা পড়ে না। সে ভাবে এমনই ভাবেই বুঝি তাহার দিন যাইবে!

জমিদার বাবু অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। যে ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাকে জব্দ করিবে। হায়! মূর্খ! যে কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করে নাই, পরহিত-সাধন যাহার জীবনের সার ব্রত, তাহার প্রতি অত্যাচ্যার!

যুবতী তাহার স্বভাবসুলভ হাব-ভাব, ছলনা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সেই সকল দিয়া বৈষ্ণবকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সব বিফল হইল। বৈষ্ণব আপন মনে জপ করিতেছে। সে যে সুধা পান করিতেছে! তাহার হৃদয়-নির্ঝর হইতে যে সহস্র ধারায় ভক্তি-বারি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে! সে যে ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা।

সময় যাইতেছে দেখিয়া রমণী তাহার মনোভাব প্রকাশ করিল। বৈষ্ণব শুনিল—বলিল, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি যাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি, তাঁহার নাম আমি প্রত্যহ তিন লক্ষবার জপ করি। জপ শেষ হইলে তোমার কথা শুনিব।"

রমণী বসিয়া রহিল—মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এদিকে বৈষ্ণবের নাম-জপ আর শেষ হয় না। রজনী অতিবাহিত হইতে চলিল অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। পতিতা রমণী গাত্রোত্থান করিল; ভাবিল,—বৈষ্ণব তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। সে মনের দুঃখে প্রস্থান করিল।

পরদিন আবার সে আসিল। বৈষ্ণব পূর্ব্বদিনের ন্যায় জপে নিযুক্ত। রমণী বসিয়া আছে, কতক্ষণ বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নাই। বৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে "নাম-কীর্ত্তন" করিতে লাগিল। আজও রমণী হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সে দুই দিন আসিয়াছে সারারাত্রি ধরিয়া হরিধ্বনি শুনিয়াছে,—যে নামের প্রভাবে জলে শিলা ভাসে, বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য অমৃতে পরিণত হয় সেই নাম তাহার কর্ণ-কুহরে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

তৃতীয় দিনে সে পুনরায় আসিল, কিন্তু আজ যেন সে নূতন মানুষ। তাহার দেহে যে লাবণ্য নাই, ঘন কৃষ্ণ কেশদাম আলুলায়িত! সে বিলাস-বসন কোথায়? বৈষ্ণবের হৃদয় জয় করিবার জন্য এ নূতন ছলনা নয় ত?

সে ছুটিয়া আসিয়া বৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিল— "ঠাকুর আপনি মহাপুরুষ—আমি পতিতা, আমায় রক্ষা করুন।"

হরিভক্ত তাহার কথা যেন শুনিতে পাইল না,—যেমন আপন মনে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই রহিল।

"আমার কি উপায় হইবে? আমি অনেক পাপ করিয়াছি—বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। পাপের ঘনান্ধকারে আমি বর্দ্ধিতা, তাহাতে একটুও পুণ্যের আলোক নাই। আমি জমিদার বাবু কর্ত্তৃক এখানে প্রেরিতা হইয়াছিলাম, এই পাপ-জিহ্বায় পাপ-বাসনা ব্যক্ত করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন"—বলিয়া রমণী বৈষ্ণবের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"বৈষ্ণব বলিলেন, ভয় কি মা! নাম গ্রহণ কর। দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিগুণ গান কর; তাঁহার চরণে আপনাকে বিকাইয়া দাও। তোমার মুক্তি হইবে।"

তৎপরে তাহাকে নাম-সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণব কুটীর ত্যাগ করিল।

সৎ-সঙ্গের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! মরুভূমিতে পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হইল। পতিতা রমণী পাপের অন্ধকারময় আবর্ত্ত হইতে পুণ্যের সমুজ্জ্বল আলোকে নীত হইল।

রমণী তাহার বিষয় সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে দান করিয়া ভোগ-বিলাস চির-দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের পরিত্যক্ত কুটীরে বাস করিতে লাগিল; আর অহোরাত্র অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। বৈষ্ণবের ন্যায় সেও প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা নাম জপ করিত। শেষে সে আর সকল

লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া অবশেষে ভগবানের করুণা লাভ করিয়াছিল।

যাঁহার জীবনে এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল,—তাঁহার নাম হরিদাস। যবনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজও লোকে তাঁহাকে 'যবন হরিদাস' বলিয়া থাকে।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণ।

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বাণীর প্রবীণ সন্তান অক্ষয়চন্দ্র আমাদিগকে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, সেগুলি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া উহাদের আলোচনা করা, আবশ্যক। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণটি পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত—ভূমিকা, সাহিত্য, ভাষা স্বাস্থ্য ও সাহিত্য-সমালোচনা। এই পঞ্চ বিভাগেই তিনি যে সকল কথা শুনাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গত বর্ষের অভিভাষণে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে সেই কথাগুলিরই অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ অভিভাষণে নূতন কথা অতি অল্পই আছে। কিন্তু এই নূতনত্ব-বর্জ্জিত হইলেও ইহার এমন একটি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে ইহা অন্যান্য বর্ষের অভিভাষণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। গত কয় বর্ষের সম্মিলনে যে কয়জন বাণীপুত্র নেতৃত্বের পাঞ্চজন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুরের সহিত অক্ষয়-চন্দ্রের সুর মিলে নাই। তাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রটিকে এত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন নাই; তাঁহারা জাতীয় স্পন্দনটী যেরূপ ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সেরূপভাবে পারেন নাই। তাঁহাদের গানে যে সমপ্রাণতা, যে সমানুভূতি, যে একমন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, অক্ষয়চন্দ্রের বাষ্পবিগলিত সুরে সে সমপ্রাণতা, সে সমানুভূতি, সে একমন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। তাঁহার গানে বার্দ্ধক্য-সুলভ রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি জাতির প্রাণের সুরে সুর মিশাইতে পারেন নাই, তিনি জাতির আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই, তিনি জাতির একজন হইয়া যাইতে পারেন নাই, তিনি বাহিরের লোকের ন্যায় বাহিরের অভাবগুলিই বেশী লক্ষ্য করিয়াছেন, দূর প্রবাসীজনের ন্যায় জাতির প্রাণের সকল কথা জানিতে ও শুনিতে পান নাই।

এই নবযুগে তাঁহার যাহা বলিবার ছিল, তিনি গত বর্ষেই তাহা বলিয়াছেন, যাহা দিবার ছিল, তাহা তখনই দিয়াছেন। আমাদের শুনাইবার মত নূতন কথা, দিবার মত নূতন জিনিষ আর তাঁহার নাই। যখন তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরা তাঁহাকে নেতৃত্ব দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, অনন্ত পথের যাত্রী আমাদের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইবার পূর্ব্বে আর একটি নূতন গান শুনাইয়া যাইবেন। কিন্তু হায়! সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা নূতন গান শুনিতে পাইলাম না, তাঁহার সেই পুরাতন গানে আমাদের প্রাণ আর সেরূপ ভাবে নাচিয়া উঠিল না, বরং আমরা আমাদের অপরাপর সাধনার অন্তায়

নিন্দায় যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম, হৃদয়ে এক অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করিলাম! গান শুনিয়া উঠিলাম, যাহা চাহিলাম, তাহা পাইলাম না।

ভূমিকার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে অভিভাষণ বলিতে যে স্থানীয় কথার আলোচনা বুঝিতে হইবে, এ সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শব্দটা "কঠিন" হইতে পারে কিন্তু উহার অর্থ অক্ষয়বাবু যত কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, উহা তত কঠিন নহে। অভিভাষণ ত বক্তব্য বিষয়। অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণে স্থানীয় বিষয়ের আলোচনা স্বাভাবিক, আর অস্বাভাবিক বলিয়াই তাঁহার গত বর্ষের অভিভাষণে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অত্যধিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ যদি কেবল স্থানীয় কথাতেই পূর্ণ থাকে, তবে সমাজের প্রাণের কথা কাহার অভিভাষণে ফুটিয়া উঠিবে? তিনি যখন সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেশের—জাতির প্রাণের কথা নিজের প্রাণের কথারূপে ব্যক্ত করিবেন, আর তাহা করিতে পারিলেই তাঁহার অভিভাষণ সার্থক হইয়া উঠে। অক্ষয়বাবুও শব্দটির যথার্থ অর্থ-সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ করিলেও তিনি উহার প্রকৃত অর্থমতই কায করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবু সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—সৌন্দর্য্যের নাড়াচাড়া করিলে রস বাহির হয়; সেই রসের রচনার নাম সাহিত্য। সংজ্ঞাটির মধ্যে বিশ্বজনীনতার ভাব যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অর্থে সাহিত্য সংকীর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে না। কবিতা হইতে বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্তই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কবিতা যেমন সৌন্দর্য্যের আলোচনা করে, বিজ্ঞানও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের সাধনা করে। ইতিহাস সেই সৌন্দর্য্যের আলোচনা ও সাধনার একটা ধারাবাহিক স্রোতের নির্দ্দেশ করিয়া সৌন্দর্য্যের আর একটি নূতন দিক দেখাইয়া দেয়। জ্যোতিঃবিজ্ঞান যেমন সৌন্দর্য্যময়ের অসীমতার ধারণা জন্মাইয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে, ভূতত্ত্বও সেইরূপ তাঁহার গঠন-কার্য্যের একটা শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া তাঁহার শক্তির নিকট আমাদের গর্ব্বমুগ্ধ হৃদয়কে স্তব্ধ করিয়া তুলে ও এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ-প্রভাবে তাঁহার চরণোদ্দেশ্যে আমাদের উন্নত মস্তককে নত করাইয়া দেয়!

যখন কবিতা ও ইতিহাস, জ্যোতিঃবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব,—মানুষের সাধনা-লব্ধ সমস্ত সৃষ্টিই সেই অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস দিতে সমর্থ হয়, তখন কেবল কবিতার আলোচনাকে সাহিত্য-আলোচনা বলিব কেন? ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকেও এ হিসাবে সাহিত্য বলা চলে। কারণ, উহাদের একটা ভাষা আছে। সে ভাষা যে বুঝিতে পারে, সে সেই পাষাণের মর্ম্মকথা ভেদ করিতে পারে, সে-ও সেই পাষাণের মধ্যে সৌন্দর্য্য-আলোচনার পরিচয় পায়।

কিন্তু অক্ষয়বাবু সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা তিনি কার্য্যতঃ গ্রহণ করেন নাই। মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন, সময়ের প্রভাব একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না। এক দিন ছিল, যখন বঙ্গ-সমাজ "কীর্ত্তন-কবি, যাত্রা-কথকতা, পাঁচালি লইয়া সৌন্দর্য্যের নাড়াচাড়া করিয়া বাঙ্গালি-জীবন সার্থক" করিত; কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন বাঙ্গালী কেবল

ঐগুলি লইয়াই নিজের জীবনকে সার্থক ভাবিতে পারে না। এখন তাহারা বুঝিয়াছে, সৌন্দর্য্য-আলোচনার উপায় কেবল ঐগুলি নহে, এখন তাহারা সেই আলোচনার অন্য পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, এখন তাহারা সেই নব পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অক্ষয়বাবু তাহাদের সেই ব্যগ্রতা, সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান নাই, সেদিকে লক্ষ্যও করেন নাই; অথবা যতটুকু করিয়াছেন, তাহা বড়ই কঠোর ভাবে। আর বাস্তবিক যিনি সমস্ত জীবন পুরাতন বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, যিনি কেবল পুরাতনের মধ্যেই জীবনী-শক্তি খুঁজিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট নূতনের দাবী স্বীকৃত হইবে, এরূপ আশা করাই অন্যায়। তিনি ত চিরকালই নূতনকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। যিনি হেমচন্দ্রের মর্ম্মকথার ভিতর দিয়া ভারতবাসীর মর্ম্মকথার পরিচয় পান নাই, যিনি তাঁহার আবেগের ভিতর বৈদেশিক গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, যিনি প্রফুল্ল, ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর ভিতর হিন্দুত্বের লক্ষণ দেখেন নাই, তিনি নূতন যুগের পুরোহিত হইবার যোগ্য নহেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বা জগদীশের ভক্ত হইলেও তাঁহাদের সাধনার সহিত সমানুভূতি দেখাইতে পারেন না, তিনি সুরেন্দ্রের কর্ম্মশীলতার বা বাগ্মিতার প্রশংসা করিলেও তাঁহার জীবন-ব্যাপী রাষ্ট্রসেবার সার্থকতা অনুভব করেন না, তিনি অশ্বিনী-কুমারের দলগঠন-ক্ষমতা স্বীকার করিলেও স্বদেশী-প্রচেষ্টা যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটা বহিঃপ্রকাশ তাহা স্বীকার করেন না, বরং তাহার ভিতর বিদ্বেষ আবিষ্কার করিতে বসেন। তিনি ত সর্ব্বদাই "কীর্ত্তন-কবি, যাত্রা-কথকতা, পাঁচালী"র মধ্যেই সাহিত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্ত স্বতঃই প্রয়াস পাইবেন; কিন্তু তথাপি আজিকার বাঙ্গালী যেভাবে সাহিত্যকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই মহান্‌ ও বিশাল ভাব তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়েরই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের একটি পরিচয়।

গত বৎসর অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছিলেন—"এই বাঙ্গালা ভাষার উপর বাঙ্গালীর অত্যাচার আজ দশ পনের বৎসর কিছু বেশী বেশী হইয়াছে। সেই সকল অত্যাচার দেখিয়া এবং স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে মাতৃভাষাকে চিনিতে হয়; চিকিৎসক রোগী না চিনিয়া যেরূপ উদরাময়-রোগীর কাঁচা দাঁত উঠাইয়া দিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত এবং রোগীকে মহাযন্ত্রণাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, আমরাও অনেক সময় মাতৃভাষাকে না চিনিয়া সেইরূপ বিড়ম্বিত হই ও মাতৃদেহে আঘাত করি।" এ বৎসরও তিনি বলিয়াছেন—"বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণ পদার্থ আছে, সেইটি বাঙ্গালীর মত হইলে তবে বাঙ্গালীর উপযোগী ভাষা হয়।" তিনি বলেন, প্রাণের ব্যাকুলতায় ভাষার উৎপত্তি। যে ভাষা এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তাহার একটা প্রাণ আছে। সুতরাং "যে ভাষার প্রাণ নাই, সে ভাষাই নহে"

প্রবীণ সাহিত্যিকের এই বাণী আমরা সসম্মানে গ্রহণ করিতেছি, এবং যে সাধনা দ্বারা ভাষা প্রাণময়ী হইয়া উঠে, সে শিক্ষাও তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকবৃন্দের দৃষ্টান্তে শিখিতে প্রস্তুত আছি। "সংস্কৃতসম বা সংস্কৃতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূয়োপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ থাকিবে ও হইবে" একথা যে কোন নব্য সাহিত্যিক স্বীকার করিবেন। আজকালকার দিনে সাহিত্যে এই পন্থাই গৃহীত হইতেছে। এখন আর কোন সাহিত্যিকই সংস্কৃত-শব্দ-সর্ব্বস্ব প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রয়াস পান না। ভাষা যাহাতে সর্ব্বজনবোধ্য হইয়া উঠে, তাহার চেষ্টা সকলেই অল্পাধিক করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গাল' বাঙ্গালা হইলেও সংস্কৃতের নিকট ঋণী। তাহার পুষ্টির জন্য এখনও আমাদিগকে সংস্কৃতের স্থানে সাহায্য লইতে হইবে। বৈদেশিক ভাবসমূহকে আত্মায়ত্ত করিবার পক্ষে সংস্কৃত বাঙ্গালার প্রধান সহায় হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত একেবারে ত্যজ্য হইতে পারে না। আর একটা কথা এই যে, লিখিত ভাষাকে কথিত ভাষা হইতে একটু পৃথক রাখা সর্ব্বদাই আবশ্যক। বিভিন্ন প্রদেশের কথিত ভাষা বিভিন্ন। চট্টগ্রামের বাঙ্গালা রাঢ় অঞ্চলে অবোধ্য; রাঢ়ের বিভক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী কুমিল্লা বা ময়মনসিংহের বিভক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী হইতে বিভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে লিখিত ভাষাকে একেবারে কথিত ভাষার আসরে নামাইতে যাওয়া আর বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করা একই কথা। কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষা মিলাইতে যাইয়াই আসামী ও ওড়িয়া বিভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এরূপভাবে ভাষাকে নষ্ট করিতে দেওয়া অক্ষয়বাবুর উপদেশের উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। কারণ, তিনি নিজে কখনও ঐরূপ চেষ্টা করেন নাই। ভাষা যে ভাবের অনুগামিনী হইবে এবং তাহা কথিত ভাষা হইতে অভিন্ন থাকিবেই তাহা তিনি নিজের ভাষা দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত সামান্য যাহা কিছু পড়িয়াছি, তাহাতে কখনও এরূপ অন্যায় সন্দেহ হয় নাই যে, তিনি উভয় ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। যে দুটি অভিভাষণে তিনি উভয় ভাষার মিলন আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন, সে দুইটির আভাষ আদৌ কথিত ভাষা নহে। সমাসও বহুল শব্দাড়ম্বরপূর্ণা ভাষা যদি কথিত ভাষা হয়, তবেই তাঁহার রচনা কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত হইবে, অন্যথা নহে।

সুতরাং কার্য্যতঃ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, বাঙ্গালার এমন একটা ব্যাকরণ থাকা আবশ্যক, যাহার সূত্রাবলী সমস্ত বঙ্গই নত মস্তকে মানিয়া লইবে। লিখিত ভাষাতে ও কথিত ভাষাতে এক করিয়া ফেলিলে এরূপ সার্ব্বজনীন ব্যাকরণের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। ভাষা যত সহজ ও সরল হয়, তাহা করা অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার যাহাতে তাহা দেশজ শব্দপূর্ণ হইয়া প্রদেশভেদে অবোধ্য হইয়া না উঠে, সে দিকেও তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যতক্ষণ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত কোন একটি শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা যায়, ততক্ষণ সে স্থলে অপ্রচলিত দেশজ শব্দ ব্যবহার করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু যখন সেই দেশজ কথার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখনই তাহার ব্যবহার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রথম প্রথম 'কোটেশন' চিহ্ন দ্বারা তাহার দেশজত্ব বজায় রাখিয়া ক্রমশ যখন তাহা সর্ব্বজনের বোধ্য ও পরিচিত শব্দ হইয়া

উঠিবে, কেবল তখন তাহা অবাধে অন্য শব্দের মত ব্যবহার করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে প্রাঞ্জলতার নামে অস্পষ্টতার আশ্রয় লওয়া হইবে।

জাতি প্রভৃতি কথা অক্ষয়বাবুর নিকট "নেহাত বিজাতীয়" ঠেকিয়াছে। আশ্চর্য্য কি! তিনি জাতির স্থলে দেশ শব্দ ব্যবহার করিতে চান। কিন্তু দেশ আর জাতি এক নহে। 'জাতি' রূপে গঠিয়া উঠিতে হইলে আগে দেশ চাই বটে, কিন্তু কেবল দেশ থাকিলেই জাতিত্ব জন্মে না। এখন যে অর্থে জাতি-শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সে অর্থ আপাততঃ আমাদের নূতন বোধ হইলেও একেবারে নূতন ভাব নহে। সমাজ কথাটাই আমরা বুঝি ভাল বটে; কিন্তু এই সমাজের উপরেই জাতির ভিত্তি। সমাজ হইতেই জাতিত্ব ফুটিয়া উঠে। ইংরেজীতে পিপ্‌ল বলিতে সমাজ আর নেশন বলিতে এই জাতি বুঝায়। নেশন কথাটার প্রকৃত প্রতিশব্দ রাষ্ট্রশক্তি। আমরা এখন এই রাষ্ট্রশক্তি অর্থেই জাতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। ভারতবর্ষ ও তাহার প্রদেশগুলি যখন স্বাধীন ছিল, তখন আমরা এই জাতিত্ব ভোগ করিয়াছিলাম। সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ-অন্তর্গত মারাঠা ও শিখ এক একটি জাতি ছিল। অধুনা যখন আমরা নিজেদিগকে জাতি বলি, তখন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাহা বলি।

তারপর, কোন শব্দ বা বাক্যাংশ বিজাতীয় ভাবপূর্ণ হইলেই যে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? মুসলমান প্রভুত্বের আমলে বহু বৈদেশিক শব্দ ও বাক্যাংশ বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ ইংরেজী প্রভুত্বের দিনে বহু ইংরেজী শব্দ ও ইংরেজী ভাবপূর্ণ বাক্যাংশ বাঙ্গালা হইয়া যাইবে ও যাইতেছে। একটা জীবন্ত ভাষাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তাহা নিজের ভাব-ব্যক্তি-ও-পুষ্টির জন্য পরকীয় ভাষা হইতে বহু শব্দ ও ভাব আত্মায়ত্ত করিয়া করিয়া লইবেই। যখন সেই সব শব্দ ও ভাব বাঙ্গালীর অন্যান্য শব্দ ও ভাবের ন্যায় বোধ্য ও পরিচিত হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগকে, মূলতঃ বিজাতীয় বলিয়া, ভাষা হইতে দূর করা একেবারে অসম্ভব। আবার, এরূপ ভাবে ঐগুলি আত্মায়ত্ত করিতে না পারিলে ভাষার জীবনী-শক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসে, একথা কি সত্য নহে?

অক্ষয়বাবু তাঁহার সাহিত্যিক অভিভাষণে স্বাস্থ্যের আলোচনা নিতান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও অত্যধিক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের সহিত সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন যে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে তাহা তিনি এরূপ মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ যদি নাও করিতেন তথাপি যে কোন বাঙ্গালীকে স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাই বলিয়া যে বাঙ্গালী আপনার সমস্ত শক্তি ঐ একদিকে নিয়োগ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য একথা বলিতে যাওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার বিস্তৃত বিচার অনাবশ্যক হইলেও যখন তিনি কথাটা তুলিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায় হইবে না।

দূর হইতে জল আনিতে যাইয়া কুলবধূ সর্ব্বত্র কুলের বাহির হউক আর নাই হউক, দেশের সমস্ত পল্লীবাসী বাঘের তাড়নায় উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠুক আর নাই উঠুক, পল্লীগ্রামের অবস্থা বাস্তবিকই

যথেষ্ট শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রীষ্মকালে আমাদের কত পল্লীবাসী আত্মীয় জলাভাবে কি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিব না, বাঙ্গালী তাহার সমস্ত চেষ্টা কেবল ঐ একদিকে নিয়োগ করিলে বাঙ্গালীর মঙ্গল হইবে। বাঙ্গালীর অভাব ত কেবল ঐ একদিকে নহে। বাঙ্গালীর অভাব চারিদিকে। বাঙ্গালী যেমন পল্লীর দুরবস্থায় কষ্ট পাইতেছে, তাহার জীবনধারণের নূতন ও উৎকৃষ্ট পন্থার আবিষ্কার না হওয়ায় তাহার যে আরও অধিক কষ্ট হইতেছে, একথা কি অগ্রাহ্য করিবার! বাঙ্গালী কি চিরকালই পরপদসেবা ও ভ'য়ে ভ'য়ে কলহের সৃষ্টি করিয়া আপনার উদরান্নের সংস্থান করিবে! "যে চাষেই আমাদের প্রাণ আছে" সেই চাষের অবস্থা যে শিক্ষা ও অর্থের অভাবে দিন দিন হীন হইয়া আসিতেছে সে দিকে লক্ষ্য করাও কি আবশ্যক নহে? ফল কথা, অক্ষয়বাবু যতই বলুন "যিনি এখন অন্য বিষয়ে বাঙ্গালীকে মন লাগাইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালির পরম শত্রু," বাঙ্গালী কিন্তু তাঁহার এরূপ অদ্ভুত উপদেশ মানিতে প্রস্তুত নহে। সে অন্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানেরও চেষ্টা করিবে ও করিতেছে, তাহাকে এখন চারিদিক দেখিয়া চলিতে হইতেছে, সে এখন কোন একটী বিষয় লইয়া নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। যিনি তাহাকে এই বহুমুখিনী সাধনা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সমাজের কোন ধারই ধারেন না। তারপর একটা আশ্চর্য্য এই যে, যে অক্ষয়বাবু সারাজীবন সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন, তিনি জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে সাহিত্য-সম্মিলনের নেতৃত্ব লইয়া বাঙ্গালীকে অন্য সমস্ত সাধনা ত্যাগ করিয়া কেবল পল্লীর উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেছেন। অবশ্য তিনি আশা করেন যে, এরূপ মনোযোগের পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের আপাততঃ ক্ষতি হইলেও পরে আরও অনেক উপকার হইবে। কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অপেক্ষা বাঙ্গালীর পূর্ব্ব হইতে গৃহীত পন্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখন অনেক স্থলেই পল্লীবাসীরা অপরাপর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জলের বন্দোবস্ত ও রাস্তাঘাট প্রভৃতির সংস্কার ও উদ্ধার করিতেছেন এবং প্রয়োজনমত নূতন পথ-ঘাটের সৃষ্টিও করিতেছেন। ক্রমেই এরূপ সেবা আপনা হইতেই দেশব্যাপী হইয়া উঠিবে।

জাতীয় উন্নতি কেবল একদিকের সাধনা দ্বারা সম্ভবপর নহে। সাধনা বহুমুখিনী হওয়া আবশ্যক। এজন্য নির্ব্বাচিত সদস্য-পূর্ণ মন্ত্রণা-সভা, কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল, উচ্চ-নীচ সুলভ-দুর্লভ শিক্ষা, বিচারক ও শাসকের পার্থক্য, সভাগৃহমধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অবাধ প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা, কৃষি-বিজ্ঞানের চর্চ্চা, শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত, বিদেশে ছাত্র-প্রেরণের ব্যবস্থা ও বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্রবৃন্দকে সমাজে গ্রহণ করিবার প্রয়াস এবং পল্লীনিচয়ের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান—এ সমস্তই চাই। এখন বলা চলে না—"কি করিব আমরা নির্ব্বাচিত সদস্যপূর্ণ মন্ত্রণা-সভা লইয়া? কি করিব কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল লইয়া? কি করিব উচ্চনীচ সুলভ ও দুর্লভ শিক্ষা লইয়া? কি করিব বিচারক ও শাসকের পার্থক্য লইয়া? কি করিব সভাগৃহমধ্যে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অবাধ প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লইয়া? এখন আর কেবল "মহারাজ রণজিৎ

সিংহকে আর রায় সীতানাথ রায়কে” শত ধন্যবাদ দিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। যাঁহারা জাতীয় স্ফূর্ত্তিবিকাশের জন্য সামান্যমাত্রও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে হইবে আর তাঁহাদের সাধনার পথে প্রকৃত সাহায্য করিতে হইবে। এখন তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা ও তাঁহাদের পথ সুগম করিয়া দেওয়া সাহিত্য-সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর আদর্শ-চরিত্রের কথা। সত্য বটে, “রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্য্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই।” কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমবাবু বা অন্য কৃতী লেখকেরা অক্ষয় বাবুর একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও “বাঙ্গালীর যশোদা, মেনকা, জগদম্বা”র চিত্র অঙ্কিত করিতে অবসর না পাইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। “আমরা দূরে পশ্চিম দিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখন আপনাদের দিকে আপনাদের ঘরের দিকে আপনাদের গৃহস্থালির দিকে আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না”—অক্ষয় বাবুর একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। বাঙ্গালী লেখকেরা পশ্চিমদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিতে কখনই অযত্নপর নহেন।

বঙ্কিমবাবুর সৃষ্ট স্ত্রী-চিত্রগুলির সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি কি বাস্তবিকই অদ্ভুত চিত্র? সেগুলি যদি বাঙ্গালী-জীবনের ছবি নাই হইবে তবে বঙ্গসমাজে অতটা আদৃত হইল কেন? হইতে পারে সে সব চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবের কিছু কিছু ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই সেগুলি একেবারে বিজাতীয় হইয়া যায় নাই। এরূপ ছাপ আজকালকার সমাজে অবশ্যম্ভাবী। একটা জীবন্ত জাতির সংস্পর্শে আসিব, তাহার আচার-ব্যবহার সব দেখিব, অথচ সে আমার চরিত্রের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিবে না; ইহা অসম্ভব। মানুষের চরিত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত নহে। বঙ্কিমবাবু আদর্শ চরিত্র না আঁকিয়া থাকিতে পারেন, তিনি যে চিত্রগুলি দিয়াছেন, সেগুলি বাঙ্গালী সমাজেরই চিত্র। “বঙ্কিমবাবু উপন্যাসগুলি য়ুরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।” কেন নহে, তাহা অক্ষয়বাবু নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল মেনকা প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই বলিয়াই কি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি “ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য” হইবে না? এ প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবু এটুকু বলা আবশ্যক যে, যদি পাপ ও পুণ্যের, প্রেম ও কামের ফলভেদ দেখানই ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ হয়, তবে সে পুণ্যের ও প্রেমের জয় সেগুলিতে অতি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিশেষে হরিসাধন বাবুর শীশ মহলের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অক্ষয়বাবু সংকুচিত হইয়াছেন। বলিয়াছেন—“কোন হিন্দু বাঙ্গালীর লেখা মুসলমানি চরিত্র দেখিলে আমার একরূপ আতঙ্ক হয়। আয়েসা জগৎ সিংহকে ভাল বাসিল—বিধর্ম্মী বলিয়া মনে একটু “কিন্তু” হইল না? এ সকল পড়িয়া আমার আতঙ্ক হয়।” এ আতঙ্ক এক অদ্ভুত ব্যাপার! প্রেমের রাজ্যে

পাত্রাপাত্র নাই, এ কথা প্রচার করিতে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের মত পরাধীন ও নেতৃহীন সমাজ কুণ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চ সাহিত্যও কি এই সত্য স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে! কামই বীভৎস জিনিষ। কিন্তু প্রেম ত স্বর্গীয় জিনিষ। তার পর বঙ্কিমবাবু যে সময়ের চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সময়ে হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হইত। হিন্দু স্ত্রী যদি মুসলমান স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিত, তবে মুসলমানী হিন্দুকে ভালবাসিতে পারিবে না কেন? এখনও ত ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ প্রেম একেবারে দুর্লভ নহে। যে চট্টগ্রামে বসিয়া অক্ষয়বাবু আয়েসার প্রেমের পরিচয় পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, সেই চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ ইংরেজ রমণী হইয়া বাঙ্গালিনী সাজে আপনাকে সাজাইয়া বাঙ্গালিনীর ন্যায় ঘর-সংসার করিতেছেন। অক্ষয়বাবু ঐ কথা লিখিবার সময় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান নাই—সেখানে ভেদাভেদ স্থান পায় না। তিনি নিজেও একথা অভিভাষণের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই অভিভাষণেরই শেষাংশে যখন তিনি সেই সত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা পতিত হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিরূপেই করিয়াছেন, সাহিত্যিক রূপে নহে। এ অভিভাষণে তিনি উদার সাহিত্যিক ও রক্ষণশীল হিন্দু এই উভয় ভাবই দেখাইয়াছেন।

তার পর নবীনবাবুর কাব্যের সুভদ্রা, সুলোচনা ও শৈলজার প্রতি অক্ষয়বাবু অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার মতে এ চিত্রগুলি ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট নহে। এগুলি যদি উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র না হয়, তবে ভারতীয় সাহিত্য জিনিষটি কি? তাহা কি কেবল কীর্ত্তন-কবি, যাত্রা-কথকতা, পাঁচালি"তেই দৃষ্ট হয়? উহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলিই কি ভারতীয় সাহিত্যের নমুনা।" কুরুক্ষেত্র সমরের অবসর-সময়ে রাত্রিকালে হিন্দুরমণী দীপ লইয়া হতাহতের অনুসন্ধান করিতেছেন" বলিয়াই কি সুভদ্রা-চিত্র বিজাতীয় হইয়া যাইবে? ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেলও ঐরূপে আহত সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি কৃষ্ণ-ভগিনী ইংরেজ-রমণী হইয়া উঠিলেন! অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যাহা হউক!

প্রাচীন চিত্রগুলির মূলতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি সেগুলিকে আধুনিক সময়ের উপযোগী করিয়া বর্ণিত করা যায়, তাহাতে কি সে চিত্রগুলির গৌরব কিছুমাত্র লঘু হইয়া যায়? যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র, তাহাকে যতই মাজা-ঘষা যাউক না, তাহার সে সৌন্দর্য্য বা পাবিত্র্য কোন মতেই হ্রাস পাইতে পারে না; বরং বহুত্রই সেগুলি আরও অধিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এ হিসাবে নবীনবাবুর সুভদ্রা-চিত্র নূতন সৃষ্টি নহে। তাহা পুরাতনের নূতন মূর্ত্তি মাত্র। এ মূর্ত্তি যে পুরাতন মূর্ত্তি অপেক্ষা হীনজ্যোতিঃ তাহা আমাদের মনে হয় না। তথাপি অক্ষয়বাবুর মতে এ মূর্ত্তি হিন্দুরমণীর মূর্ত্তি নহে।

এরূপ সুভদ্রার চিত্র যদি বাস্তবিকই অহিন্দুর চিত্র হয়, তবে হিন্দুস্ত্রীর চিত্র কিরূপ স্বতঃই এ প্রশ্ন মনে আসে। অক্ষয়বাবুরও আসিয়াছে। তাই তিনি হিন্দুস্ত্রী-চিত্র দিতেছেন—

"অতিথি ভারতে চিরদিনই পূজ্য। সেই অতিথি অঙ্গনে উপস্থিত; কুলবধূ তাঁহার কার্য্য

দিবার জন্য কয়ক পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী পথশ্রান্ত হইয়া আসিলেন। সেই মহাব্রত আতিথ্য পড়িয়া রহিল, অতিথি স্বাগত-সেবা না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কুলবধূ করক অধৌত রাখিয়া দিয়া পতিসেবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।—এই না হইল আমাদের সধবা কুলবধূর আদর্শ। যদি স্বামিসেবা বিস্মৃত হইয়া কুলবধূ পরপুরুষের হস্তাহস্তের সেবায় ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে সেই আদর্শ থাকে কি? কখনই থাকে না।"

কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এ যদি হিন্দু স্ত্রীর চিত্র হয়, তবে ইংরেজ মহিলা ও ঐ কুলবধূটিতে পার্থক্য কোথায়? ইংরেজ মহিলাও কি অন্য সব কাষ ফেলিয়া স্বামীর জন্য ঐরূপ পাগল হইয়া উঠে না? না উহা হিন্দু স্ত্রীর চিত্র নহে। তিনি স্বামীর জন্য যতই ব্যাকুলা হউন না, যাহাতে স্বামীর ও গৃহস্থের কল্যাণ হয়, আগে তিনি তাহাই করিতে বাধ্য। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী. স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করাই তাঁহার ধর্ম্ম। সুতরাং কুলবধূটি যদি স্বামীর জন্য না ছুটিয়া যাইয়া অতিথি-সেবাতেই রত থাকিতেন ও স্বামীকে ইঙ্গিতে পা ধুইবার জল প্রভৃতি দেখাইয়া দিতেন, তবেই তিনি প্রকৃত হিন্দুস্ত্রীর আদর্শ হইতে পারিতেন। স্বামী বড় বটে, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা স্বামীর ধর্ম্ম বড়, এই জ্ঞানই হিন্দু-রমণীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান সুভদ্রার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার এই জ্ঞান ও মাতৃত্বব্যঞ্জক প্রেম ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি অহিন্দু হইয়া উঠেন, তবে আমরা অক্ষয়বাবুর প্রশান্ত কুলবধূ চাই না, তাহাতে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবান করুন যেন গৃহে গৃহে এই অহিন্দু সুভদ্রার মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া উঠে। যেদিন ঘরে ঘরে এই সুভদ্রা বিরাজ করিবেন, যেদিন ঘরের বধূ সুভদ্রার মত নিষ্কাম প্রেমের অধিকারিণী হইয়া গৃহস্থকে নিত্য নৈমিত্তিক দ্বন্দ্ব-কলহ হইতে মুক্তি দিয়া গৃহে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিবেন, যেদিন তিনি সর্ব্বকার্য্যে সুভদ্রার মত সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিবেন, সেদিন বাঙ্গালীর মহাশুভদিন, মহা গৌরবের দিন, সেদিন তাহার পতিত জীবনের অবসান ও নবজীবনের প্রথম উষার উন্মেষ। সেদিন যেন অদূরবর্ত্তী হয়।

শৈলজা ও সুলোচনা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু বিস্তৃতভাবে কোন কথা বলেন নাই। এই দুইটি চিত্রের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অক্ষয়বাবুর এরূপ অন্যায় কটাক্ষপাতের কোন যুক্তিসহ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই দুইটি চিত্রই অতি সুন্দর। কেন যে এমন সব চিত্রকে তিনি ভারতীয় সাহিত্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহেন, তাহা বুঝিয়া উঠা এক অসম্ভব ব্যাপার। শৈলজার প্রেম ও সুলোচনার মাতৃত্ব ও সখীত্ব নবীনবাবু যেরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে এ চিত্রগুলি এক একটি জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা দূরে থাক, সংস্কৃত সাহিত্যেও এমন জীবন্ত সুন্দর চিত্র অতি অল্পই আছে। চিত্রগুলিতে আমরা বিজাতীয় গন্ধ একটুও পাই নাই। এগুলি সর্ব্বতোভাবেই ভারতীয় চিত্র, তাহা অক্ষয়বাবু স্বীকার করুন না করুন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* এই সংখ্যার ২০৭ পৃষ্ঠার সপ্তম ছত্রে 'অস্বাভাবিক' শব্দের স্থলে 'স্বাভাবিক' এবং সপ্তবিংশ ছত্রে 'উহাদের' স্থলে "উহাদেরও" হইবে।

তুলনায়।

(Tennyson হইতে)

আনন্দ-বিহ্বল প্রাণে গায়িতেছে পাখি !
ধরা হ'তে উঠি কত দূরে ;
তরঙ্গিনি ! বহিতেছ কি পুলকে গায়ি'
শস্য-শ্যাম কত পথ ঘুরে।

উঠেছে দেউল-চূড়া দূর নভ ভেদি'।
ফুল হাসে সমাধিটি ঘিরে ;
ওগো প্রেম, হে জীবন, শ্রান্ত আমি শুধু ;—
আঁখি-পাতে নামে ঘুম ধীরে !

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

ভণ্ডের প্রতি।

কে হোথা দাঁড়ায়ে ওই নত করি শির,
চাহিতেছে দীন নেত্রে শান্ত, মৌনী, ধীর।
নয়নেতে আঁখি-জল,—প্রাণ নাহি তথা
হৃদয়ের বার্ত্তাহীন বদনে দীনতা।
হাসিতে ঝরিছে যেন গরলের কণা,
ছিন্ন বসনের ছিদ্রে অহির রসনা।
দীর্ঘশ্বাসে আসে যেন নরকের মলা,
করযোড়ে উঁকি মারে ছুরিকার ফলা।
এত কেন চাটুকথা—কিরে অসাধুরে ?
বিভুনাম কেন মুখে লাগে না মধুর ?
সতত জাগ্রত চেষ্টা বিনয়ের মাঝে,
আয়োজন ধরা পড়ে তিলকের সাজে ;
সাজান দীনতা এত চিত্রিত ভকতি ?
রে ভণ্ড ! চিনেছি তোরে, দূর মূঢ়মতি।

শ্রীকালিদাস রায়।

ইংরাজের প্রাচীন দণ্ডনীতি।

—•:•:•—

অনেকের মুখে শুনা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান দণ্ডনীতি বড় কঠোর ছিল এবং ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত দণ্ডবিধি ভারতবাসীকে লোমহর্ষণ কঠোরতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যখন হিন্দু ও মুসলমান রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বিলাতের দণ্ডবিধি যে কিরূপ কঠোর ছিল তাহা জানিলে এরূপ তুলনার অযৌক্তিকতা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাহারই একটু আলোচনা করিব।

আমরা প্রায়ই প্রাচীনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিবার সময় ভুলিয়া যাই যে, এরূপ তুলনার কোন সাধারণ পরিমাপক (Standard) থাকিতে পারে না। শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নাই, যাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন যে, ভারতে রেল, ষ্টীমার, পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি ইংরাজ শাসনের সুফল এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এই সব কথা লিখিয়া সুকুমারমতি বালকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে পৃথিবীর কোথাও রেল-ষ্টীমার ছিল না, আর বর্ত্তমান কালে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুখস্বচ্ছন্দতার এই সকল আয়োজন বিদ্যমান আছে, এই অকাট্য সত্য কথা জানিয়াও কি কেহ বলিতে পারেন যে ঐ সকল সুবিধা ব্রিটিশ শাসনেরই সুফল?

দণ্ডনীতি-সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ইংরাজের আইন খৃষ্ট জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বতন মনুর বিধি হইতে বড় কম কঠোর ছিল না। অন্যূন দুই শত অপরাধের জন্য প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিরূপ সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত তাহার উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি মৃত্যুদণ্ডের (Capital Offenceএর) নাম করা অসঙ্গত হইবে না। কাহারও পকেট থেকে চুরি করিলে কিম্বা কোন দোকান হইতে ৫ শিলিং (আড়াই টাকা) মাত্র চুরি করিলে চোরের প্রাণদণ্ড হইত; কেহ যদি একটিমাত্র মৎস্য, কিম্বা একটিমাত্র খরগোসের চৌর্য্যাপরাধে যুক্ত হইত, অথবা একটি গাছ কাটিয়া ফেলিত, তাহা হইলে তাহার দণ্ড ছিল

মৃত্যু। বস্তুতঃ ইংরাজের আইন যে সেদিন পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তি কঠোর ছিল, তাহা ইংরাজদিগকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। *

অপেক্ষাকৃত আধুনিক দণ্ডবিধি যখন এইরূপ ছিল, তখন প্রাচীন ও মধ্যযুগে অর্থাৎ ভারতে যখন বৌদ্ধ, হিন্দু ও প্রথম পাঠান রাজগণ পর্য্যায়ক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন অপরাধীর বিচার ও সাজা কিরূপ কঠোর ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এইখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। কেহ যদি ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইত, তাহা হইলে সেই অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহার নির্দ্ধারণের সাধারণতঃ তিনটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এমন দ্বাদশটি গণ্যমান্য লোক সংগ্রহ করিতে পারিত, যাঁহারা শপথ করিয়া তাঁহার পক্ষে বলিতে প্রস্তুত থাকিতেন, তাহা হইলে সে নিষ্কৃতি লাভ করিত। ইঁহাদিগকে Compurgators বলিত এবং বর্ত্তমান কালের জুরী ব্যবস্থার ইঁহারাই জনক। কারণ ইঁহারাই ক্রমে জুরীতে পরিণত হন। কিন্তু সকলে কিছু কম্পার্গেটরগণের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হইত না। তখন নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের যে সকল লোমহর্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্মত হইতে হইত, ইংরাজীতে সেগুলিকে Ordeal এবং সংস্কৃতে দিব্য বলে। এই প্রমাণ ব্যাপার গির্জ্জায় পুরোহিতগণের সমক্ষে নিষ্পাদিত হইত। সাধারণতঃ হতভাগ্যকে অগ্নিতপ্ত লৌহ হস্ত দ্বারা ধরিতে কিম্বা তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে অথবা ফুটন্ত জলের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিতে বাধ্য করা হইত। অপরাধের অনুসারে কখনও কখনও হাতের কনুই পর্য্যন্ত ডুবাইতে হইত; নহিলে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ডুবাইলেই চলিত। পুরোহিত তখন সেই দগ্ধ অঙ্গ বাঁধিয়া দিতেন। তিন দিনের পরেই যদি সেই দাহজনিত ক্ষত সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইত, তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত; আর যাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক তিন দিনের পরেই ঘা না শুকাইত, সে দোষী প্রমাণিত হইয়া দণ্ড ভোগ করিত। এতদ্ব্যতীত আরও

---

* The laws of England were up to a recent period extremely draconian :—Feilden's Cons. Hist. of England P. 77.

একটি উপায় অবলম্বিত হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে নদীতে কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলে যদি সে ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে সে নিরপরাধ বলিয়া গৃহীত হইত; কিন্তু ভাসিতে থাকিলে সে যে দোষী তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। সময় সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি একখণ্ড রুটি গিলিয়া ফেলিবার জন্য আদিষ্ট হইত এবং সেই সঙ্গে পুরোহিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন যে লোকটা দোষী হইলে যেন সে এই রুটি গলাধঃকরণ করিতে গিয়া মরিয়া যায়। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Earl Godwin নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সত্য সত্যই এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা কুসংস্কারপূর্ণ বর্ব্বরতা আর কি হইতে পারে?

এই উপায় ব্যতীত আরও একটি অদ্ভুত পন্থা অনুসৃত হইত। কেহ যদি হত্যা কিম্বা এইরূপ কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া নিজের অপরাধ স্বীকার না করিত, তাহা হইলে হত ব্যক্তির কোন্ ঘনিষ্ট আত্মীয় বিচারকের সম্মুখে তাহাকেই হত্যাকারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বিচারপ্রার্থী হইত। এই আত্মীয় যদি স্ত্রীলোক, পুরোহিত, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ কিম্বা ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ না হইত, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির তাহাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার অধিকার থাকিত। সে যে এইরূপ দ্বন্দযুদ্ধে ইচ্ছুক, তাহা জানাইবার জন্য সেই বিচারালয়েই একটি দস্তানা ফেলিয়া দিত; বাদী তাহা তুলিয়া লইত। তার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইত। যাহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সে যদি পরাজিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর কোন প্রমাণ না লইয়াই তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইত; পক্ষান্তরে সে যদি জয়লাভ করিত, কিম্বা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিত, তাহা হইলে সে মুক্তি পাইত এবং যে বেচারা এই অভিযোগ আনিয়াছিল তাহার ৬০ শিলিং জরিমানা এবং সাধারণ্যে অসৎ লোক বলিয়া বিজ্ঞাপিত হওয়া,—এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এই অপূর্ব্ব বিচারপ্রণালীকে Wager of Battle বলিত, এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। অধিকার-ঘটিত মামলা মোকদ্দমার বাদী-প্রতিবাদী স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের স্ব স্ব

প্রতিনিধি (Champions) নিয়োগ করিত। এই প্রতিনিধিদ্বয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ফলাফলই বিচার-ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত। কোন রমণী অভিযুক্ত হইলেও বোধ হয় তাহার এইরূপ প্রতিনিধি-দানের অধিকার থাকিত। স্কটের Ivanhoe নামক উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই যে, রেবেকা নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য একজন Championএর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুরও হইয়াছিল।

এই ত গেল মোটামুটি বিচার-প্রণালীর কথা। তারপর দণ্ড-সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুই শতের অধিক ছোট বড় নানাপ্রকার অপরাধের জন্য একমাত্র সাজা ছিল প্রাণদণ্ড। এই চরম দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে নানাপ্রকারে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম ছিল,—যথা ফাঁসি, কুঠারাঘাত, জলমজ্জন, লোষ্ট্রাঘাত ও দাহ। কালক্রমে প্রথম দুইটি প্রকারের প্রচলনই রহিল, যদিও স্ত্রীলোকের পক্ষে মজ্জন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে আত্মনিষ্ঠ-(heretics)গণের পক্ষে দাহ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজা অষ্টম হেনরীর সময়ে আবার এক আইন হয় যে. বিষপ্রয়োগকারিগণকে জীবন্ত সিদ্ধ করিয়া ফেলা হইবে। এই নিষ্ঠুর আইন অবশ্য কয়েক বৎসর পরে রদ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকজন লোকের সত্যসত্যই এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রাণনাশ করা হইয়াছিল।

প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে কখনও কখনও আর এক দণ্ডের ব্যবস্থা হইত, তাহা অঙ্গচ্ছেদ; যথা, নাসিকা, কর্ণ, হস্ত, পদ, ~~মস্তকের~~ শীর্ষভাগ প্রভৃতির কর্ত্তন অথবা চক্ষুর বিনাশ। ছোটখাটো অপরাধের জন্য ঘোর অপমানকর কাষ্ঠ-শৃঙ্খল (Stock) এবং 'পিলরি' ব্যবহৃত হইত। কারাবাস এবং অর্থদণ্ডও ছিল।

যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইত, তাহাকে দোষস্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য যে সকল পীড়নের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও বড় ভয়ঙ্কর। সাধারণতঃ একটা গুরুভার লৌহপিণ্ড দ্বারা তাহার শরীর চাপিয়া ধরা হইত, এবং যদি সে দোষস্বীকার না করিত, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবারও বাধা ছিল না। এতদ্ব্যতীত র‍্যাক্, বুট প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার পীড়নযন্ত্র ছিল। আবশ্যকমত আবার পীড়নের নূতন নূতন

পন্থা আবিষ্কৃত হইত। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে একজনকে এরূপ ভাবে পিলরিতে দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহার কর্ণদ্বয় পেরেক দিয়া পিলরির ফ্রেমে দৃঢ়ভাবে মারিয়া দেওয়া হয় এবং যতদিন না সে নিজে স্বীয় মস্তকের চালনা দ্বারা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, ততদিন উপর্য্যুপরি তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় রাখা হইত।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

কবিতা ও গান।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রথিতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত বিহারিলাল সরকার কবিতা ও গান সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে দু'চারিটি কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলির প্রতি আমরা বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহার কথা-গুলি নূতন এবং তাহাতে ভাবিবার বিষয়ও যথেষ্ট আছে।

কবিতা ও গান-সম্বন্ধে বিহারীবাবু যাহা বলেন, তাহা এই :—

"আজকাল বঙ্গসাহিত্য উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল দিকেই উন্নতি হইতেছে। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে পাদ্রী ইয়াটস্ সাহেব এইভাবে বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালা ভাষা সম্পত্তি-শালিনী। এমন ভাব নাই যে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত না হইতে পারে। আজ যদি ইয়াটস্ সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কত আনন্দ হইত ভাব দেখি? শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত দার্শনিক বিষয়ের, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-লিখিত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কথাটা ভাবিলে ইয়াটস সাহেবের কথাটার সার্থকতা বুঝা যাইবে। কবিতা অপর্য্যাপ্ত এবং গানও অপর্য্যাপ্ত; কিন্তু আজকাল গান আর হইতেছে না। গান সাহিত্যের অঙ্গ। গানের অঙ্গহানি হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং সাহিত্যের অঙ্গহানি হইতেছে। * * * *

কবিতা ও গান ঠিক এক বস্তু নহে। গান কবিতা বটে; কিন্তু কবিতা মাত্রেই গান নহে। বর্ত্তমান কালে অনেক গানরচয়িতা এ পার্থক্যে লক্ষ্য করেন না। কবিতা এবং গান এই উভয়ই জাতীয় ভাব, অভাব ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। বিদেশীয় ভাব লইয়া কবিতা এবং গান রচনা করিলে সেই কবিতা বা গানের কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে না। অধুনা রচিত অধিকাংশ কবিতায় ও গানে বিজাতীয় ভাব আসিয়াছে।

কবিতা অপেক্ষা গান-রচনা অধিকতর কঠিন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, —নভেল লেখা অপেক্ষা নাটক লেখা কঠিন। নাটক ও নভেল মধ্যে যে সম্পর্ক বা প্রভেদ, গান ও কবিতা মধ্যে সেই সম্পর্ক বা প্রভেদ বিদ্যমান, কবিতায় বা নভেলে যে বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রকটিত হয়, নাটকে বা গানে সেই ভাব অল্প পরিসর মধ্যে প্রস্ফুট করিতে হয়। গান রচনা একপ্রকার মানসিক Shorthand লেখা। Sonnet-জাতীয় কবিতায় ১৪ লাইনে একটি ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। গানে তদপেক্ষা অল্প লাইনেও ভাববিশেষ পূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিতে হয়। প্রমাণস্বরূপ নিধুবাবুর বা শ্রীধর কথকের প্রণয়বিষয়ক গানগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেমন অল্প কথায় ও সরল অথচ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ইঁহাদের গানগুলি রচিত হইয়াছে।

কবিলেখকের যে যে গুণ থাকা প্রয়োজনীয়, গানরচকের তদতিরিক্ত কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রধান গুণ সঙ্গীতজ্ঞতা। যে কবি যে পরিমাণে সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁহার রচিত গান সেই পরিমাণে মনোজ্ঞ। আমাদের সাধক বা প্রেমিক গীতরচয়িতারা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁহাদের গান-রচনা এত সাফল্যলাভ করিয়াছে। যিনি হাফ-আকড়াই 'কবি' বা কীর্ত্তনের সুর ভাল জানেন না, তাঁহার পক্ষে এই সব জাতীয় গান-রচনা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কবিতা যেমন ছন্দের অধীন, গানও সেইরূপ ছন্দের অধীন; তবে গানের ছন্দ সকল ক্ষেত্রেই কবিতার অনুরূপ নহে। গানের ছন্দের বৈচিত্র্য-অনুসারে তালের বৈচিত্র্য। ছন্দ-বিশেষই তালবিশেষ বলিয়া অভিহিত। সেই তালজ্ঞান না থাকিলে গান-রচনা নির্দ্দোষ হয় না। নির্দ্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যায় যে তাল নিরূপিত হয়, তাহা

বলাও ঠিক নহে। চরণের অক্ষর সংখ্যাগুলি অসমান অথচ তাল ঠিক আছে এমনও দেখা যায়। অনিয়মের মধ্যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রমাণস্বরূপে দাশরথির অনেক গান উল্লিখিত হইতে পারে। দেখিতে পাইবেন, অক্ষর-গণনায় চরণগুলি অসমান, অথচ সুরে তালে গানটি নির্দ্দোষ। সুর ও তাল এই কাণ্ডে অধিকার না থাকিলে, এই ভাবে গান রচনা সুকঠিন। সুর ও তাল না জানিয়া আক্ষরিক অনুকরণে গান রচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে অনুকরণে রচয়িতাকে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। তাহাতে তাহার ভাবের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অভাব ঘটে। মৌলিক গান রচনা করিতে হইলে এক সঙ্গে কবি ও সঙ্গীতবেত্তা হওয়া চাই। আমাদের রঙ্গালয়ে গীতপ্রধান অনেক নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যে গানগুলি কবি-সঙ্গীতজ্ঞের রচিত, সুর ও লয়যোগে সেগুলি সুশ্রাব্য হয় এবং তাহার কথাগুলিও স্পষ্ট বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর যেগুলি "আনাড়ী" দ্বারা রচিত, কষ্টকল্পনা করিয়া তাহার সুরতাল যোজনা করিতে হয়; সুতরাং সঙ্গীত-হিসাবে তাহার মূল্য বড়ই অল্প, এবং "যেন তেন প্রকারেণ" সংযোজিত বলিয়া তাহার কথাগুলিও বুঝা যায় না। গানরচক ও সুরতাল-যোজকের মধ্যে সহানুভূতির অভাব ঘটিলে কাহারও চেষ্টা সফল হয় না। অক্ষর-সংখ্যা ঠিক রাখিতে পারিলেই যে গান-রচনা নির্দ্দোষ হইল না, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সংখ্যার ইতরবিশেষ হইলেও ছন্দ ঠিক থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই। "আমায় দেও মা তবিলদারী" (১১); "মুক্তকর মা মুক্ত-কেশী" (৯); "আর কাজ কি আমার কাশী" (১০) "মন তোমার এত ভাবনা কেনে" (১২);—এই চরণচতুষ্টয়ের মধ্যে একটির অক্ষরসংখ্যা ৯, একটির ১০, একটির ১১, একটির ১২, অথচ প্রত্যেকটিই নির্দ্দোষ। কেন যে নির্দ্দোষ, তাহা যিনি রামপ্রসাদী সুর জানেন না, কেবল অক্ষরগণনা করিয়া অনুকরণ করেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। গদ্যে সুরলয়ের যোজনা করিয়া গাহিলেও মিষ্ট লাগে। তাই বলিয়া কি তাহা গান হইবে? আমার কোন সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিছুতেই সে হাড় বাহির করিতে পারিল না," এই কয়টী

কথায় বাহার সুরে একতালা বসাইয়া গাহিয়াছিলেন। তাহাতে আড়ও ছিল; কিন্তু ইহা কি গান? আবার একটী গান আছে,—"হেন চাঁদে কেন অপভাবে।" রচয়িতা সুরলয়জ্ঞ নহেন; একজন সুরলয় বসাইয়া দেন। কিন্তু গান গাহিবার সময় হয়,—"হেন চাঁদে কেনঅ পভাবে।" গানের সময় সুর মিষ্ট লাগে; কিন্তু গান বুঝা যায় না। রচয়িতা ও সুরলয়জ্ঞের সহানুভূতির অভাবে এই দোষ ঘটিয়া থাকে। আধুনিক এমন অনেক গানের দৃষ্টান্ত আছে। আজ ত তাহা দেখান হইল না। সাহিত্যে অনেক গান বাহির হয়, তাহাতে কবিত্ব থাকিলেও, সঙ্গীত হিসাবে তাহাকে ঠিক গান বলা যায় না এবং নাটকাদিতে অনেক গান দেখা যায় তাহা সুরলয়ে নির্দ্দোষ হইলেও, কবিত্ব হিসাবে অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং প্রকৃত গানের আদর্শ এখন কম হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গানরচনায় বৈষ্ণব কবিগণ, শক্তিসাধকগণ ও প্রণয়গীতিরচকগণ যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমার মনে হয়, বর্ত্তমানকালে সেইরূপ গানরচনার সেই কীর্ত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে না। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, প্রকৃত গানরচনায় সেরূপ উন্নতি হইতেছে না; অতএব সাহিত্য-সেবিমাত্রেরই ইহাতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নহিলে সাহিত্য অঙ্গহীন হইয়া রহিবে।"

কবিতা ও গান-সম্বন্ধে বিহারীবাবু অল্প কথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। আজকাল সঙ্গীতের আলোচনা বাঙ্গালায় কমিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গীত-সাহিত্য বড় অল্প শক্তিশালী নহে; বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর, বাঙ্গালী জাতির উপর এই সাহিত্যের প্রভাব বড় অল্প নিপতিত হয় নাই। উচ্চ মনোবৃত্তির বিকাশ-সাধন যদি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়. তাহা হইলে কবিতা ও গান বঙ্গসাহিত্যের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল করিয়াছে। কে অস্বীকার করিবে যে, সেকালের শ্যামাসঙ্গীত, কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া এ যুগের ফিকিরচাঁদী বাউল, ব্রহ্মসঙ্গীত, স্বদেশী গান প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালীর হৃদয় উন্নত, মন পবিত্র এবং চরিত্র গঠিত হয় নাই। আবার কবিতা অপেক্ষা গানের ব্যাপকতা-শক্তি অধিক। সুতরাং কবিতা অপেক্ষা গানের দ্বারা

এই উচ্চ ভাবের প্রচার অধিকতররূপে হয়। রামপ্রসাদের এক একটি গান, বৈষ্ণব-গীতিকারগণের এক একটি কীর্ত্তন, অথবা আধুনিক যুগের এক একটি ব্রহ্মসঙ্গীত, ফিকিরচাঁদী বাউল প্রভৃতি সুর-তাল-লয়ে সুকণ্ঠ-সংযোগে গীত হইলে হৃদয়ে ভক্তি, বৈরাগ্য, ভগবদ্‌প্রেম প্রভৃতি উচ্চভাবের উদ্রেক হয় এবং উহারা একই সময়ে বহুসংখ্যক শ্রোতাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সঙ্গীতের এই শক্তি উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ উচ্চ ভাবোদ্রেক-কর সঙ্গীতের অভাব নাই; বরং প্রাচুর্য্যই আছে। অথচ আজকাল এই গানের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। বিহারিলাল বলিতেছেন,—"আজকাল গান আর হইতেছে না; গান সাহিত্যের অঙ্গ। গানের অঙ্গহানি হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং সাহিত্যের অঙ্গহানি হইতেছে।" গানের এই উচ্চ আদর্শ যাহাতে আমাদের সাহিত্য হইতে লোপ না পায়, গানের এই ব্যাপকতা,—উচ্চ-নীচভেদে এই ভাবপ্রচার-শক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা আমাদিগকে রাখিতে হইলে সঙ্গীত-রচয়িতাগণের উচ্চশ্রেণীর ভাবুক বা কবি বা সাহিত্যিক হওয়া প্রয়োজন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুরতাললয়ে তাহাদের জ্ঞানও থাকা চাই। সুখের বিষয়, আধুনিক যুগের কয়েকজন প্রধান প্রধান সঙ্গীত-রচয়িতার এই উভয় গুণই আছে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও রজনীকান্ত এবং বিহারিলাল ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে এই বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহাদের গান এখন শিক্ষিত সমাজে আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রচার করিতে পারিলে গানের মাদকতা ও ব্যাপকতা-শক্তি এখনও যে যথেষ্ট পরিমাণ আত্মবিকাশ করিতে পারে, তাহা কলিকাতা সহরে প্লেগের প্রথম প্রকোপ-সময়ে কীর্ত্তনের এবং স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ-সময়ে স্বদেশী সঙ্গীত-গানের ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

সদ্ভাবসমন্বিত বা উচ্চভাববিশিষ্ট সঙ্গীতে মানব-চিত্তের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় ও হীন বা কুভাববিশিষ্ট গানেও তেমনই হৃদয়-বৃত্তির অপকর্ষ ঘটে। একে সুরুচির প্রচার, অন্তে কুরুচির বিস্তার। বাঙ্গালার কবি-ঝুমুর-পাঁচালী ভরজায় এই শেষোক্ত রুচির পরিচয় বিদ্যমান। প্রথমোক্ত রুচির পরিচয়া-ভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের সাহিত্যে সৎ সঙ্গীতের যাহাতে পুষ্টি হয়, সেদিকে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে

ভারত ও মিশর।

——:•:——

শার্ম্মিকগণ এবং পল্লীগণ ভারত হইতে মিশরে যাইয়া কালী (Nile) নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর আরও অনেক দল ভারত হইতে মিশরে যাইয়া বাস করেন। তন্মধ্যে যাদব-গণ, কুটিলকেশগণ, শ্যামমুখগণ, দানবগণ, স্ত্রীরাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রীগণ এবং যবন-গণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।* ইহাদের সকলের সম্বন্ধেই নিম্নে সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

মিশরে ভারতীয় অভিযানসমূহ।

* কাহারও কাহারও মতে যাদবগণ পল্লীগণের পূর্ব্বে ভারত হইতে মিশরে আগমন করিয়াছিলেন। যদুর সন্তানগণকেই যাদব বলা হইত। উগ্রসেনের কন্যা দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হয়। মহা অত্যাচারী কংস নৃপতি দেবকীর পুত্র দ্বারা নিহত হইবেন, এইরূপ দৈববাণী হয়। প্রাণভয়ে কংস দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার সন্তান হইবামাত্র বিনষ্ট করিতেন। কৌশলপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রাণরক্ষা করা হয়, এবং কৃষ্ণের হস্তেই কংস নিধন প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ যদুবংশজাত। যাদবগণের প্রতি স্বভাবতঃই কংসের ক্রোধ ছিল। তাহার অত্যাচারের ভয়ে একদল যাদব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কুশদ্বীপের (Abyssiniaর) পর্ব্বতাবলীতে যাইয়া বাস করেন।

ভারত হইতে যাদবগণের কুশদ্বীপে গমন।

এই যাদবগণের নৃপতির নাম যাদবেন্দ্র অথবা যদুপ ছিল। তাঁহার নামানু-সারে সেই পর্ব্বতাবলীর নামও যাদবেন্দ্র অথবা যদুপের হয়। অদ্যাপি তাহা Ouremidre অথবা Arwemidre নামে খ্যাত। এই আখ্যার যাদবেন্দ্র শব্দের

যাদবেন্দ্র।

অপভ্রংশ এইরূপ অনুমিত হয়। সহস্র সহস্র বৎসরে এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। যাদবেন্দ্র (Ariœmidre) অথবা যদুপেয় পর্ব্বত হইতে যাদবগণ ক্রমশঃ সমগ্র Ethiopia রাজ্যের নানা অংশে বাস করিতে লাগিলেন। এই Ethiopia শব্দ বোধ হয় যদুপেয় হইতে উৎপন্ন। Ethiopiaর প্রাচীন নাম Itiopia অথবা Zaitiopia। এ Zaitiopia এবং যদুপেয় শব্দের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান। গ্রীক এবং মিশরীয়গণ যে নৃপতিকে Œthiops বলেন, তিনি বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যাদবনৃপতি যদুপ। Byzanium-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত Stephanus এবং গ্রীক পণ্ডিত Philostratus তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, Ethiopia-নিবাসিগণ পুরাকালে ভারতবর্ষ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং ইঁহারা অত্যন্ত সাহসী এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

Ethiopia নামের উৎপত্তি।

পুরাণে যাদবগণ নিষ্পাপ, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং পুণ্যবান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কবিবর হোমার Ethiopianদিগকে বহুদূরস্থ প্রাচ্যদেশাগত এবং তাঁহাদের চরিত্র শ্রদ্ধাকর্ষক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে, হোমার ভারতবর্ষের বিষয় অবগত না থাকিলেও Ethiopianগণ যে বহুদূরস্থ প্রাচ্যদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত ছিলেন।

যাদবগণের চরিত্র।

যাদবগণের পর কুটিলকেশগণ ভারতবর্ষ হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। এই কুটিলকেশগণ-সম্বন্ধে পুরাণাদিতে অধিক কিছু লিখিত হয় নাই। নানাস্থান হইতে এইমাত্র সংগ্রহ করা যায় যে, কুটিলকেশগণ পুরাকালে কপিলাশ্রমের সন্নিকটে (অধিকাংশ হিন্দুশাস্ত্রে কপিলাশ্রম পাতালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) গঙ্গাসাগরসঙ্গমে (অতএব আধুনিক বঙ্গদেশে) বাস করিত; যজ্ঞপূত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমনকালে কুটিলকেশগণ সগরের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল; এবং সগরবংশধ্বংসের পর কুটিলকেশগণ শঙ্খদ্বীপে যাইয়া বাস করে। তথায় তাহারা দেবনহুষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে দেবনহুষ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া কালীতট হইতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হইয়া তাহারা শঙ্খদ্বীপের অন্তর্ভাগে পলায়ন করে,

কুটিলকেশগণের ভারতবর্ষ হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন।

এবং তথায় বাস করিতে থাকে। এই দেবনহুষই Dionysus এবং কুটিলকেশ-গণই Gaituli অথবা Gaityli জাতি। এই Gaituli অথবা Gaityli শব্দদ্বয় বোধ হয় কুটিল-শব্দ হইতে উৎপন্ন। Gaityli-গণ পুরাকালে Nile নদীর তীরে বাস করিত এবং অত্যন্ত পরাক্রান্ত জাতি ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে Dionysus কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া সাহারা মরুভূমির দিকে পলায়ন করে, এবং তৎপ্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতে থাকে। পূর্ব্ব-বর্ণিত পুরাণোক্তির সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। অতএব কুটিলকেশগণই Gaityli জাতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, কুটিলকেশ এবং হাস্যশীল (ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধের পুরোভাগে আলোচনা করা হইয়াছে) একই জাতির বিভিন্ন আখ্যা মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

কুটিলকেশগণ এবং Gaityli জাতি।

কুটিলকেশগণ দেবনহুষের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আরব-প্রান্তে এবং সাহারা মরুভূমির দিকে পলায়ন করে। এ বিষয়ে মিশরদেশীয় কবি Nonnusএর গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Blemys with curled hair, Chief of the ruddy, or Erythrean Indians held up a bloodless olivebranch with the supplicating troops, and bowed a servile knee to Dionysus who had slain his Indian subjects but the God beholding bent to the ground, took him by the hand and raised him ; but conveyed him together with his many-tongued people far from the dark Erythrean Indians to the skirt of Arabia.

কুটিলকেশগণের সহিত দেবনহুষের যুদ্ধ।

বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত Philostratus তৎপ্রণীত "Life of Apollonius' গ্রন্থে কুটিলকেশগণের ভারত হইতে মিশর অভিযানের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। Philostratus তাঁহার ভারতভ্রমণকালে কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরের দক্ষিণে কেদারগঙ্গার তীরবর্ত্তী ত্রিলোকীনারায়ণ নামক স্থানে

ব্রাহ্মণপ্রধান Iarchasএর (বেদের ভাষ্যকার যাস্বকে Iarchas বলা হইয়াছে) নিকট নিম্নলিখিত উপাখ্যান শ্রবণ করেন, এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন। Philostratusএর গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"They (কুটিলকেশগণ) resided, said he (Iarchas, অথবা যাস্ব) formerly in this country, under the dominion of a king named Ganges (বোধহয় গাঙ্গেয়কে Philostratus গঙ্গা (Ganges) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন) ; during whose reign the Gods took particular care of them, and the earth produced abundantly whatever was necessary for their subsistence; but having slain their king, they were considered by other Indians as defiled and abominable. Then the seeds which they committed, to the earth, rotted, their women had constant abortions; their cattle was emaciated; and wherever they began to build places of abode, the ground sank, and their houses fell: the spirit of the murdered king incessantly haunted them, and would not be appealed, until the actual perpetrators of the murders were buried alive; and even then the earth forbade them to remain longer in this country. Their sovereign, a son of the river Ganges (গাঙ্গেয়) was near ten cubits high, and the most majestic personage, that ever appeared in the form of man: under him they left India and migrated to Sanchadwipa."

কুটিলকেশগণের ভারত-ত্যাগের কারণ।

কুটিলকেশগণের পরে শ্যামমুখগণ ভারত হইতে মিশরে আগমন করেন।

শ্যামমুখগণের ভারত হইতে মিশরে আগমন।

এই শ্যামমুখগণের মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং কেশ হিন্দুগণের ন্যায় সোজা ছিল। ইঁহারা কুটিলকেশগণের সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং ইঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসও এক ছিল। ইঁহারা ভারত হইতে প্রথমে

শ্যামমুখগণের ভারতে অবস্থান।

অর্ব্বস্থানে (Arabia) আসিয়া বাস করেন, এবং ইঁহারাই ঐ স্থানের আদি অধিবাসী বলিয়া অনুমিত হয়। অর্ব্বস্থান হইতে ক্রমশঃ ইঁহারা মিশরে কালীতটে যাইয়া বাস করেন। ইঁহাদের অধিপতির নাম মহাশ্যাম। এই মহাশ্যামই বোধ হয় মিশরীয় ও গ্রীকগণের উল্লিখিত Arabus নৃপতি। Arabus খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে অভ্যুত্থিত Assyria রাজ্যের রাজধানী Nineveh নগরীর প্রতিষ্ঠাতা Ninusএর সমসাময়িক। তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে Arabusএর উল্লেখ আছে।

দানবগণের মিশর হইতে ভারতে গমন।

শ্যামমুখগণের পর দানবগণ ভারত হইতে মিশরে গমন করেন। শ্যামমুখগণের ন্যায় ইহাদেরও উৎপত্তি-সম্বন্ধে পুরাণাদিতে বিশেষ কিছু লিখিত নাই। দানবগণ পশ্চিম ভারত হইতে তাঁহাদের অধিপতি বেলী অথবা দানবেন্দ্রের অধিনায়কত্বে মিশর দেশস্থ কালীতটে গমন করেন। দানবগণের বাসস্থান কালীতটে, পুরাণাদিতে এইরূপ বহুস্থানের উল্লেখ আছে। কালীতটের ঠিক কোন্ স্থানে দানবগণ বাস করিতেন, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

"মল্লারি মাহাত্ম্য" নামক একখানা বহুপ্রাচীন অপ্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, যে লঙ্কাসমরে যখন রাবণের আর জয়াশা রহিল না, তখন তিনি তাঁহার পুরস্থিত সমস্ত রমণীগণকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে বহুদূরদেশে প্রেরণ করেন। তাহারা প্রথমে দক্ষিণভারতস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনে (আধুনিক Seringapatamএ) গমন করেন; কিন্তু সেখানেও বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একদল দ্বারকার উত্তরদিকস্থ প্রদেশে যাইয়া বাস করেন এবং অপর দল শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা স্ত্রীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন;—সেই রাজ্যের রাজা, প্রজা, কর্ম্মচারী, সেনানী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোক।

স্ত্রীরাজ্য।—মিশরে স্ত্রীঅভিযান।

এই রাজ্য চল্লিশ যোজন দীর্ঘ, এবং কুলপর্ব্বতের সন্নিকটস্থ সমুদ্রতটে অবস্থিত; রাজ্য জলভূমি অথবা দলদল নামক নিম্নভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্ত্রীরাজ্য বোধ হয় Saba (আধুনিক Assab) রাজ্য। ইহা পুরাকালে বহু

প্রথিতনামা রাজ্ঞীদ্বারা শাসিত হইয়াছে; এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি Taltal নামে খ্যাত। Dobarowa (পুরাতন ভৌগোলিকগণের Coloe) হইতে Tacazze নদীর উৎপত্তিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই বোধ হয় তখন কুল নামে খ্যাত ছিল।

দানবগণ এবং স্ত্রীরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীগণের পরে যবনগণ ভারত হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। যবনগণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মহাকাল-সংহিতায় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব হইতে পুংশক্তিপূজক লিঙ্গজ নামে এক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণকায়, বিকলাঙ্গ এবং বিবিধ রোগযুক্ত। এতৎসঙ্গে পার্ব্বতী যোনিজ নামে সবল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং শুভ্রকায় এক জাতি সৃষ্টি করেন। এই উভয় জাতির মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালে মহাদেব রুষ্ট হইয়া যোনিজ জাতিকে সমূলে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু পার্ব্বতী মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া যোনিজগণকে রক্ষা করেন। মহাদেবের আদেশে তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শঙ্খদ্বীপে যাইতে বাধ্য হয়, এবং তদবধি তাহারা যবন নামে খ্যাত। এই যবনগণ শঙ্খদ্বীপে কোন্ স্থানে বাস করিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

যবনগণের উৎপত্তি এবং ভারত হইতে মিশরে গমন।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন সময়ে বহুজাতি মিশরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাকালে মিশরদেশে ভারতীয় প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, মিশরের অংশ-বিশেষ ভারতবর্ষ নামেই খ্যাত ছিল। নাইল নদী Lytra, Ethiopia এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, প্রাচীন গ্রীকগণের এইরূপ ধারণা ছিল। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক পণ্ডিত Strabo খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, Ethiopia (আফ্রিকার একটী প্রদেশ)-নিবাসিগণ ভারতীয় হিন্দু ছিল। Marco Polo'র সময়ে Abyssiniaকে মধ্যভারতবর্ষ বলা হইত, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে এইরূপ লিখিত আছে। Caspian এবং Euxuine Sea (Black Sea)র মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডকে পুরাকালে ভারতবর্ষ বলা হইত।

পুরাকালে মিশরের অংশবিশেষ ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত ছিল।

পুরাকালে ভারতে ও মিশরে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল অথচ [illegible] জনসমাজে ইহা প্রকাশিত করিলে উপহসনীয় হইবার সম্ভা[illegible]! ভারতের সভ্যতা যে কত প্রাচীন, ভারতীয় কার্য্যক্ষমতা যে প্[illegible] অধিক ছিল, ভারতের জ্ঞান এবং কীর্ত্তিচ্ছ[illegible] পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতি উদ্ভ[illegible] হইয়াছিল, অধঃপতিত ভারতবাসী আজ তাহা চিন্তা করিতেও সাহসী হয় না।

ভারতকীর্ত্তি।

সমাপ্ত।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

কোকিলের প্রতি।

—:•:—

এস,—গো নব অতিথি, গানে
পুলক জাগে প্রাণে ;
কি ব'লে তোমা' ডাকিব ? তুমি
মিশা'য়ে থাক গানে !

ঘাসের 'পরে পড়িয়া শুনি
গায়িছ কুহু-সুরে ;
সুরের তীর আকাশে ফিরে,
এই যে কাছে—দূরে !

এস গো এস মাধব-সখা,
আজিও তুমি গানে,
পাখী তো নহ, অজীনা শুধু,
পুলক জাগে প্রাণে !

তোমার গানে পড়ি'ছে মনে
সুদূর কথা যত ;
আকাশে কবে খুঁজেছি তোমা
ফুলের ঝোঁপে কত !

এখনো তব গানের সাথে
পরাণ উঠে গাহি ;
আনো যা' গেছে সুরের তব
কনক-তরী বাহি !

হরষভরা তোমার গানে
কঠিন ধরা-মাঝে,
হাল্‌কা বায়ে রঙীন নেশা
পরীর বীণা বাজে।

শ্রীরঘুকুমার ঘোষ রায়।

সাহিত্যসূর্য্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

—•:•:•—

বঙ্গে কালের ভেরী বাজিয়াছে। আমাদের সাজানো বাগান শুকাইয়া যাইতেছে। হঠাৎ শুনিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই। নাই! শুনিয়া বিশ্বাস হইল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম; আবার সেই উত্তর শুনিলাম। দু'দিন আগে সেই দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছি। সেই প্রকৃত পুরুষ—সেই গাম্ভীর্য্যে অটল, জ্ঞানে অতল, বাক্যে সরল! সেই বরবপুশ্মশান-শয্যায়!

বিশ্ব-পাথারের এ লহরীলীলায়—এই জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মহাপ্রকৃতির এই উদয় এবং বিলয়, ইহার ভিতরে কি অনুচ্চারিত মন্ত্র আছে,—কে জানে! দিন যায় আবার আসে, সূর্য্য ডুবে আবার উঠে এবং বর্ষান্তে আবার বর্ষারম্ভ। কিন্তু মাইকেল গিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র গিয়াছেন, আর আসেন নাই। গিরিশচন্দ্র গিয়াছেন, আর আসিবেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল গিয়াছেন, আর আসিবেন না। নদীর ঢেউ এবং মানবজীবন দুই যায় আর যায় আর যায়—আর ফিরে না।

কিন্তু এমন জীবন আমরা ক'টা পাই? আজ এই শোকের দিনে তাঁহার সমালোচনা করিতে চাই না—কিন্তু দু'টো গুণগাথা ত বলিতে হইবে।

তিনি চিরদিন সরল ছিলেন। মুখে বিনয় প্রকাশ করিয়া অনেকে আপনার ভিতরকার কুটিলতাকে চাপা দেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সে দলের বাহিরে। পৃথিবীতে খোলাখুলি সারল্য কাহারও 'মনের মত' নয়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালকেও অনেকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার মুখের কথা মনের কথারই প্রতিধ্বনি। এই অন্যত্র-দুর্লভ সরলতা তাঁহার কাব্যে ও ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। তাঁহার কবিতার কোথাও কুয়াশার আবছায়া নাই। তিনি যা বলিয়াছেন, সব সোজাসুজি সরল ভাষায়।

যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি তাঁহার ব্যবহারে পুলকিত হইয়া ফিরিয়াছি। কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি সম্মানে এবং কি বয়সে—সকল দিকেই তিনি আমাদের অপেক্ষা কত বড়! কিন্তু তাঁহার সদালাপে, তাঁহার ব্যবহারে এবং

তাঁহার হাস্য-পরিহাসে আমাদের উভয়ের এই প্রভেদ একেবারে বুঝিতে পারিতাম না,—তিনি যেন আমাদের সমকক্ষ ও সমানবয়সী।

তাঁহার ভাষায় বজ্রাদপি কাঠিন্য ছিল। তিনি যে অবল বাঙ্গালীর ভিতরে একজন সবল পুরুষ ছিলেন, তাঁহার ভাষা তাহার প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোমল হইতেও কোমল ছিল। বিরুদ্ধ সমালোচনায় তিনি বালকের মত কাতর হইতেন। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকের ভূমিকায় তাহার প্রমাণ আছে। ইহা তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা সপ্রমাণ করে।

বাঙ্গালা ভাষা চিরদিন পরাধীনের ভাষা। বাঙ্গালা চিরদিন কোমলকান্ত পদাবলীতে, রমণীর মত আধফোটা কথায় পিরীতের গান গাহিয়া আসিয়াছে। এখানে শ্যামের বাঁশী বাজাইয়াছেন অনেকে, কিন্তু ধূর্জ্জটীর বিষাণের ঘোর নির্ঘোষ বড় কোথাও শুনি নাই। এত পেলব ভাষা,—যে রাগ জাহির করিতে গেলে হিন্দুস্থানী ভাষার শরণ লইতে হয়। 'বন্দে মাতরং' মন্ত্র ভাল জমিত কি না জানি না, যদি তাহা সংস্কৃত-মিশালী না হইত। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন,—

"রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতস্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্য-প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ-কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী!
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাঙ্গালা ভাষায় ভাবের উত্তেজনা অনেক পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে শব্দের উত্তেজনা কোথায়? মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের এই গুণ কতকটা ছিল বটে। কিন্তু যথার্থভাবে ইহা প্রচলনের চেষ্টা করেন বিবেকানন্দ এবং প্রচলিত করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সত্য, তাঁহার ভাষার শব্দোচ্ছ্বাস যেন সিংহনাদ-গম্ভীর। বাঙ্গালা শব্দে যে এমন পুরুষত্বজ্ঞাপক মহামহিমা আছে, আগে তাহা বুঝি নাই।

প্রতিভার লক্ষণ, নূতনত্ব। এই নূতনত্বে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসীম। বাঙ্গালী প্রাণখোলা নির্ম্মল হাসির স্বাদ বড় পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-

নাথ সে অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিছক হাসি দ্বিজেন্দ্রলালে যেমন পাই, তেমন আর কোথাও না। অনেকে অমৃতলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা করেন। কিন্তু অমৃতলালের কারবার সাধারণতঃ Broad humour লইয়া। দ্বিজেন্দ্রলাল Quit humourএর রাজা।

একতান-সঙ্গীত (Chorus) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাপ্রসাদে যেমন ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। তাহার উপর এই সঙ্গীতের সুর। বাঙ্গালায় উত্তেজনার সুর কখনও শুনি নাই। এদেশী গানের সুরে ভাবাভিরাম হৃদয়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি আছে, এ কথা মানি। কিন্তু বিশ্ববিসারী কর্ম্মক্ষেত্রে এক সাধনাযুক্ত অসংখ্য মানবের সুমহৎ বীরত্ব রাগ, প্রতীচ্যে যেমন জমাট এখানে তেমন নয়। স্বাধীন দেশেই উত্তেজনার ঐক্যতান আছে —সংগ্রাম-সঙ্গীত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সুর প্রথমে আমাদের শুনান।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের আধুনিক নাট্যসাহিত্য সাংঘাতিকরূপে আহত হয়, তাহার আদর্শ ভাঙ্গিয়া প্রায় চুরমার হয়। আমরা তখন আশাভরা প্রাণে দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাঁহার নাটকের গুণাগুণের কথা তুলিব না—কিন্তু তাঁহার সমকক্ষ জীবিত নাটককার এখন আর কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যও বুঝি শ্মশানে শয্যা বিছাইল!

সাহিত্যের পবিত্রতা-রক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি স্বয়ং এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন,—অপরকেও চেষ্টা করিতে মিনতি করিয়াছেন। কারণ, সাহিত্যের প্রাণ-পদার্থ,—পবিত্রতা।

ভণ্ডামি সমাজবিধ্বংসী। এই ভণ্ডামিতে বাঙ্গালা যায়-যায়। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ভণ্ড, সাধু ভণ্ড, দেশনায়ক ভণ্ড, সমাজপতি ভণ্ড, —আর সাহিত্যে ত ভণ্ডামির চূড়ান্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল বরাবর এই ভণ্ডামির বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন।

"মিত্র হোক—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বারা শত্রু সে ;—আবার তোরা মানুষ হ।"

"ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থকার" চণ্ডীচরণ এক ভণ্ড—লাগাও তার পিঠে এক চাবুক! স্বদেশহিতব্রত নন্দলাল আর এক বিষম ভণ্ড,—মার তার পিঠে কষিয়া আর

এক চাবুক! উনি সমাজপতি, কোমর বাঁধিয়া সকলকে একঘরে করিতে সদা আগুয়ান,—ওঁর পিঠেও দাও এক ঘা! এমনই চাবুকের 'চোটে' সবাইকে শায়েস্তা করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারী মজবুত ছিলেন। নন্দলাল আর চণ্ডীচরণেরা এখন আশ্বস্ত হউন। দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই!

সাহিত্য-সভায় অনেক দিন হইতেই তিনি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আগে তাঁহাকে এমন করিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি নাই। সহসা একদিন দেখিলাম, সভার মাঝখানে তিনি একাকী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। সেইদিন হইতে সকলে তাঁহাকে চিনিয়া রাখিল। এমন আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার প্রতিভা অতি অল্প লোকেরই আছে। এইজন্য অনেকে তাঁহার সঙ্গে ধূমকেতুর তুলনা করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ তুলনা ঠিক নয়। কারণ ধূমকেতু ছদিনের তরে উঠে, আলো বিলায়, আবার ডুবিয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছদিনের জন্য ত আসেন নাই। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার আলো যে কালজয়ী!

দ্বিজেন্দ্রলাল একদর্শী ছিলেন না। নিজে বিলাত-ফেরৎ হইয়াও তিনি কখনও বিলাত-ফেরৎদের সাহেবীয়ানাকে ক্ষমা করেন নাই। তিনি জানিতেন, বাঙ্গালার সন্তান হইয়া যে বাঙ্গালাকে ভুলে, সে মার্জ্জনার অযোগ্য। তাঁহার নিজের প্রাত্যহিক পোষাক-পরিচ্ছদেও বিলাতী গন্ধ ছিল না। কতদিন দেখিয়াছি একটী আধময়লা ফ্লানেলের সার্ট ও পায়ে চটি জুতা পরিয়া তিনি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছেন। দেখা হইলে রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িতেন এবং সহাস্যবদনে কত কথা কহিতেন। মৃত্যুর মাসখানেক আগে যখন তাঁহার শরীর একান্ত অপটু, তখন একদিন এমনই রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথায় কথায় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু তাঁহার চৈতন্য নাই। অবশেষে আমিই লজ্জিত হইয়া আগে বিদায় লইয়াছি। তাঁহার সেদিনকার মূর্ত্তি, এখনও আমার মনে পড়িতেছে,—আর কান্না আসিতেছে। তখন কি জানিতাম, তিনি এমন করিয়া আমাদের ফাঁকি দিয়া যাইবেন! জানিলে কি অমনই এক ঘণ্টার ভিতরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম? তাঁহার সঙ্গে আরও—আরও কথা কহিতাম, তাঁহাকে ঠায় দাঁড় করাইয়া রাখিতাম,—তিনি যাইতে চাহিলেও যাইতে দিতাম না।

কিন্তু তিনি গিয়াছেন। যে যাবার সে হাসিতে হাসিতে যায়। যে যায় না, যাইতে পারে না, সে কাঁদিতে বাঁচিয়া থাকে। তিনি "মহাসিন্ধু"র ওপারের সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছেন। তিনি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছেন—পরের কাছে, পরবাসে, কারাগৃহে বদ্ধ থাকিয়া তাঁহার আত্মা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গজননীর কাছে নিবেদন করিয়াছিলেন :—

"ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।"

ভগবান, তাঁহার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন।

জন্মভূমিকে তিনি কি ভালবাসাটাই বাসিতেন! এ দেশ ধনধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরার সকল দেশের সেরা—এ দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-তারা আর কোথাও এমন উজ্জ্বল নয়। এখানে যেমন ধানের উপরে ঢেউ খেলে, এখানে যেমন মেঘের বাহার, এখানকার নদীর জল যেমন স্নিগ্ধ, এখানকার পাখীর গান যেমন ঘুমপাড়ানো আবার ঘুমভাঙ্গানো, এখানে মা যত ভালবাসেন, ভাই যেমন স্নেহ করেন, তেমন আর কোথাও না—আর কোথাও না। অতএব বলিতেছেন :—

"যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি,—
করো না করো না তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান্ ;
ওই আরাবল্লী, তুঙ্গ হিমগিরি—
করো না করো না তার অপমান!
নাই কি চিতোর নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান!
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা হস্তিনা ?
করো না করো না তার অপমান!"

কে আছে আর এমন গান শুনাইতে? কোন্ কবি ঘুমন্ত প্রাণকে এমন করিয়া জাগাইয়া তুলিবেন? দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর প্রাণের দুলাল! তোমার স্বর্গ, তোমার সাধনা, তোমার দেবী, তোমার "সকল দেশের রাণী"কে কাঁদাইয়া,—তোমার পুত্র, কন্যা, ভ্রাতাকে কাঁদাইয়া,—তোমার বন্ধু-বান্ধবকে কাঁদাইয়া,—আর তোমার সাধের বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া তুমি গেলে,—কিন্তু তোমার বিজয়ভেরী কাহার হাতে দিয়া গেলে? আর কে তেমন করিয়া বাজাইবে?—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমারি দেশ।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ঘাটে।

সখি—গুরুজনে গিয়ে ব'লো,
অভাগী রাধার গায়ে বড় জ্বালা তাই ঘাটেতেই র'লো।
পাখী ফিরে নীড়ে ঐ ঝাঁকে ঝাঁকে
উঠিয়াছে চাঁদ তমালের ফাঁকে,
গৃহে গৃহে দীপ করে টিপ টিপ যদিও সন্ধ্যা হ'লো,
যমুনার জলে আজি র'লো রাধা গুরুজনে গিয়ে ব'লো।

সখি—এখন কি ফিরা যায়?
পথ নির্জ্জন ফিরেছে গোধন ধূলি উড়াইয়া পায়।
কেহ নাই পথে ঘাটে নদীতীরে
ব্রজে যারা ছিল গেছে তারা ফিরে,
পাটনীও খেয়া করেছে বন্ধ, ফেলি এত সুবিধায়,
ছেড়ে জনহীন সাঁজের যমুনা এখন কি ফিরা যায়?

সখি—কেন কৌতুক-হাসি?
শুনিছ না কাছে কদমতলাতে মুহুর্মুহু বাজে বাঁশী?

ঘাটের কাজটি তোমাদের মত,
আমার ত সখি সোজা নহে অত,
ছাড়াতে যে হবে চুলে আর হায়ে গলায় লেগেছে ফাঁসী,
কলস ভরা কি হয় তাড়াতাড়ি কেন কৌতুকহাসি!

সখি—বড় জ্বালা দেহময়!
ব'লো গুরুজনে আজিকে রাধার কি জানি কিই বা হয়?
চাহিয়া চাহিয়া নীপ তরুপানে,
ভরি' লয়ে প্রাণ মুরলীর তানে,
একগলা জলে আছি সখি, বাকী একটু বই ত নয়!
ব'লো ফিরে এসে গৃহে গুরুজন বেশী কিছু যদি কয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

দার্শনিকের প্রতি।

বিশ্ব হেরিবারে চাও বালুকা-কণায়,
অমরা-অমল-কান্তি কান্তার-কুসুমে;
অনন্তে কি নিতে পার হাতের মুঠায়,
মহাকালে ঢুলাইতে মুহূর্ত্তের ঘুমে?
সত্য ও স্বপন দিয়া ছবি আঁকে কবি—
সত্যের সুষমাটুকু স্বপনে ফুটা'তে,
ভকতেরে ভগবান-চরণে লুটা'তে,
উঠা'তে ধরণী-উর্দ্ধে হোতা-হৃদি-হবিঃ!
তুমি কি করি'ছ বিশ্বে?—রচি'ছ বুদ্বুদ্!
তোমারি ত' 'মায়া'-'ছায়া'-'অবস্তু'-'আলেয়া'!
হো'ক না তা' যত বড়—যতই অদ্ভুদ্,
তা' ল'য়ে কি ভব-পারে দিতে পার খেয়া?
তোমার বুদ্বুদ্ ভাঙি' দিবে ভব লোক,
তুমি ত 'অসৎ' হ'বে—কে করিবে শোক?

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

আফ্‌গান-উপকথা।

—•:•:•—

[ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বান্নু একটি ইংরাজাধিকৃত স্থান। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাব যখন বিজিত ও ব্রিটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ড্যালহাউসীর সর্ব্বগ্রাসিনী সাম্রাজ্যবিস্তারনীতি এই ক্ষুদ্র আফগান প্রদেশেটিরও স্বাধীনতার বিলোপসাধন করিয়াছিল। সেই সময় ইহাকে পঞ্জাবের অন্যতম বিভাগ ডেরা ইসমাইল খাঁর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখনও তাহাই আছে কিন্তু এখন এই ডেরা এবং কয়েকটি স্থান লইয়া সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। আফগান মুসলমানই বান্নুর প্রধান অধিবাসী। যদিও সীমান্ত-জাতিসুলভ লুণ্ঠনপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ হইতে ইহারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তবুও আফ্রিদীদিগের ন্যায় ইহাদিগকে অসভ্য বা পূর্ব্ব সীমান্তবাসী নাগা খাসিয়া প্রভৃতি জাতির ন্যায় অর্দ্ধসভ্যও বলা যায় না। পরন্তু ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহাদের যেরূপ নিজেদের সুব্যবস্থিত শাসনপ্রণালী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিবাণিজ্যাদি ছিল, তাহাতে এই 'বান্নুচি'দিগকে কোন অনুন্নত সভ্য জাতি হইতে হীন বলিয়া মনে হয় না। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বান্নু হইতে একটি ফুটবলপার্টি বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে ম্যাচ খেলিতে আসিয়াছিল। কলিকাতায় তখন ছেলে ধরার হুজুগ; এই নিরীহ বৈদেশিক খেলোয়ারগণকেই লোকে ছেলেধরা মনে করিয়া কলিকাতার রাস্তার এমন উত্তমমধ্যম প্রহার দিয়াছিল যে, তাহাদের অনেককেই হাঁস-পাতালে যাইতে হইয়াছিল। ইহারা যখন কৃষ্ণনগরে খেলিতে গিয়াছিল, তখন তাহাদের সহিত আমার আলাপের সুযোগ হয়। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাদিগকে বেশ সুসভ্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। পরে পুস্তকে তাহাদের বিবরণ পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধ-মূল হইয়াছে। তাহাদের রুচি যে কিরূপ সভ্যজনোচিত তাহা তাহাদের একটি মন্তব্য হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালীজাতি-সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ ধারণা হইয়াছে আমি তাহাদের একজনকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে অন্যান্য বিষয়ে আমাদের অনেক প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিল, 'বাঙ্গালী মেয়েদের কাপড় পড়ার ধরণটা আমাদের বড় ভাল লাগে না। অঙ্গাবরণ হিসাবে ইহা যেন অনেকটা অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।' একথা যে কতদূর সত্য তাহা কি আমরা জানি না?

এই বান্নুচিদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি উপকথা 'অর্ঘ্যে'র পাঠকবর্গকে উপহার দিব। এই সকল উপকথায় যে তাহাদের জাতিগত বিশেষত্ব কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।]

১। শঠে শাঠ্যম্।

সহর হইতে অনেক দূরে একটি জনবিরল গ্রামে দুই ভাই একত্র বাস করিত। বড় ভাই তাগা খাঁ খুব চালাক, কিন্তু ছোটটি বড়ই নির্ব্বোধ।

একদিন তাগা খাঁ তাহার ভাইকে একটি ছাগল দিয়া বলিল,—এটা বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া এস। এইরূপ একটা বড় রকমের কাজের ভার তাহার উপর অর্পিত হওয়ায় মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়া সে চলিয়া গেল।

বাজার সেখান থেকে অনেক দূর। যখন সে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তখন একজন লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ঐ অস্থি-চর্ম্মসার কুকুরটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?' ইহা শুনিয়া সে তাহার অজ্ঞতার জন্য ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—'দূর মূর্খ এটা যে কুকুর নয় ছাগল, তাও কি তুমি জান না?' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে সে একজন কৃষককে দেখিতে পাইল। এই কৃষকও তাহাকে উক্তরূপ প্রশ্ন করিল; তাগার ভাইও পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল, কিন্তু এবার একটু গম্ভীর ভাবে। আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর একটা লোক তাহাকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করিল। এবার তাহার মনে সন্দেহের উদয় আসিয়া পড়িল। সে একবার ভাল করিয়া ছাগলটার দিকে তাকাইল; তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—'মহাশয়, এটিকে কুকুর বলিতেছেন কেন? এটা কি ছাগল নয়?' সে আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু সে একটু দূর যায় আর একজন করিয়া লোক তাহাকে ঐ কুকুর-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকে। অবশেষে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সে যে জন্তুটিকে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছে, তাহা ছাগল নহে, একটা কঙ্কালমাত্রসার কুকুর। সুতরাং তাহাকে সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া তাহার ভ্রাতা তাহাকে যে ছাগল বলিয়া একটা মড়াখেকো কুকুর বিক্রয় করিতে দিয়াছিল এইজন্য তাহার প্রতি খুব ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন যে কয়জন লোক তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিতেছিল, তাহারা ছয়টি ভাই, এবং তাহারা ছয়জনে মিলিয়া জুয়াচোরের ব্যবসায় করিত। তাগা খাঁর নির্ব্বোধ ভ্রাতাকে ঠকাইয়া লইয়া মহানন্দে তাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

তাগা খাঁ যখন ভ্রাতার নিকট সমস্ত শুনিল, তখন সে যে জুয়াচোরদের পাল্লায় পড়িয়াছিল, তাহা আর বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। সে তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে একটি শীর্ণকায় গর্দ্দভ বহুমূল্যসাজে সজ্জিত করিল, এবং তদুপরি আরোহণ করিয়া বাজারের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই জুয়াচোরের দল তাহাকেও একে একে জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে গাধাটাকে ঐরূপ সাজাইয়াছে। তাগা খাঁ তদুত্তরে প্রত্যেককেই বলিল,—এই জন্তু গর্দ্দভ নহে, ইহা বৌচাকি।

বৌচাকি আবার কিরূপ জানোয়ার তাহা জিজ্ঞাসা করায় তাগা খাঁ বলিল,—এই জন্তু একশত বৎসর বাঁচে, আর প্রতিদিন সকালে বিষ্ঠার সহিত একখণ্ড স্বর্ণ দান করে।

তাগা খাঁ ইচ্ছা করিয়াই এরূপ সময়ে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল যে, সে যখন ষষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সে লোকটা যখন সেই অদ্ভুত বৌচাকির অলৌকিক গুণের কথা শুনিল, তখন তাহার আতিথ্যবুদ্ধি সহসা সজাগ হইয়া উঠিল। সে তাগা খাঁকে সেই রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সে স্বীকৃত হইল। সকালে গর্দ্দভের বিষ্ঠা হইতে স্বর্ণখণ্ড বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে তাগা খাঁ রাত্রিতে এক সময়ে সকলের অলক্ষিতে সেই সোণা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছিল।

তাগা খাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে বেশী বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া বাজারে না গিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। কয়েক দিবস পরে সেই জুয়াচোরের দল তাহার বাড়ীতে আসিল এবং পাঁচ শত টাকায় সেই বৌচাকি কিনিতে চাহিল। তাগা খাঁ একটু বাহ্যিক দর কষাকষি করিয়া অবশেষে ঐ মূল্যে গর্দ্দভটাকে বিক্রয় করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে তাগা খাঁ তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'দেখ, দু'একদিন পরেই উহারা পুনরায় আসিবে; কারণ তাহারা বিষ্ঠার সহিত সোণা পাইবে না। তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই আমি বাড়ী থেকে বাহির হইয়া যাইব। তুমি তাহাদিগকে বলিবে যে, আমি দূরে কোন স্থানে গিয়াছি। তার পরে আমাদের যে দুটো খরগোস আছে, উহাদের মধ্যে একটিকে ছাড়িয়া দিয়া

আমাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে।' তাহার স্ত্রী স্বামীর কথামত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল।

দুই দিন পরে যখন তাগা খাঁ খবর পাইল যে তাহারা আসিতেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি একটি খরগোস লইয়া নিকটে কোন স্থানে চলিয়া গেল।

জুয়াচোরের দল আসিয়া তাগার সন্ধান করিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী বলিল,—'তিনি আজ প্রত্যুষে মাছ ধরিতে গিয়াছেন। আমি তাঁকে ডাকাইয়া আনিতেছি।' এই বলিয়া সে খরগোসটি লইয়া ছাড়িয়া দিল, আর উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'যা, শীগ্‌গির গিয়ে কর্ত্তাকে ডেকে আন্।'

ঘণ্টাখানেক পরে তাগা আসিল, তাহার হাতে খরগোস।

প্রবঞ্চকের দল অবাক হইয়া এতক্ষণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহারা যে কারণে আসিয়াছিল তাহা প্রায় একরকম ভুলিয়া গেল। দলপতি তাগা খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এই খরগোসটা তোমাকে ডাকিয়া আনিল না কি?'

তাগা বলিল, 'তা নয় ত কি?'

তাহাদের মধ্যে তখন চুপি চুপি কি কথা হইল। তারপর তাহারা সেই খরগোসটি তাগা খাঁর নিকট হইতে পাঁচশত টাকায় কিনিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে তাগা খাঁ তাহার স্ত্রীকে বলিল,—'বুঝিতেই পারিতেছ, উহারা আবার ফিরিয়া আসিবে। তখন আমি যাহা করিব, তাহাতে ভয় পাইও না।' এই বলিয়া একটি যষ্টি লইয়া তাহা লাল ও সবুজ রঙ্গে চিত্রিত করিল।

দুই একদিন পরেই তাগা সংবাদ পাইল যে, তাহারা আসিতেছে। সে তখন গৃহের এক নিভৃত স্থানে একটি ছাগল হত্যা করিল, এবং স্ত্রীকে কি কি করিতে হইবে তাহা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

তাহারা আসিয়াই তাগাকে শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিতে লাগিল, এবং তাহারা দুইবারে যে হাজার টাকা তাহাকে দিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া দিতে বলিল। তাগা উত্তর করিল,—'আচ্ছা, আমার বৌচাকি ও খরগোস ফিরাইয়া দাও, আমিও তোমাদের টাকা দিতেছি।'

উভয়পক্ষে এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, এমন সময়ে তাগা তাহার স্ত্রীকে এক ছিলিম তামাক আনিতে বলিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী কোন উত্তরও দিল না, কিম্বা তামাকও আনিল না। তখন সে যেন মহাক্রোধে বাড়ীর ভিতর গিয়া সকলকে খুব গালি দিতে লাগিল এবং পাশেরই যে ঘরে তাহার স্ত্রী ছিল ছুটিয়া সেই ঘরে গেল। তার পরেই একটা করুণ আর্ত্তস্বর উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে এক হাতে একখানি রক্তাক্ত ছোরা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, অপর হাতে রক্তাক্তকলেবরা মৃতকল্পা স্ত্রীকে টানিয়া যে ঘরে প্রবঞ্চকদল বসিয়াছিল সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিজেরও সর্ব্বাঙ্গে রক্ত। তখন সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—'গত শুক্রবারে একবার তোকে খুন করিয়া বাঁচাইয়াছি। কিন্তু এবার আর তোকে শীঘ্র বাঁচাইতেছি না।'

আগন্তুকগণ এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড দেখিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল; তাহাদের কাহারও মুখে একটি কথাও ছিল না। এইরূপে কয়েক মিনিট কাটিলে, তাহারা দেখিল যে তাগা খাঁর চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছে। তারপর সে বলিল,—'আচ্ছা, তোকে এবারও মাপ করা গেল।' এই বলিয়া সে গৃহকোণ থেকে সেই লাল ও সবুজ রঙ্গে রঞ্জিত যষ্টিটা লইল, এবং একবার 'বিস্‌মোল্লা' বলিয়া লাঠিটা তাহার গলায় ধীরে ধীরে বুলাইল। তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

সেই লাঠির এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া প্রতারকদল বিস্মিত হইল। দলপতি বলিল, 'যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন তোমাকে ৫০০৲ টাকা দিতেছি। ঐ লাঠিটা আমাদের দাও।' তাগা খাঁ সম্মত হইল, তাহারা সেই চিত্রিত লাঠিটা লইয়া চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাহাদের মধ্যে একজন কতকটা ক্রোধবশতঃও বটে, কতকটা সেই লাঠির গুণ পরীক্ষা করিবার মানসেও বটে, তাহার বৃদ্ধা মাতাকে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিল। কিন্তু সে লাঠি আর তাহাদের মৃতা মাতাকে পুনর্জ্জীবিত করিল না।

তখন তাহারা হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইবার ভয়ে যে যেখানে পারিল পলায়ন করিল।

২। মৌনাবলম্বিনী রাজকুমারী।

কোন রাজার এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে সেই কন্যাকে কথা কহাইতে পারিবে, তাহাকেই তিনি কন্যা দান করিবেন ; কিন্তু যদি কেহ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। অনেকেই চেষ্টা করিল, কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হইল না ; তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড রাজকন্যার বিবাহার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমাইতে লাগিল।

অবশেষে এক রাজকুমার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে সেই রাজার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করিলে রাজকুমারীকে সভামধ্যে আনা হইল। রাজকুমার তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শুনুন আমি আপনাদিগকে একটি গল্প বলিব, এবং পরিশেষে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। কোন সময়ে এক সূত্রধর, এক দর্জ্জি, এক স্বর্ণকার ও এক সন্ন্যাসী এই চারিজনে একত্র ভ্রমণে বহির্গত হন। যেখানে রাত্রি হইত সেইখানে তাহারা বিশ্রাম করিত এবং প্রতি প্রহরে একজন করিয়া জাগিয়া থাকিত। একদিন প্রথম প্রহর রাত্রিতে সূত্রধর জাগিয়া আছে, এমন সময়ে সে দেখিল যে, সম্মুখে একখণ্ড কাষ্ঠ পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য সে সেটিকে লইয়া একটি স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিল। সে শয়ন করিলে দর্জ্জির জাগিবার পালা পড়িল। সে তখন কাপড় তৈয়ার করিয়া সেই মূর্ত্তিটিকে পরাইয়া দিল। তৃতীয় প্রহরে স্বর্ণকার তাহাকে অলঙ্কারে ভূষিতা করিল। অতঃপর যখন সন্ন্যাসী জাগিয়া বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা সেই স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেন, তখন তিনি মন্ত্রবলে তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিলেন। এদিকে ভোর হইয়াও আসিল। তখন অন্যান্য সকলেও জাগিয়া উঠিল। তাহাদের সম্মুখে সেই সুন্দরী রমণী দেখিয়া

সকলেই তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল; তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। এখন আপনারা বলুন সেই রমণী কাহার প্রাপ্য?

প্রথমেই একজন বলিয়া উঠিল—"সূত্রধরের, কারণ সেই ত প্রথমে মূর্ত্তি গঠন করে।"

তখন সেই সভাসদ্‌গণের মধ্যে যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল,—সে তাহাই বলিল। অবশেষে একজন বলিল,—"সেই রমণী সন্ন্যাসীর প্রাপ্য, কারণ তিনি তাহার প্রাণ দিয়াছেন।"

রাজকুমারী এতক্ষণ এতই গভীর মনোযোগের সহিত এই উপাখ্যান ও তাহা হইতে উদ্ভূত তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার খেয়াল ছিল না যে, তাঁহাকে মৌনাবলম্বিনী হইয়া থাকিতে হইবে। আর সেই আগন্তুক রাজকুমারও তাঁহার প্রতি এরূপ ঔদাসীন্যের ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, রাজকন্যা বোধ হয় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্যই কুমার আসিয়াছেন। কাজেই যখন উপাখ্যানবর্ণিত রমণী কাহার প্রাপ্য হইবে,—এই প্রশ্নের বিচারে একজন বলিয়া উঠিল যে, সন্ন্যাসীরই তাহার উপর অধিকার, তখন রাজকন্যা মনে মনে এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনিও ঐ উত্তর অনুমোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—"হাঁ ঠিক তাই, রমণী সন্ন্যাসীরই প্রাপ্য।"

রাজকুমার মহানন্দে তখন রাজকন্যার হস্ত ধারণ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

রঙ্গমঞ্চ।

স্বর্গীয় নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন প্রথম নাটকাদি লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "আপনি এদেশের বড় বড় সাহিত্যিকের সহিত দেখা করুন।"

গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"কেন আর, তা হ'লে আপনি খুব শীঘ্রই সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নাম কিন্‌তে পার্‌বেন।"

গিরিশবাবু উত্তর দিলেন, "তার দরকার কি! আমার এক এক বই বেরুলে এক এক রাত্রে হাজার হাজার দর্শক তার অভিনয় দেখে যান। আমার মত প্রচার কা'র ? আমি কেন পরের দ্বারস্থ হতে যা'ব ?"

কথা খাঁটি। বই বাহির করার মুখ্য উদ্দেশ্য,—প্রচার। আর সেই প্রচার রঙ্গালয়ে যত সহজ তত আর কোথায় ? সাধারণ পুস্তকে চিত্রিত চরিত্র দেখিতে গেলে পাঠককে কল্পনাপ্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু রঙ্গালয়ে সেই চরিত্র জীবন্ত রক্তমাংসের দেহ লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্রবের জন্য বিদ্যমান যুগে গিরিশবাবুর মত প্রচার-সৌভাগ্য আর কোন কবি বা লেখকের হয় নাই। যে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রের কোন খোঁজ-খবর রাখে না—সেই চাষাকে চষা-মাঠে দাঁড়াইয়া গায়িতে শুনিয়াছি,—

"ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে
কত্তিছে গোঁ গোঁ—।"

বটগাছের ছায়ায় নরম ঘাসের বিছানায় দেহ এলাইয়া দিয়া, পাচন-বাড়িতে তাল রাখিতে রাখিতে রাখাল-বালক গায়িয়া উঠে—

"হেরিয়ে দুটি আঁখি হৃদয়ে এঁকে রাখি
দিয়েছ প্রাণে ফাঁকি আর কি বাকি আছে বল!"

আবার একসময়ে এই রঙ্গালয়ই দেশে ধর্ম্মজন্য ভক্তির বান ডাকাইয়াছিল এবং এই রঙ্গালয়েরই "সিরাজদ্দৌলা," "মীরকাসিম," "ছত্রপতি" ও "প্রতাপাদিত্য" নূতন জীবন দিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। রবীন্দ্র-

নাথের "রাজা ও রাণী"এই রঙ্গালয়েই অভিনীত হইয়াছিল ও হইতেছে। তাই তাঁহার 'রাজা ও রাণী'র গীতিমালা দেশের মর্ম্মকেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। "রাজা ও রাণী"র গীতিমালার চেয়ে ভাল গান তাঁহার অনেক আছে ; কিন্তু সে গান কেবল শিক্ষিত গায়কের মুখে শুনি। আর 'রাজা ও রাণী'র গান শুনিতে পাই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে,—তা কি শিক্ষিত আর কি অশিক্ষিত।

আমাদের 'রঙ্গালয়ে' দোষ আছে স্বীকার করি, তা বলিয়া উহার গুণের কথা অস্বীকার করিব কেন ? ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, "Be just before you're generous." সুরুচির সূচিবায়ুগ্রস্তগণকে ইহা স্মরণ করিতে বলি। তাহা হইলে দেখিবেন দূর থেকে তাঁহারা যত ভয়ানক মনে করিতেছেন, আমাদের রঙ্গালয় তত ভয়ানক নয়। "The devil is not always as black as he is painted."

আমাদের রঙ্গালয়ে দোষ আছে। কোন্ দেশের রঙ্গালয়ে নাই ? কলিকাতার ইংরাজী রঙ্গালয়গুলিতে মাঝে মাঝে আমি গিয়াছি। সেখানকার সভ্য ও শিক্ষিত নর্ত্তকীদের হাব-ভাব, ধরণ-ধারণ এবং আচার-ব্যবহার আমাদের "অসভ্য ও অশিক্ষিতা (?) নর্ত্তকীদের অপেক্ষা হাজারগুণে আপত্তিকর। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে চুম্বন ও আলিঙ্গন আমাদের দেশে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। Grand Magazineএ একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিলাতের রঙ্গালয়-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা পড়িলে জানা যায় যে, বিলাতী রঙ্গালয়ের ম্যানেজারগণের উদ্দেশ্য একান্ত অসাধু এবং তাহার অভিনেত্রীগণ কুচরিত্রা—তাহারা সতীত্ব কাহাকে বলে জানে না। লেখিকা যে সকল সত্য ঘটনার উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। অভিনেত্রী ক্লেমেন্ট স্কটও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সতীত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, ফ্রান্সের এক রঙ্গালয়ে একটি সুরূপা ও ও যুবতী অভিনেত্রী সম্পূর্ণ নগ্নদেহে নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাই দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে বড় বড় শিল্পী ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। প্যারিসের "Opera Comique"এর Mille Regima Badet যে গ্রীসীয় পোষাক পরিয়া

রঙ্গালয়ে দেখা দেন, তাহার কাছে আমাদের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ হাওয়ার কাপড় হার মানে। এ সকল বীভৎস দৃষ্টান্তেও যদি অবুঝকে বোঝ মানাইতে না পারি, তাহা হইলে বিলাতের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতার জীবনের ঘটনা শুনুন :—"Aspiring and fastidious, a lad of scholarly tastes, ambitions for the Bar he was pitchforked into the society of uneducated, unprovident and drunken actors." তিনি বলিতেছেন :—"These creatures, these wretches, these asses,—we are a vile set." তাঁহার মতে "Garrick a black-guard club; and America was a nation of black-guards." (Diaries of William Charees Maccready : Edited by W. Toynbee.)

ম্যাক্রেডী বিলাতী রঙ্গালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিলেন। "Records of a Stage" ও "Representative Actors" (W. C Russell) প্রভৃতিতে এবং রগার ও ডোনাল্ড্‌সন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোকের উক্তিতে তাঁহার কৃতিত্বের অনেক নিদর্শন দেখিয়াছি। সুতরাং ম্যাক্রেডী সাহেবের কথা কেহ উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

রঙ্গালয়, সেক্‌সপিয়ার ও গ্যারিকের জন্ম দিলেও তৎপ্রতি বিলাতের জনসমাজের ঘৃণা দূর হয় নাই। (Morleyর The Journal of a London Play-goer" দেখ) মিঃ ইংগলবি নাটকলেখক লজের কথা তুলিয়া লিখিয়াছিলেন, লজ কখনও রঙ্গালয় মাড়ান নাই। কিন্তু তিনি অভিনয়ের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন। তাই সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিত।

অবশ্য আমি দোষ দেখাইয়া দোষের সমর্থন করিতেছি না। কিংবা আমি বলিতে চাই না যে, ইয়ুরোপীয় রঙ্গালয়ে সাধু ব্যক্তি নাই। আমি বলিতে চাই—(১) বারবনিতা লইয়া অভিনয় করিলেও আমাদের রঙ্গালয়ের সুরুচি ও সভ্যতা সাহেবী রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেক উন্নত। (২) দোষ থাকিলেও য়ুরোপীয়গণ জাতীয় উন্নতির সহায়ক এবং বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া যেমন রঙ্গালয়ের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তৎপর, আমাদিগেরও তেমনই হওয়া উচিত!

আমরাও যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক ত্রুটী, অনেক

অপূর্ণতা ও অনেক বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পারিব। নতুবা "যাকে দেখ্‌তে পারি না, তার চলন বাঁকা"—এই প্রবাদটী সত্য বলিয়া জানিব। কারণ রঙ্গালয়ের বিরোধিগণের বাক্যে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই—আছে সুধু বালকতা আর সাধুতার মুখসে মুখ ঢাকিবার চেষ্টা।

হাজার চেষ্টাতেও বিলাতী রঙ্গালয়কে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইংরাজ এখন বলে, "Wherever there is a playhouse, the world will go on not amiss."—তেমনই এ দেশেও রঙ্গালয়ের যবনিকার উপরে কেহ বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিতে পারিবেন না; এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

বারান্তরে আমরা "রঙ্গালয়"-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

তিন দর্গা।

(১)

আজ সমরেন্দ্রের বিবাহ। শচীন্দ্র, কে, বোস এস্কোয়্যার, বার-এট-ল তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বন্ধুর বিবাহে শচীন্দ্রকে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে,—নতুবা কথা জন্মিবে। পুরাণ 'সুট্'গুলা পরিয়া এ বিবাহে যাওয়া চলিবে না, তাই শচীন্দ্র এক সাহেবী দোকানে 'অর্ডার' দিয়া এক প্রস্থ সুট তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছেন। ওয়েষ্টকোট, কোট, শার্ট, টাই, সিল্ক সকস্, সকলই মনের মত হইয়াছে, কিন্তু কি আপদ, প্যাণ্টটা যে দেড় ইঞ্চিটাক বেশী লম্বা করিয়া দিয়াছে! সময় নাই, তাই ত কি করা যায়? শচীন্দ্র তাঁহার বড়দিদি অমলার শরণ লইতে চলিল। গিয়া দেখেন, অমলা তখন পিয়ানো টুং টাং করিতেছে। বলিলেন "বড় দি, বড় মুস্কিলে প'ড়েছি; আজ সমরের বিয়ে; না গেলে, তার কাছে লজ্জায় মুখ দেখান যা'বে না; কিন্তু হতভাগা বেটারা প্যাণ্টটা দেড় ইঞ্চিটাক বড় ক'রে পাঠিয়েছে। লক্ষ্মী দিদি, কেটে ছোট ক'রে দেবে?"

অমলা বাদ্য-বাদনে বিরত হইয়া বলিলেন,—"তবেই হয়েছে! আমি কি ক'রে করি? আজ মিস্ ভ্যানডাইক বেলা আড়াইটের সময় আসবেন

বলেছেন. আমার এখনও সুরটা 'প্র্যাকটিস্' হয়নি। তুই বিমলাকে গিয়ে ধ'র্‌গে না, সে এখন কিছু কর্‌ছে না, বোধ হয়।"

শচীন্দ্র অগত্যা মেজদিদি বিমলার সন্ধানে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন বিমলা বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে। এসময়ে শুইয়া কেন? শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেজদি, এ সময়ে শুয়ে যে?"

বিমলা। বড্ড মাথা ধ'রেছে।

শচীন্দ্র। তবে ত দেখ্‌চি তোমাকে দিয়েও হ'বে না।

বিমলা। কি?

শচীন্দ্র তখন প্যাণ্ট-বিভ্রাটের কথা জানাইলেন। শুনিয়া বিমলা কহিলেন, "আচ্ছা, মাথাটা একটু ছেড়ে গেলে ক'রে দেব অখন।"

শচীন্দ্র ভাবিলেন, মেজদি'র মাথাটা যদি না-ই ছাড়ে, 'সেফ সাইডে' থাকা ভাল। গিয়া ছোটদি' নির্ম্মলাকে ধরিলেন। তিনি তখন প্রণয়ীর পত্র পাইয়াছেন, নিরতিশয় অভিনিবেশ-সহকারে তাহা পাঠে ব্যস্ত আছেন, বলিলেন, "তো ছোঁড়ার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, খালি বেগার ধরিস্। আচ্ছা যা' এখন আমি ভারী 'বিজি', যদি সময় পাই ক'রে রেখে দেব।"

শচীন্দ্র কতকটা আশ্বস্ত হইয়া 'কোর্টে' চলিয়া গেলেন। বেলা তখন সাড়ে এগারটা।

(২)

বেলা দ্বিপ্রহরে অমলার "পিয়ানো প্র্যাক্‌টিস" হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, যাই শচী ছোঁড়ার প্যাণ্টটা ঠিক ক'রে দিই গে। শচীন্দ্রের শয়ন-কক্ষে বিবাহে যাইবার পরিচ্ছদগুলি একত্র করা ছিল, তিনি তাহার মধ্য হইতে প্যাণ্টটি বাহির করিয়া লইয়া নিজ কক্ষে আনিলেন। তাহার পর প্যাণ্ট-পাদদ্বয় ঠিক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া বাদ দিয়া আবার নিপুণ-ভাবে সেলাই করিয়া 'টেলার্স আইরণ' দ্বারা ইস্ত্রি করিয়া দিলেন। পরে তাহা পরিষ্কৃতভাবে পাট করিয়া শচীন্দ্রের অন্য পরিচ্ছদের সহিত মিলাইয়া রাখিয়া আসিলেন।

ঘুমাইয়া উঠিয়া বিমলার শিরঃপীড়া দূর হইল। তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি মত শচীন্দ্রের প্যাণ্টটা ঠিক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া নিপুণভাবে সেলাই ও ইস্ত্রি করিয়া রাখিয়া দিলেন।

বেলা সাড়ে চারিটার সময় নির্ম্মলার প্রণয়ীর পত্রের উত্তর-দান সমাপ্ত হইল। তিনি তখন ছোট ভাইটির প্রতি স্নেহবশতঃ প্যাণ্টটি আনিয়া ঠিক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া বেশ পরিপাটীরূপে সেলাই ও 'আইরণ' করিয়া রাখিলেন।

বেলা অনুমান সাড়ে পাঁচটার সময় শচীন্দ্র কোর্ট হইতে ফিরিলেন। মুখখানিতে হাসিভরা। প্রণয়িনীর একখানি প্রেমলিপি পাইয়াছেন, [illegible] একটি মোকদ্দমা তিনি 'উইন'ও করিয়াছেন। সিঁড়িতে নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা। তিনি ইডেন গার্ডেনে সান্ধ্যবিহারে বাহির হইতেছিলেন। কহিলেন, "ওরে ছোঁড়া তোর প্যাণ্টটা ঠিক ক'রে দিয়েছি।"

শচীন্দ্র। থ্যাংক ইউ ছোট্‌দি।

তিনি দুই তিনটি করিয়া সিড়ি'র ধাপ ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। বারান্দায় বিমলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ মেজ দি? মাথা ধরা ছেড়েছে?"

বিমলা। হঁ্যা তোর প্যাণ্টটাও ঠিক ক'রে রেখেছি।

শুনিয়া শচীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষাভিমুখে চলিলেন। অমলা নিজ কক্ষে হইতে হাঁকিলেন, "ওরে ছোঁড়া শুনে যা'। প্যাণ্টটা একবার পরে দেখ। আমি ঠিক দেড় ইঞ্চি বাদ দিয়েছি। এখনও সময় আছে যদি একটু আধটু এদিক-ওদিক হ'য়ে থাকে ঠিক ক'রে দেওয়া যাবে।

শচীন্দ্র। হঁ্যা একবার দেখিগে।

মনের উদ্বেগে সে ইংরেজী প্রথামত 'থ্যাংকস' দিয়া মেজদি ও বড়দির উপকার ঝাড়িয়া ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

'প্যাণ্ট' পরিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির! স্থাণুবৎ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে পাশের বাড়ীতে একটি বালক ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল, পৃথিবী প্রায় গোলাকার, কেবল উত্তর ও দক্ষিণে একটু চাপা।"

শচীন্দ্র শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া বিছানায় 'কাৎ' হইয়া পড়িলেন।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

তাহার প্রেম।

আজি সন্ধ্যায় তা'র কথা হায়,
বার বার মনে আসে ;
নিশিগন্ধার সৌরভে তা'র
নিঃশ্বাস-সুরভি ভাসে !
বিহগ ঢা'লিছে মদির প্রবাহ
নিখিল বাঁশীটি ভরি,
প্রেমের প্রথম বাণী তা'রি সে যে
রেখেছে কণ্ঠে ধরি।
প্রভাত-শিশির কাঁদিছে গো হায়
গোলাপের হৃদি'পরে,
বিদায়ের বেলা অশ্রু-সজল
মুখখানি মনে পড়ে।
নিখিল ভুবনে যত আছে শোভা,
যত আছে হাসি আলো।
তা'র স্মৃতি সবে উঠিছে বিকশি'
তা'র আঁখি দুটি কালো।
নিশিগন্ধার স্বপন মরি গো
টুটিবে প্রভাত-বায় ;
শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকা'বে
গোলাপেরি বুকে হায় !
বসন্ত-শেষে যে সে যাবে হায় !
মুখর পাখীর প্রীতি,
তা'র প্রেম সারা জীবন ভরিয়া
উজ্জ্বল চির স্মৃতি।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

পুরাতনী।

[পুরাতন এমন অনেক কথা আছে যাহাদের প্রয়োগ সময়-বিশেষে আবশ্যক হইয়া পড়ে। পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের অনেক অপ্রসিদ্ধ উপদেশ ও মন্তব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন যুগের সাময়িক পত্রাদিতে লিপিবদ্ধ আছে; সেগুলির প্রকাশ এখনকার দিনে একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে সেইগুলি স্থান পায় নাই বলিয়া সাধারণ পাঠক তাঁহাদের যে সকল মন্তব্য পাঠ করিতে পারে না। অথচ গ্রন্থাবলীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মূল্য যে কম তাহা নহে। "অর্ঘ্যে"র "পুরাতনী"তে আমরা প্রসিদ্ধ লেখকগণের এইরূপ শ্রেণীর অপ্রকাশিত বা অপরিচিত অথচ মূল্যবান এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজন ও সময়োপযোগী রচনাদি মধ্যে মধ্যে বাহির করিব।—"অর্ঘ্য"-সম্পাদক।]

কবি ও সেণ্টিমেণ্ট্যাল।

[লেখক—স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ("সাহিত্য", ২য় বর্ষ ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ)]

একদল লোক কবিতা রচনা করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া ভাষায় তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, মানবের অগাধ হৃদয়ে বসিয়া সেখান হইতে সঙ্গীতে ছন্দে মধুরতায় প্রেমে তাহার গভীর বিচিত্র রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেন, অন্তর বাহিরে আসিয়া ফুটে, বাহির অন্তরে আশ্রয় লাভ করে। আর একদল লোক আকাশে তারা দেখিলেই অর্দ্ধ-নিমীলিত অনিমেষনেত্রে পরম গাম্ভীর্য্যসহকারে সেইদিকে চাহিয়া নিস্পন্দবৎ নীরবে বসিয়া থাকেন, দিগন্তে চন্দ্র উঠিলেই—বোধ করি অন্তরে দারুণ বিরহ অনুভব করিয়া করতলে কপোল-ভার ন্যস্ত করিয়া দেন, আলুথালু শিথিল দেহযষ্টি ছড়াইয়া দিয়া চন্দ্রকরে হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করেন, যথারীতি সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়ান। জামার বোতাম আঁটেন না; কেশবিন্যাসে যথেষ্ট যত্নপূর্ব্বক সমধিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান; সংসার-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার গর্ব্ব করেন এবং অহরহ করকমলে হালফেসানের কাব্যগ্রন্থ লইয়া ফিরেন, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, টীকা করেন, অন্ততঃ সমালোচনা না করিয়া ছাড়েন না। কবিতা রচনাও যে না করেন, এমনও নহে, তাহাতে জ্যোৎস্না থাকে, মলয় থাকে, অনেক শব্দময় কি-যেন-কি এবং বিবিধ অবোধ্য রহস্য অর্থাৎ সুললিত পদবিন্যস্ত অ-ভাবও থাকে এবং এ সকল সত্বেও মতভেদ ঘুচে না. কেহ বলেন ভু-য়ের বাহির এবং কেহ কেহ এমনও বলেন যে, ভাব অতি গভীর বলিয়াই ভাষা একেবারে অর্থহীন দুরায়ত্ত। * * *

কবির অভিনয়ই সেণ্টিমেণ্ট্যালের—প্রধান লক্ষণ। সকলে কিছু আর কবির প্রতিভা লইয়া জন্মে নাই অথচ কবি হইবার সাধ অনেকেরই আছে। সুতরাং আর কিছুতে হউক না হউক কবির ভাবভঙ্গীর একপ্রকার অসঙ্গত অনুকরণ করিয়াই তাঁহাদিগের সাধ মিটাইতে হয়। মৃদু চাহনিতে, অধরের ঈষৎ চাপা হাসিতে, কথাবার্ত্তার ভাবে, দাঁড়াইবার কেতায়, বসিবার

ধরণে, আলস্যে, ঔদাস্যে, যথাসাধ্য কবিয়ানা করা চাহি—সর্ব্বদাই ভয় পাছে লোকে নীরস অকবি ঠাওরাইয়া বসে, পাছে কেহ বলে, লোকটা যথেষ্ট কবি নয়, পৃথিবীর সাধারণ মানবের মত কাজের লোক ঘর-সংসারের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বেশ কাজকর্ম্ম বুঝে। * * কবি হইতে গেলে যেন সাধারণ বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সাধারণ বাহ্যজ্ঞান পরিহার করিতে হইবে সাধারণ সুখ-দুঃখ—বিশেষতঃ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে' আহারে, বিহারে, আচার-ব্যবহারে, ধরণ-ধারণে সৃষ্টিছাড়া না হইলে চলিবে না। এই ভাবিয়া সেণ্টিমেণ্ট্যালেরা কবির সহিত না মিলাইয়া একপদ অগ্রসর হয়েন না—জানি কি কোথায় পদস্খলন হয়, লোকের কাছে প্রতিভা অপ্রতিভ হইবে। * * * ক্ষমতা লইয়াই ত কবির সহিত সেণ্টিমেণ্ট্যালের প্রধান প্রভেদ। একজন সক্ষম এবং প্রবল—আপন দুর্দ্দম্য ক্ষমতায় বিশ্বরহস্য মন্থন করিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ করেন; আর একজন অক্ষম এবং অলস কেবল সখটুকুমাত্র আছে, না আছে কুবেরের ভাণ্ডার, না আছে বিপুল সহিষ্ণুতা, শফরীবৎ আবরণমাত্র অবলম্বন। প্রতিভা সকলের নাই এবং আবশ্যকও নাই, কিন্তু ভাণ কেন! * ** সেণ্টিমেণ্ট্যালেরা কতকটা বোধ করি কবির মো-সাহেবের মত। কিন্তু আপন অবস্থাসম্বন্ধে অজ্ঞ। * * *

কবি ভাবের রাজা—ভাব এবং ভাষা উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। আকাশে চাহিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে, জামার বোতাম না আঁটিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে, কবিত্ব ভাষায় ভাবের বিকাশে। * * * *

সেণ্টিমেণ্ট্যালের মধ্যে একটু ভাণ আছে, কৃত্রিমতা আছে, অন্ততঃ ছটফটানির কিছু আধিক্য। * * * কবিকে কাজ করিতে হয়—প্রভু হইয়া তিনি সেণ্টিমেণ্ট্যালের উপর আধিপত্য করেন। সেণ্টিমেণ্ট্যালেরা প্রভু না হইয়া দাস হইয়া দাঁড়ায়। * * বাঙ্গালার এই অলস সেণ্টিমেণ্ট্যাল দলের না আছে নিষ্ঠা, না আছে উদ্যম, না আছে আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা। কেবল ফাঁকি দিয়া যো সো করিয়া লোকের নিকট আপনাকে সমধিক উন্নত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা।

সত্যের সহিত সেণ্টিমেণ্ট্যালদিগের সম্বন্ধ অল্পই। কবি সত্য অনুভব করিয়া বলেন, এইজন্য তাঁহার কথার এত গুরুত্ব। সেণ্টিমেণ্ট্যালদিগের ভাব-অনুভবও অনেকটা কাল্পনিক। এইজন্য তাহা নির্জ্জীব অনর্থপ্রসূমাত্র। কল্পনা সাহিত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবিতা বাহির হয় না। কল্পনাও যখন কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন রোগের উৎপত্তি সন্দেহ নাই। সেণ্টিমেণ্ট্যালের অবস্থা রোগের—স্বভাবের নহে; বিকারের। কবি প্রকৃতির, সেণ্টিমেণ্ট্যাল বিকৃতির; কবি স্বাধীনতার, সেণ্টিমেণ্ট্যাল উচ্ছৃঙ্খলতার; কবি সরল প্রেমের, সেণ্টিমেণ্ট্যাল রুগ্ন প্রেমাভিনয়ের। †

† যে ঝুটা কবি বা 'সেণ্টিমেণ্ট্যাল' দলের প্রাদুর্ভাবে শঙ্কিত হইয়া স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ২২ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এখনও সে শঙ্কা তিরোহিত হয় নাই

পুস্তক-পরিচয়।

—○*○—

কাহিনী। শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক প্রণীত। প্রকাশক,—শ্রীপাঁচুদাস আদক, ৩ নং চাউলপটী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

পুস্তকখানিতে কতিপয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধা ভারত-মহিলার জীবন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জনের "আর্য্যনারী"-প্রমুখ এই শ্রেণীর পুস্তক আমাদের সাহিত্যে আজিকালি দুই একখানি আছে; "কাহিনী"ও তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদিগের পাঠোপযোগী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিল। 'কাহিনী'র গল্পগুলি যদিও আমাদের অপরিচিত নহে, তবুও লিখন-কৌশলগুণে পুনরায় সেগুলি আমাদিগকে পড়িতে হইয়াছে। নবীন গ্রন্থকার গুরুদাসবাবুর পক্ষে ইহা বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে। ভাষা বেশ মিষ্ট এবং সহজ। আমরা 'অর্ঘ্যে'র প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে এই নবীন গ্রন্থকারের নূতন "কাহিনী" এক একখণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। বলিতে ভুলিয়াছি,—"কাহিনী" সচিত্র। ইহাতে একখানি ত্রিবর্ণে মুদ্রিত মীরা বাইএর চিত্র এবং দুইখানি একবর্ণে মুদ্রিত চিত্র আছে। ছাপা এবং বাঁধাই আরও সুন্দর।

রুষ-জাপান-যুদ্ধের* ইতিহাস (দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ)। শ্রীমতী নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী-প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—

---

* ঝুটা কবিয়ানার অত্যাচার-আব্দার মাসিক সাহিত্যের উপরেই বেশী। কেবল সম্পাদকদিগের উপরে হইলে তত ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু আজকাল পাঠকদিগের উপরেও ইহাদের অত্যাচারের সীমা নাই। সে মেঞ্জালদিগের ঝুটা কবিতার জ্বালায় বাঙ্গালী পাঠকের কান 'ঝালাপালা' হইতেছে। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশানুসারে সেণ্টিমেণ্ট্যালদিগকে চিনিয়া রাখিতে পারিলে আজিকালিকার দিনে আমাদের লাভ বৈ অলাভ নাই। "অর্ঘ্য"-সম্পাদক।

মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বৈদেশিক যুদ্ধের ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেই চলে। ইংরাজী ভাষায় জগতের প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান যুদ্ধেরই ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। এক রুষ-জাপান যুদ্ধের সম্বন্ধেই অনেকগুলি পুস্তক আছে। আধুনিকযুগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইংরাজ স্বাধীন জাতি; সুতরাং তাঁহাদের এই শ্রেণীর গ্রন্থপাঠের যে আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা পরাধীন বাঙ্গালী বটে, কিন্তু এক হিসাবে আমাদের পক্ষেও এরূপ পুস্তক রচনার ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা যে না আছে, এমন নহে। সে প্রয়োজন আমাদের সাহিত্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা। নানা বিষয়ের অনুশীলন না হইলে সাহিত্যের সম্যক পরিপুষ্টি হয় না। সাহিত্যের সকল অঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে দেশীয় ও বিদেশীয় সকল বিষয়ের আলোচনাই আমাদিগকে করিতে হইবে। এ হিসাবে হলদিঘাটের যুদ্ধ,—সিপাহী যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতির বিবরণ যেমন আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য, তেমনই রুষ-জাপান যুদ্ধ, বল্কান-তুরস্ক যুদ্ধ প্রভৃতির বৃত্তান্তও আমাদিগের জানিয়া রাখা আবশ্যক। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ শ্রেণীর পুস্তক-রচনা কখনই নিরর্থক হইবে না; ভবিষ্যবংশীয়েরাও ইহা পাঠে উপকৃত হইতে পারিবে। আনন্দের বিষয় এই যে, আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের সাহিত্যের একাংশের পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং অধিকতর আনন্দের কথা যে, একজন মহিলা এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মেয়ে যে এমন সুন্দর ভাষায় পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছেন, আজ এই গৌরবেই আমাদের বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, রচয়িত্রীর এই সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল করিতে থাকুন।

পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর এবং ন্যূনাধিক ৫০ খানি হাফটোন চিত্রে ইহার কলেবর সুশোভিত। কয়েকখানি মানচিত্রও ইহাতে আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা,—বেশ সুলভ বলিয়াই বোধ হইল। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অক্ষয়-গীতি। *

—০:*:০—

কি গান গাহিব আজি
কি রাগে বা কি ভাষায়।
অক্ষয়-গরিম-গীতি
মর্ত্ত্য-সুরে কি কুলায়॥

সাহিত্যের মূর্ত্তমান,
চিরপূজ্য গরীয়ান,
তার যোগ্য রচি গান,
কি বা পুণ্য সাধনায়।

মরমে মূর্চ্ছনা দিয়ে,
ক'টা কথা তুলে নিয়ে,
রেখে দিনু সাজাইয়ে,
শুধু গীতি-ভঙ্গিমায়—

তাহাতেই অনুরক্তি,
প্রণতি পরমা ভক্তি,
তা' ছাড়া আছে কি শক্তি,
দিতে অর্ঘ্য দেবতায়।

তাঁর কীর্ত্তি বিশ্ব জুড়ে,
সাহিত্যের সৌধ-চূড়ে,
বিজয়-পতাকা উড়ে,
দীপ্ত আত্ম-প্রতিভায়,—

তবু যদি তৃপ্তি চাও,
ভক্তি-মাল্য গলে দাও,
জয়-গান লিখে যাও,
ভক্ত-চিত্ত-নিশানায়॥

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

---

* সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে রচিত ও গীত।

দীমক্রীতস্।

—•:•:•—

আজকাল পরমাণুবাদটা ইউরোপের এক মহাবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা এই বাদটির উপর নির্ভর করিয়া অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনেক বাদের প্রতিষ্ঠা-চেষ্টা করিতেছেন। বিবর্ত্তনবাদ, জড়-বাদ, অজ্ঞেয়-বাদ প্রভৃতি নাস্তিক্য বাদগুলি এই পরমাণুবাদেরই কোন না কোন্ প্রকার রূপান্তরমাত্র। সুতরাং কতদিন হইতে এই মহাবাদটি চিন্তাজগতে স্থান লাভ করিয়াছে এবং কোন্ মহাপুরুষই বা এই মহাবাদের প্রবর্ত্তক, তাহা জানিতে 'অর্ঘ্যে'র অনেক পাঠকই হয়ত কৌতূহল বোধ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই বাদটি লইয়া এক্ষণে যাঁহাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, তাঁহারা স্বয়ং এই বাদের প্রবর্ত্তকের কথা জানিতে যে কতটা উৎসুক, তাহা বলিতে পারি না, কারণ এই বাদটি এক্ষণে ইউরোপের অল্পবিদ্যগণেরও মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছে, এবং তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই এই বাদটির সম্বন্ধে কোন না কোন একটি স্বাধীন মতও আছে, তথাপি এই বাদের প্রবর্ত্তকের নাম তাঁহাদের অনেকেরই মুখে শুনা যায় না; সম্ভবতঃ তাঁহারা তাহা জানেনও না।

এই নিবন্ধ-শীর্ষে যে মহাপুরুষের নাম লিখিত রহিয়াছে, তিনি এই মহাবাদের প্রবর্ত্তক! ইনি খ্রীষ্টের জন্মের সম্ভবতঃ ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে থ্রেসের অন্তর্গত আব্দেরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইনি ধনীর সন্তান ছিলেন; কারণ ইনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েন এবং সেই সম্পত্তি দেশভ্রমণে ও জ্ঞানার্জ্জনেই নিঃশেষিত করিয়া শেষে নিঃস্বাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইউরোপে এই মহাপণ্ডিত ও দার্শনিকের নাম বহুদিন পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতলজলে ডুবিয়া ছিল, শেষে ইংলণ্ডের মহাদার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ইঁহাকে প্লেটো ও আরিষ্টটল অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহার পর তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত বাদটি লইয়া ইউরোপে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু স্বয়ং বাদপ্রবর্ত্তক আবার চাপা পড়িয়া গেলেন। শেষে উনবিংশ শতাব্দীতে টিণ্ড্যাল

নামক এক আইরিস বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে আবার লোকের স্মৃতিপথে আনিলেন। এখন আবার দীমক্রীতস্ বিস্মৃত হইতেছেন, এদিকে কিন্তু ডারউইন, ওয়ালেস, লেসলি ষ্টীফেন, ডাল্‌টন প্রভৃতির নামই লোকমুখে রটিত হইতেছে। দীমক্রীতসের পরমাণুবাদই বর্ত্তমান কালের পরমাণুবাদিগণের পরমাণুবাদ, কিন্তু দীমক্রীতস্ মানবাত্মা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য বর্ত্তমান কালের পরমাণু-বাদীরা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি দীমক্রীতস্ ও এম্পিদোক্লেস পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের পরমাণু-বাদীরাও তদতিরিক্ত তেমন কিছুই বলিতে পারেন নাই।

দীমক্রীতস্ যথন জ্ঞানার্জ্জন করিয়া রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার দেশস্থ লোকেরা তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে তাহাদের শাসনকর্ত্তা করিতে চাহেন; কিন্তু দীমক্রীতস্ সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার স্বীয় তাঁহার শিষ্যদিগকেও তাঁহার সেই মহাচিন্তাগুলির ভাবুক করিতে সচেষ্ট থাকিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একবার এথেন্সে যান, তখন সক্রেটিস্ ও প্লেটো সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত আলাপ না করিয়াই চলিয়া আসেন। তাঁহাদের তর্ক-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বলেন,—যাহারা আপনার কথা আপনিই কাটে, অনেক কথা কয়, তাহারা কোন কিছু ঠিক করিয়া জানিবার অযোগ্য। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, দীমক্রীতস্ যাহাতে মনন দ্বারা সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার চক্ষু-যুগলে তপ্ত কাচ প্রবেশ করাইয়া দিয়া অন্ধ হন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ আমরা জানি, দীমক্রীতস্ চক্ষুকে আত্মার অন্যতম প্রবেশ-পথ মনে করিতেন।

দীমক্রীতসের দার্শনিক জ্ঞান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে জ্ঞান প্রচার পূর্ব্বক লোকের ভূয়সী প্রশংসা-ভাজন হইয়া উঠিতেছেন, সেই জ্ঞানই দীমক্রীতস্ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই জগৎকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই সেই জ্ঞান সম্প্রসারিত হইয়াই আধুনিক এক শ্রেণীর তাত্ত্বিকগণকে তাত্ত্বিক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে

মহাগৌরবের কথা এই যে, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার সেই চিন্তাপথে আর কেহ অগ্রণী ছিলেন না।

(১) কিছু হইতেই কিছু হয়, কিছু না হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। অস্তিত্বের বিনাশ নাই। পরিবর্ত্তনমাত্রই দ্ব্যণুকের সমবায় ও স্বাতন্ত্র্য-জাত। (২) দৈবাৎ কিছু ঘটে না, ঘটনামাত্রেরই মূলে হেতু আছে। জগতে শূন্য ও অণুই সৎ, আর সকলই মত মাত্র। এই কথা-গুলি এখনকার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের উপপাদ্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু দীমক্রীতসই তাঁহাদিগকে এই সুর ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

আত্মা-সম্বন্ধে দীমক্রীতসের এই ধারণা ছিল যে, অগ্নির অণুর মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মসৃণ ও গোলাকার অণুর সমবায়ে আত্মার উদ্ভব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি প্রায় জড়বাদী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার ছিল না, সুতরাং আত্মাকে জড়ের অন্তর্গত করাটা তাঁহার পক্ষে একান্ত দূষণীয় হয় নাই। কারণ তিনি বলিতেন, "মানুষে আত্মাই উৎকৃষ্ট উপাদান, কোন মানুষে যদি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে পশুতুল্য। আধুনিক জড়বাদীরা অনেক জানিয়াও এ কথা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না; "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" চার্ব্বাকের এই ঘৃণিত উক্তিই এখন অনেক জড়বাদীর মতে গৌরবোক্তি।

পৃথিবী নহে, জগৎ যে অনাদি ও অনন্ত,—এ কথাটাও দীমক্রীতসই বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ভারতবাসীর নিকটে নহে, ইউরোপীয়দের কাছে। পঞ্চেন্দ্রিয় মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমাত্রেরই যে মূলে,—এই একটি মহাসত্যও দীমক্রীতসের ঘোষণা। চক্ষু দিয়া যাহা আমরা দেখি, তাহা চক্ষুদ্বারা স্পৃষ্ট হয়; নাসিকা দ্বারা যাহা আমরা ঘ্রাত করি, তাহাতেও প্রথমে স্পর্শ-ক্রিয়া ঘটে; জিহ্বা দ্বারা যাহা আমরা আস্বাদিত করি, তাহাতেও স্পর্শ আছে, ত্বকেরও জ্ঞান যে স্পর্শ জ্ঞান, তাহা বলা বাহুল্য। এই মহাসত্যটিও দীমক্রীতসের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়।

দীমক্রীতসের অন্য সমস্ত দার্শনিক কথা অদার্শনিকের ভাল লাগিবে না সুতরাং তৎসমুদায় সম্বন্ধে কোন কথা বর্ত্তমান নিবন্ধের অন্তর্গত করিলাম না। দীমক্রীতস পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তক, ড্যাল্‌টন তাহার চরম। ইঁহাদের

মধ্যবর্ত্তী সময়ে পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে জ্ঞানের কোন বিকাশ হয় নাই। এখন পরমাণুবাদ যে বাদমাত্র নহে, তাহাতে যে বিলক্ষণ রূপ সত্য আছে, তাহা তড়িৎ বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতেছে। একারণ এই সকল বৈজ্ঞানিকেরা দীমক্রীতস-ড্যাল্টনের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা-প্রকাশ করিয়া থাকেন। দীমক্রীতস ও ড্যাল্টনে পার্থক্য এই,—দীমক্রীতস দার্শনিক ছিলেন, ড্যাল্টন্ কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দীমক্রীতস যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, ড্যাল্টন তাহাই পরীক্ষা-সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জড়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদী প্রভৃতি ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দিহান দার্শনিকেরা কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় বিপ্লব-বহ্নিমালায় ইন্ধন প্রয়োগপূর্ব্বক ফুৎকার-প্রদান করিতেছেন। তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই। ভাঙ্গা গড়াই বিধির বিধান। আজিকালিকার বাদগুলি ঈশ্বর তথা সত্যের সহিত বিবাদ করিতে চাহে, কিন্তু পাবকস্পর্শে যেমন চামীকরের শ্যামিকা ঘুচিয়া যায়, তেমনই এই সমস্ত বাদ-বহ্নি সত্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

মিলন-রজনী।

বরষা-সলিলে নয়ন-সলিল মিশ'য়ে
শূন্য-শয়নে গোঙাব দীর্ঘ নিশা এ,
　　দুর্য্যোগ-ঘোরা সম্ভোগ-ভরা রজনী
　　　　বিরহি-চিত্ত-মজ্জনী!
মিলন-রাগিণী বাজিছে আজি যে পবনে,
প্রেমিক-প্রেমিকা-মিলন ভবনে ভবনে,
　　　　কেন দূরে আজি স্বজনি!
　　এ যে আষাঢ়ের গাঢ় মিলনের রজনী!

ঐ দেখ সখি! সহকার-শাখা বেড়িয়া,
ঐ দেখ সখি! কদম্ব-তরু ঘেরিয়া,
প্রিয়ের বক্ষে প্রেয়সী সোহাগে দুলিছে,
সকল দুঃখ ভুলিছে।

বিশাল বিশ্ব লুপ্ত বিপুল আঁধারে,
এ মধু-মিলনে কোথা নাহি কিছু বাধা রে,
হৃদয়-গ্রন্থি খুলিছে,
সুখ, দুঃখ সব, বৃথা কলরব ভুলিছে।

শ্যামল জলদে নভোমণ্ডল ব্যাপিছে,
গুরু গর্জ্জনে নির্জ্জন ঘর কাঁপিছে,
চমকে চপলা বহ্নি-রসনা-বাহিনী,
বিরহি-চিত্ত-দাহিনী;

নাহি আভরণ, তিমিরাবরণ আকাশে,
গোপন-বার্ত্তা প্রকাশে মত্ত বাতাসে
কত রহস্য-কাহিনী,
আজি সমীরণ বিশ্ব-বেদন-বাহিনী।

মিলনের গান বাজিছে বিমান-বীণাতে,—
বিজয়-শঙ্খ দাদুরী-কণ্ঠে নিনাদে,
কপোত-কপোতী নিভৃত কুলায় মাঝে গো
মিলনের সাজে রাজে গো।

আজি কোন প্রাণী মিলন-বিহীন নাহি রে,
আমি কি কেবল মিলন-ভুবন বাহিরে!
শুধু যে আমারি মাঝে গো,
বিরহ-বিধুর বিলাপের সুর বাজে গো।

পাষাণ-কঠিন দয়া-মায়াহীন হৃদয়ে!
হেন দুর্দ্দিনে কোথা আছ অয়ি নিদয়ে!
বিরহিনী তবু বুঝ না বিরহি-যাতনা?
নাহি কোন সমবেদনা?

মোর মর্ম্মের সর্ব্ব প্রসার ভরিয়া,
রেখেছি তোমার মানসী-মূর্ত্তি ধরিয়া—
এমনি আমার সাধনা,
তবু মোর তরে বাজে না তোমার বেদনা?
বাজে ঘোর রণ গগনে ভুবনে পবনে,
ভৈরব রব পশিছে শ্রান্ত শ্রবণে,
প্রলয়-রজনী বুঝি বা স্বজনি! আসিল,
নিখিল-বিশ্ব গ্রাসিল;
কেন মম মন হ'ল উচাটন হেন রে,
মর্ম্ম-বাঁধন শিথিল হইল যেন রে,
শিয়রে শমন হাসিল!
মিলন-রজনী আসিল, স্বজনি আসিল!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবুল ফজল।

সুপ্রসিদ্ধ "আকবর-ই-নামা"-রচয়িতা আবুল ফজল মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি ছিল, তেমনই রাজনীতিশাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। এই শেষোক্ত গুণই তাঁহার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, যশঃ, খ্যাতি প্রভৃতির কারণ। ইঁহারই অসামান্য রাজনীতিক বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে আকবরের শাসন সমগ্র ভারতময় ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মতের সবিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

যে সমস্ত রাজকীয় গুণের জন্য আজ আকবর আদর্শস্থানীয় সম্রাট, তাঁহার চরিত্রে সকলের গুণের সমাবেশ করিয়াছিলেন স্বয়ং আবুল-ফজল। উল্লিখিত কথা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। না চাহিবার প্রধান কারণ এই যে, আবুলফজল-কৃত "আকবর-ই-নামা"য় তাঁহার স্বীয় কার্য্য-

কলাপের উক্তি নাই। না থাকিবারই ত কথা! আবুলফজল অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতানুমোদিত "আপন ঢাক আপনি বাজাইবার" প্রথা একেবারেই জানিতেন না। বিশেষতঃ তিনি সম্রাট আকবরের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন। আপনার কৃতিত্ব লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া প্রভুর গৌরব বৃদ্ধি করাই প্রকৃত ভৃত্যের কর্ত্তব্য। আবুল ফজল তাই মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, প্রভু আকবরের নাম তাহার শীর্ষস্থানে সংযোগ করিয়াছেন। আবুলফজল এস্থলে প্রাচ্য-জন-সুলভ শিষ্টাচার ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

আবুল ফজল পর্ণকুটীরবাসী ছিন্নবসনপরিহিত একজন দরিদ্র যুবক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আকবর তাঁহাকে পর্ণকুটীর হইতে হস্তে ধরিয়া শ্বেত-মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তা-খচিত রাজ-সিংহাসনের পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। জগতে কে এমন অকৃতজ্ঞ আছে যে, এমন প্রভুর সেবায় জীবন-মন সমর্পণ না করে? কাজেই কৃতজ্ঞতা-উদ্বেলিতহৃদয়ে আত্মখ্যাতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবুল ফজল তৎপ্রণীত "আকবর-ই-নামা"য় কেবল যে আকবরেরই গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

মাত্র ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়সে আবুল ফজল সম্রাট আকবরের দরবারে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতা একজন ধর্ম্মতত্ত্বপরায়ণ, জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি মুসলমান ফকিরের ন্যায় নিষ্কাম জীবন যাপন করিতেন; এজন্য সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নেত্রে দেখিত। আকবর আবুলফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজীকে তাঁহার দরবারে স্থান দান করিবার কয়েক বৎসর পরেই ফৈজীর মুখে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অসাধারণ প্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া আবুলকেও তদীয় দরবারে স্থান দান করেন।

---

* প্রসিদ্ধ East and West পত্রিকায় প্রকাশিত Abul fazl নামক প্রবন্ধ-অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

আবুল ফজল-কৃত "আকবরই নামা" যে নিরপেক্ষ পুস্তক এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। আবুল ফজলের সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা রাজকীয় শাসন-শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া সত্যের দ্বার সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে কখনই পারেন নাই, একথার সাক্ষ্য জগতের ইতিহাস দিতেছে। কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক নির্ভয়ে এ পর্য্যন্ত রাজার প্রতিকূলে কিছু লিখিতে সাহস করেন নাই এবং করিতেও পারেন না। কাজেই আবুল ফজলের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদৌনির কথা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাট্ আকবরের দরবারে সর্ব্বদা কতকগুলি "মুস্তাহিদ্" নামে গোঁড়া মুসলমান থাকিত। তাহারা আকবরের উপর বড়ই প্রভুত্ব প্রদর্শন করিত। তাহারা বলিত, ধর্ম্মের সহিত শাসনের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কাজেই আকবরকে তাহারা কোন মতেই স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে দিত না। আকবর এই সমস্ত অযাচিত উপদেষ্টার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য একদিন আবুল ফজলের পিতা সেখ মবারককে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তিনি যথেচ্ছাচারী মুস্তাহিদ্‌দের জ্বালায় বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মবারক আকবরের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সম্রাট্ স্বয়ংই ত আল্লার প্রতিনিধি। সম্রাট্ যে কোন বিচার কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া করিতে পারেন।" আকবর মবারকের কথায় বড় প্রীত হইলেন। তখন তাঁহার অনুরোধে মবারক কোরাণের মতাদি উদ্ধৃত করিয়া "দীন-ই-ইলাহি" নামে এক নিদর্শনপত্র লিখিয়া দিলেন। এই নিদর্শনপত্রের মর্ম্ম এইরূপ যে, সম্রাট্ই ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ। দেশ-শাসন-বিষয়ে সম্রাটের অন্য কাহারও আদেশের বা পরামর্শের প্রয়োজন নাই ইত্যাদি। এই নিদর্শনপত্রে তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণ স্বাক্ষর করিলেন—আকবর তদবধি সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। †

বদৌনী এই "দীন্-ই-ইলাহি" ধর্ম্মের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া

† The Darbari—i—Akabari, published 1910, Page 3 50—51. By Late Prof Azid.

আবুল ফজলের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, আবুল ফজলেরই গুপ্ত প্ররোচনায় আকবর মবারককে ডাকিয়া এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলিয়াছি, কোন রাজার সমসাময়িক ঐতিহাসিক কখনও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে না; কিংবা রাজার দোষ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। বদৌনি একে ত রাজার ভয়ে সত্য কথা চাপা দিয়া আবুল ফজলকে দোষী করিয়াছেন, তাহার উপর আবার আবুলের অকস্মাৎ অসম্ভাবিত রাজসম্মান ও রাজদ্বারে প্রতিপত্তি-দর্শনে তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চারও হইয়াছিল।

আবুল ফজল স্বয়ং এই নিদর্শনপত্র-(Document) সম্বন্ধে "আকবর-ই নামা"য় লিখিতেছেন—"এই নিদর্শনপত্রের অতি শুভ ফল ফলিয়াছিল। আকবরের দরবার সমগ্র জাতির এবং সাধু ও শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলন-স্থান হইয়াছিল। *

আবুল ফজল এই নূতন ধর্ম্মপ্রচারের অন্তরালে আকবরের পরামর্শদাতা ছিলেন কি না এবং ঐতিহাসিক বদৌনির কথা যথার্থ কি না, তাহা একটু চিন্তার বিষয় বটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবুলের পিতা একজন ধর্ম্মপরায়ণ, সাধুপদবাচ্য মুসলমান ছিলেন। পিতার গুণ অধিকাংশ স্থলে পুত্রে প্রতিভাত হয়। সুতরাং মবারকের জ্ঞানতৃষ্ণা, ধর্ম্মপিপাসা আবুল-ফজলের চিত্তে বাল্য হইতেই যে, স্থান পাইয়াছিল তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবুল বহুদিন হইতে সাধু মহাত্মাদিগের সংসর্গও উপদেশ-লাভে উৎসুক ছিলেন। এতদিন তাঁহার অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাহাকে মনের বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

আকবরের সভায় প্রবেশ করিয়া আবুল নিজের অদম্য জ্ঞানপিপাসা-তৃপ্তির বেশ সুযোগ দেখিলেন। আকবরকে গোঁড়া মুস্তাহিদ্‌দের অযাচিত উপদেশ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি তদীয় পিতা মবারকের দ্বারা "দীন-ই-ইলাহি" ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মহাত্মাগণ আকবরের দরবারে উপস্থিত

* Malleson's Akabar (Rulers of India).

হইতেন। আবুল তাঁহাদের নিকট অমৃতময় ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত আত্মার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্রণীত "আকবর-ই নাম"য় লিখিতেছেন—"আমার মনের বিশ্বাস নাই; আমার হৃদয় মঙ্গোলিয়ার সাধু ও লেবাননের সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতে চাহে; আমি তিব্বতের লামা ও পর্ত্তুগালের পাদ্রীদিগের দর্শন লাভ করিতে বহুদিন হইতে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।"

আবুলফজলের উপরোক্ত উক্তি-পাঠে বোধ হয়, আকবরের এই "দীন-ই-ল্লাহি" ধর্ম্মপ্রচারের সহিত আবুল ফজলের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

বিশেষতঃ রাজনীতির হিসাবে এই ধর্ম্ম রাজ্যমধ্যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রজা আকবরকে একজন অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়া মনে করিত, এখন তাহারা তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া ভক্তিপূর্ণস্বরে ডাকিতে লাগিল। এত বড় একটা রাজনীতিক ব্যপারে আবুলফজলের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সকলেই যে এই নূতন ধর্ম্মে আস্থাবান ছিল, তাহা নহে। যাহারা এই ধর্ম্মকে ঘৃণা করিত, তাহারা আকবরের পরিবর্ত্তে আবুল ফজলকেই ঘৃণা করিত। তাহারা আবুল ফজলকেই এই ধর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া জানিত, কাজেই অনেকে আবুলের শত্রু হইয়া উঠিল।

যুবরাজ সেলিম (পরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর) আবুল ফজলকেই পিতা আকবরের ধর্ম্মান্তর-প্রচারের মূলীভূত কারণ জানিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালেসন্ 'আকবর' নামক পুস্তকে আবুল-ফজল-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"আবুল ফজল সম্রাট আকবরকেই যোগ্যতম ছাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।"

"আকবরের সহিত আবুল ফজলের পূর্ব্বে তিনি রাজ-কার্য্য-নির্ব্বাহে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

"আবুল ফজলের প্রদত্ত উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে আকবর

বুঝিয়াছিলেন যে, একটা শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে প্রতিপত্তিশালী ও প্রবল ধর্ম্মান্ধ মোল্লার দলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।"

"যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজ দরবারে ফৈজী ও আবুল-ফজল এই দুই ভ্রাতারই যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল।"

পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক আজদ "আকবর-ই-নামা" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠান্তর রাজদরবারে আবুলফজলের প্রতিপত্তি-সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক কার্য্যেরই মীমাংসার জন্য আবুল ফজলের মত সবিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। চিকিৎসক যদি চক্ষুতে কোনরূপ মালিশ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তবে তাহা আবুলের পরামর্শ ব্যতীত প্রযুক্ত হইত না। আবুল ফজলের অনুকূল মত ব্যতীত এমন কি ক্ষতে পর্য্যন্ত কোন মালিশ লেপন করা হইত না।"

"তিনি (আবুল ফজল) আকবরের সভাসদ্, মন্ত্রী, বিশ্বস্ত প্রধান সেক্রেটারী, রাজকীয় ঐতিহাসিক, ব্যবস্থা-সচিব এবং দেওয়ানী বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি আকবর রূপ আলেকজান্দারের নিকট আরিষ্টটল ছিলেন।"

"আবুল ফজলের অভিজ্ঞতা, শাসন-নৈপুণ্য ও শুভোদ্দেশ্যের উপর আকবরের এতাদৃশ বিশ্বাস ছিল যে,তিনি আবুল ফজলের প্রতিজ্ঞা নিজের প্রতিজ্ঞা বলিয়া মনে করিতেন। যুবরাজ দানিয়ালের নিকট আবুল ফজলের পত্র পাঠ করিলে উপরোক্ত উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে ঃ—

"সম্রাট্ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আবুল ফজল! আমি দাক্ষিণাত্য-অভিযানের বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমি মনে করি, হয় তুমি না হয় আমি সেখানে যাইব। যদি তুমি যাও তবে ইহা নিশ্চিত যে, যুবরাজ তোমার পরামর্শের প্রতিকূলে কাজ করিবে না—তোমার উপস্থিতিতে সে আর কাহারও কথা শুনিবে না।"

আকবর জানিতেন যে, তাঁহার সভাসদ্গণের মধ্যে আবুল ফজলই একমাত্র হিতৈষী। আবুলের মৃত্যু-সংবাদে আকবর এতদূর শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি আপন পুত্রের মৃত্যুতেও এতদূর শোকাভিভূত হন নাই।"

উল্লিখিত বিবরণী-পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আবুল ফজল আকবরের

দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দেশের প্রজাবৃন্দ অথবা রাজকীয় কর্ম্মচারীরা সম্রাট্‌কে যতটা ভয় না করিত, আবুলকে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিত। একজন কর্ম্মচারী একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি সম্রাট্‌কে আদৌ ভয় করেন না, কিন্তু সর্ব্বদা আবুল ফজলের ভয়ে ভীত।

আবুল ফজলের পত্রসমূহের যেমন লিখনপদ্ধতি সুন্দর, তেমনই ভাষারও লালিত্য আছে। তাঁহার পত্র "মুকুতাবাত-ই-আল্লমি" নামে পরিচিত। সেই মুকুতাবাতের অনুবাদপাঠে আমরা দেখিতে পাই, কর্ম্মচারিগণকে কয়েকখানি নীতিপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া অবসরকাল (Leisure) কাটাইবার আদেশ দেওয়া হইতেছে।

আবুল ফজলের পত্রাদির মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি যুবরাজ সাহাজাদা দানিয়েলকে "আখ্‌লাক্‌-ই-নাশিরী" "মস্‌নভি মৌলভী" প্রভৃতি নীতিপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, আবুল ফজল আকবরের রাজসভার উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

—০:০:০—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুসিয়ার সাহিত্য।

গত শতাব্দী হইতেই রুসিয়ার সাহিত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যই রুসিয়ার একমাত্র সম্পদ ছিল। ফরাসী কবিতার অনুবাদ এবং ফরাসী সাহিত্যালোচনা ভিন্ন যে, অন্য কোন উপায়ে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, একথা কোন রুসিয়াবাসী চিন্তাও করিতে পারিতেন না। কাজেই ফরাসী সাহিত্যের ছাঁচে রুসিয়ার সাহিত্যেকে গড়িয়া তুলিবার একটা চেষ্টা একসময়ে তথায় অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আজ সেই জাতীয় সাহিত্যের ক্ষীণ ধারা বর্ষার প্রলয়ঙ্করী কল্লোলিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় রুসিয়ার জাতীয় চিন্তা ও সাধনায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, বিশ্বসাহিত্যের মহা-সমুদ্রে অর্ঘ্য দিবার জন্য ছুটিয়াছে। আজ তাহার সেই তরঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখিয়া ইয়ুরোপীয়গণ বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

জগতে এমন এক একটা সময় আসে, যখন সাহিত্যে সপ্তরথীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সাহিত্যে এমন ভাবের সৃষ্টি করেন যে, তাহাতে সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া যায়। রুসিয়া রাজ্যে প্রথম আলেজান্দারের রাজত্ব-সময়েও এইরূপ সপ্তরথীর সমাবেশ হইয়াছিল। করমসাইন, জুকোভস্কি-প্রমুখ ব্যক্তিগণই প্রথমেই জাতীয় সাহিত্যকে ফরাসী সাহিত্যের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। জুকোভস্‌কী জার্ম্মাণ কবি গেটের আদর্শে কবিতা রচনা করিয়া প্রথমেই স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দেন যে, ফরাসী আদর্শ ব্যতীতও উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইতে পারে। তাঁহার পরই পুস্কিন নামক আর একজন শক্তিমান ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্য হইতে বায়রণের কবিতা-সিন্ধু মথিত করিয়া এক নূতন আদর্শে কবিতা রচনা পূর্ব্বক স্বদেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করেন।

কিন্তু তখনও রুসিয়ার সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে অপরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারে নাই। যে শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাবে জাতীয় সাহিত্য সর্ব্ববিধ দৈন্য হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সাহিত্যকুঞ্জে তখনও তাঁহার আগমন সূচিত হয় নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে নিকোলা গোগলের জন্ম হয়। তিনি রুসিয়ার প্রথম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গ কলেজের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বাণীর সাধনায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি "Dead Souls" নামক তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত করেন। ইহা ব্যতীত "Evenings at the farm," "St. Petersburg Stories" "Taras Bulba" প্রভৃতি পুস্তক এবং "The Revizor" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ভাই কাউণ্ট ডি ভোগো নামক ফরাসী সমালোচক গোগল-সম্বন্ধে বলেন,—গোগল এমনই নিপুণতার সহিত দরিদ্র রুসিয়াবাসীর জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না; এবং সেই প্রতিভাবলে তিনি যে কোন সময়ে সাহিত্যসম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যে তীব্র-বিদ্রূপ ও গভীর ভাব-প্রবণতা যে পরিমাণে বিদ্যমান তাহা একমাত্র বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের রচনাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এমার্সন বলেন কবি বক্তা (Sayer); প্রত্যেক যুগে যে কথাটী বলা একান্ত প্রয়োজনীয়, কবি সেই কথাটী অতি উচ্চ সুরে বলিতে পারেন; গোগলও এইরূপে তাঁহার যুগের অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটী অতি তীব্রভাবে বলিয়াছেন। এই সময়ে দুর্ব্বলের উপর শক্তিমানের নির্য্যাতন, সুনিয়মের অভাব, ন্যায়পরতার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা রুসিয়া রাজ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গোগল যেরূপ তীব্রভাবে এই জাতীয় কলঙ্কের কথা বলিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ হাস্যময় সরল নিখুঁত চিত্রে ইহার করুণ ফলটি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহার রচনা অতি শীঘ্রই মানব-চিত্তে আঘাত করিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। গোগল স্বয়ং তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

No one but Pouchkine understood me. It was he who always declared that it was my peculiar power to display the traviality of life, to share all the dullness of the medioere type of man, to make perceptible the infinately unimportant class of persons who would otherwise not be seen at all. This is my special gift.

রুসিয়ার সাহিত্যে একবার উপন্যাসের স্রোত প্রবাহিত হইয়া, ক্রমশঃ তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। রুসিয়ায় বহুদিন ধরিয়া একমাত্র উপন্যাসই সাহিত্যের অঙ্গ ছিল। এমন কি এক সময় গিয়াছে যখন উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর, একথা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে অনেকেই সঙ্কুচিত হইতেন না এবং সেই জন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে রুসিয়ায় উপন্যাস ও গল্পের এত অধিক উন্নতি হইয়াছে।

গোগলের পরই রুসিয়ার সাহিত্যে Gontcharoff ও Pissemoky নামক দুই ব্যক্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গোগল যে সুরে স্বজাতির হৃদয় ভরিয়া তুলিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেই সুরটী আঘাত করিবার চেষ্টা পান। স্থানে স্থানে সেই করুণ ভাবটী তাঁহাদিগের রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিলেও, তাঁহাদিগের রচনার মধ্যে গোগলের নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব দেখা যায়।

কিন্তু মাতৃভক্ত পূজকের জন্য রুসিয়াবাসীর বাণী-আরাধনা অসম্পূর্ণ রহিল না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে Irvan Turgenieffএর জন্ম হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশিত করিতেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Kolossoff নামক প্রথম উপন্যাস বাহির হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হইত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজী "কন্‌টেমপোরারী রিভিউ" প্রভৃতি ইংরাজী সাময়িক পত্র ব্যতীত জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় সাময়িক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। "নিহিলিষ্ট" শব্দ তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। অতি তীব্রভাবে শাসন-প্রণালীর দোষ দেখাইতে গিয়া তিনি শীঘ্রই শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বিষনয়নে পতিত হন। "Rudin," "A nest of Nobles""Helene, "Father and Sons,""Smoke", "Sinilia" প্রভৃতি বহু পুস্তক তিনি প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

একজন সমালোচক তাঁহার উপন্যাস-সম্বন্ধে বলেন যে, ইংরাজিতে লিখিত Uncle Tom's Cabin নামক উপান্যাস যেমন দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে দাস-ব্যবসায় বিলোপের কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, Turgenieffএর উপন্যাস-গুলিও সেইরূপ রুসিয়ার দরিদ্র প্রজার উপর সুসভ্য জগতের সহানুভূতি আকর্ষণ ও তাহাদিগের উপর অত্যাচার-দূরীকরণের কারণস্বরূপ। এই হিসাবে আমাদিগের "নীলদর্পণে"র সহিত তাঁহার পুস্তকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কেন না উভয়ের উদ্দেশ্য এক—দরিদ্র, নিপীড়িত ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন।

Turgeniffএর মৃত্যুর পর একজন ইংরাজ সমালোচক বলেন:— Europe has been unanimous in according to Turgenieff the first rank in contemporary literature—তাঁহার যুগে বিশ্ব সাহিত্যে তাঁহার আসন উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সঙ্গে, য়ুরোপ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। তাঁহার ছোট গল্প-সম্বন্ধে M. Jain বলেন:— No one, since the Greeks, had cut a literary cameo in such bold relief—গ্রীকগণ ব্যতীত সাহিত্যে এরূপ নৈপুণ্য আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যেন তাঁহার রচনার আদর কিছু কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার ন্যায় আর লোকে তেমন আগ্রহের সহিত তাঁহার পুস্তক পাঠ করে না। আজকাল রুসিয়ায় অধিকাংশ লোক Tolstoy ও Dostoievsky এই দুই ব্যক্তির রচনার পক্ষপাতী। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে Dostoievskyর জন্ম হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজবিদ্রোহের অভিযোগে তিনি নির্ব্বাসিত হন। দ্বিতীয় আলেক্সজাণ্ডারের অভিষেক-কালে তিনি মুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি "The Poor people", "The Degraded and The Insulted". "Buried Alive", "Crime and Punishment" নামক কতিপয় উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণ এতই অধিক যে, একজন সমালোচক বলেন, আজকাল যুগমাহাত্ম্যে শান্তি অপেক্ষা চাঞ্চল্য অধিক প্রকট হইলেও, এমন দিন শীঘ্র আসিবে যখন শান্তি ও প্রেমই লোকের অধিক প্রিয় হইবে। তখন আর তাঁহার উত্তেজনা-মূলক রচনা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না এবং কেহই তখন তাঁহাকে সাহিত্যে উচ্চ আসন দিতে সম্মত হইবে না।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে Count Leo Tolstoyএর জন্ম হয়। তিনি যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া মনুষ্য-চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, সেরূপ ভূয়োদর্শন অতি অল্প লেখকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই ফলে আজ তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র আদৃত, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোকের নিকট তিনি সাহিত্য-সম্রাটরূপে সম্মানিত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রুসিয়ায় ত্রিশজন লোকও তাঁহার নাম শুনিয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে কেন এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি এত সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন? ইহার উত্তর অতি সহজ,—কারণ তিনি মনুষ্য-জীবনের কয়েকটী জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—তাহা এই—আমি ও অপরে অসুখী কেন? চিরসুখের অধিকারী হইবার উপায়ই বা কি?

টলষ্টয় "Anna Karenina","Childhood","Boyhood and Youth", "War and Peace","War","Resurrection","Life",Russian Proprietor," "My Religion" প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, কর্ম্মী, স্বদেশহিতৈষী ও মানব-বন্ধু। তাঁহার রচনার মধ্যে এমন একটী সুর আছে যাহা ভারতবাসীকে একান্ত আকর্ষণ করে। কারণ তাহা ভারতেরই সম্পত্তি। শান্তিই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য। সেই শান্তির জন্য আমাদিগকে তথাকথিত সভ্যতার হাত হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মে নির্ভর ও প্রেমের আরাধনা করিয়া দ্বেষ হিংসা কলহ প্রভৃতি সমুদায় উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া সহজ জ্ঞান ও সরল বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে,—ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"A healthy child is like the creature that do not think, to the animals, the plants, to nature which is the eternal type of truth, of beauty and of goodness". তিনি তাঁহার "Guerre et Paris" পুস্তকে এই কথাই উদাহরণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াও Count Bezouchoff-এর কোনও উপকার হইল না, কিন্তু শান্ত ধীরপ্রকৃতি Karataieff সহজ কথায় কেমন করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই টলষ্টয়ের মূল মন্ত্রটী বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহার "Anna Karenina" পুস্তকেও ঐ একই ভাবের প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

রুসিয়া ব্যতীত টলষ্টয়ের পুস্তক ইংলণ্ডে বিশেষভাবে আদৃত। একজন ইংরাজ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই তাঁহার ভক্তের সংখ্যা অধিক। তাহার কারণ ইংরাজ জাতি সরলতার অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহার রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই; তাঁহার উপন্যাস-গুলির সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচক বলেন যে, সেগুলির প্রত্যেকটি মানবজীবনের এক একটি নিখুঁত চিত্র, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, তাহা একেবারেই ছবির ন্যায় মানব-মনে গাঁথিয়া যায়:—The note of all criticism of Tolstoy is that his novels are life itself. In other writers one may find colour and distortion of the medium; in Tolstoy the reader powerfully feels the absence of these. Life itself moves before him. অন্যত্র উক্ত লেখক সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, Readers

and critics in all civilization have established Tolstoy as the novelist in the front rank of his order. রুসিয়ার সাহিত্য ধন্য যে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্যিক রুসিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

টলষ্টয়ের প্রকৃতি ভারতীয় ঋষির ন্যায় পবিত্র ছিল। ভারতের সহিত রুসিয়ার স্থান ও কালের যথেষ্ট ব্যবধান থাকিলেও তাঁহার ভাষায় ও আচরণে ভারতীয় একটি চিরন্তন শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক Vogug তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি শাক্যমুনির একজন প্রধান শিষ্য। যে গভীর সত্য তাঁহার চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিয়া, তাঁহার জীবনের সমুদায় কর্ম্মকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, সেই মহাসত্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের হিমতুঙ্গ মহাগিরি কম্পিত করিয়া, একদিন উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মহামন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রুসিয়ার ধূসর প্রান্তর-মধ্যে শ্রবণ করিয়া তিনি এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, আত্মহারা হইয়া তিনি যে সুরে গান গায়িয়াছেন তাহাতে সাহিত্যে উজান বহিয়াছে, তাঁহার শুষ্ক প্রান্তর-ভূমি সুজলা সুফলা হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার স্বদেশবাসী পবিত্র নির্ব্বাণমন্ত্রের বার্ত্তা শুনিয়া মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছে, আর তাঁহার মস্তকে সাহিত্য-সম্রাটের রত্নমুকুট পরাইয়া দিয়া ধন্য হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী—পরের চক্ষে হেয়, সেই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া. অপরের দ্বারে করুণা-লাভের আশায় দীননয়নে চাহিয়া আছি—যদি আজিকার এই ভারতের শিক্ষা য়ুরোপেও আদৃত দেখিয়া আমাদিগের অতীত ভারতকে শ্রদ্ধা ও গৌরবের চক্ষে দেখিতে না শিখি, তবে গভীরতর অধঃপতনই যে আমাদিগের একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি,—এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

চড়াই পাখী।

আমি সেদিন আমার বড় কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কুকুরটাকে আমি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কুকুরটা হাঁ করিয়া জিবের খানিকটা বাহির করিয়া মাটির দিকে মুখ রাখিয়া যেন মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, আমি পিছনে পিছনে চলিয়াছিলাম।

হঠাৎ কুকুরটা জোড়ে চলিতে চলিতে থামিয়া আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল। কোন একটা শিকার দেখিতে পাইলে যেমন ভাবে মুখ উঁচু করিয়া দেখে সেইরূপ ভাবে দেখিতে লাগিল। আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, একটি চড়াই পাখীর ছানা মাটিতে পড়িয়া ঝট্‌পট্ করিতেছে। এখনও উহার ভাল রকম পালখ উঠে নাই, ঠোঁটও তার এখনও পূরা সাদা হয় নাই, অল্প অল্প সবুজ রং এখনও রহিয়াছে। কিছু আগে জোরে বাতাস বহিতেছিল। বোধ হয় সেই ঝট্‌কা হাওয়ায় এই চড়াইএর ছানা গাছের উপরকার বাসা হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

কুকুরটা শিকারের আশায় আস্তে আস্তে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখনও তাহার মুখটা হাঁ করা আছে, জিবটা খানিকটা বাহিরে আসিয়া লক্ লক্ করিতেছে ও নাক দিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে। হঠাৎ একটা বড় চড়াই পাখী কুকুরটার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কুকুরটার মুখের উপর কে যেন একটা পাঁতা গাছ হইতে ছুঁড়িয়া মারিল বলিয়া মনে হইল। পাখীটা অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে করিতে হাঁ-করা কুকুরটার মুখের সামনে উড়িতে লাগিল। উড়িতে উড়িতে দু'একবার কুকুরটার দাঁতের উপরও উড়িয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল। পাখীটার নিকট কুকুরটা নিশ্চয়ই একটা বড় রাক্ষসের মত বোধ হইতেছিল। বড় বড় সাদা চক্‌চকে দাঁতবসান কুকুরের হাঁএর এত নিকট গেলে যে নিশ্চয় মৃত্যু তাহা জানিত; তবু সে গাছের উঁচু ডালে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছার চেয়েও বলবান একটা শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে সজোরে টানিয়া আনিয়া কুকুরটির সম্মুখে ফেলিয়া দিল. তখন প্রাণের মায়া তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

কুকুরটাও কি জানি হঠাৎ এবার তাহার হিংসা ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেও বুঝি সেই শক্তির কিছু আভাস পাইয়াছিল। আমি কুকুরটাকে সেখান হইতে ডাকিয়া সেইখানে চলিয়া গেলাম, কুকুরটা ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল।

পাখীটার সেই করুণ মর্ম্মভেদী চীৎকার আমার কাণে তখনও বাজিতে ছিল। আমি তখন বড়ই গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলাম, কি জানি একটা কি ভক্তিপূর্ণভাবে হৃদয় আপনা আপনি নত হইয়া পড়িয়াছিল।

সেইদিন স্নেহ যে মরণভয়হীন,--ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক মনে করিয়াছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

আমার স্বামী।

আমার স্বামী জগৎ-স্বামী ভুবন-ভরা নাম
সকলে তাঁর চরণে শির লুটায় অবিরাম।
সবার আঁখি তাঁহার পানে লগন অবিরল,
কল্প-তরু বিলান্ সবে মনের মত ফল।
নাহিক তাঁর আপন পর, সকলি প্রিয় তাঁর.
ভিখারী, ভূপ সিন্ধু, কূপ অচল, তৃণ আর।
কেহ না ফিরে যে চাহে তাঁরে, সবার ঘুচে ক্ষুধা;
কামনা-বিষে রহে গো মিশে তাঁহার প্রেম-সুধা।
ভাবিতে হিয়া গরবে ভরে, নয়নে আসে জল,
আমার পতি সবার গতি— কি আর চাহি বল?
বুঝেছি মন! সবার ধন কাড়িতে চাহ তুমি,
ছিছিছি ছিছি! মরি যে লাজে তুহার বাণী শুনি!
আপনা ভুলি' তাহারে ভাল বাসিতে পার কভু,
বুঝিবি তবে— সবারে দিলে ফুরায় নাক তবু!
বুঝিবি হিয়া! সবারে নিয়া গঠিত এক নারী,
পুরুষ এক কামনা করে পদ-পল্লভ তা'রি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী

জ্ঞানী সলোমনের উক্তি।

সকল কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইও না, তাহা হইলে হয়ত (কোন্ দিন) শুনিবে যে, তোমার ভৃত্য তোমাকে গালি দিতেছে।

যিনি ভৃত্যকে তাহার বাল্যকাল থেকে অতিরিক্ত আদর দিতে থাকেন, তিনি দেখিবেন যে, বড় হইলে সে তাঁহাকে অপমান করিবে।

যদি তুমি প্রভুর বিরাগভাজন হও, তাহা হইলে পদত্যাগ করিও না; কারণ, পরে তাঁহার মনস্তুষ্টির সম্পাদন করিয়া তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যও ক্ষমা পাইতে পার।

বিনয়-নম্র উত্তর ক্রোধ শান্ত করে।

বক্তৃতার আরম্ভ অপেক্ষা উপসংহারটা ভাল করিবে।

অলস লোকের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

কার্য্যে তৎপর লোক রাজার নিকট সম্মান পাইবে; সে কখনও হীনাবস্থায় থাকিবে না।

যে পিতামাতার উপর অত্যাচার করিয়াও বলে যে, ইহা পাপ নয়, সে যমের সহচর।

জ্ঞানী পুত্র পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করে, কিন্তু নির্ব্বোধ পুত্র মাতার কষ্টের কারণ।

ক্রোধন-স্বভাব লোকর সহিত বন্ধুতা করিও না।

যে বিদ্রূপকারীকে তিরস্কার করে, সে নিজেই লাঞ্ছিত হয়; আর যে দুষ্ট লোককে ভৎর্সনা করে, তাহার কলঙ্ক রটিত হয়।

যে বিবাদের কথার কোন উল্লেখ না করে, সে (বন্ধুবিচ্ছেদের পর) মিলনের পথ মুক্ত করে; বিবাদ-কারণের মীমাংসা-চেষ্টা পুনর্মিলনের অন্তরায়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

পুরাতনী।

["পুরাতনী"-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা গত মাসে বলিয়াছি। এবারকার "পুরাতনী"তে কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত একখানি পত্র বাহির করিলাম। ইহা সন ১২৮৭ সালে রচিত অর্থাৎ কবিবরের তরুণ বয়সের রচনা; অথচ তাঁহার ইদানীং প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে এই রচনাটি প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতাবলীতে যে বিশ্বজনীন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে তাঁহার হৃদয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে; ইহার অঙ্কুর তাঁহার প্রথম যৌবনের সুকোমল মানস-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। আজ পরিণত বয়সে তিনি যাহা জগৎসমক্ষে বলিতেছিল, নিম্নোক্ত রচনায় তাহার পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পল্লীজননীকে কিরূপ প্রেমের চক্ষুতে দেখেন, তাহার পূর্ণ আভাষও এই রচনাতে বিদ্যমান। বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি, এবং বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্বন্ধে কবিবর অতি অল্পবয়স হইতে যে উচ্চ ধারণার পোষণ করিতেন, এই রচনা তাহার পরিচয় প্রদান করিবে।—অর্ঘ্য-সম্পাদক]

নবীনকিশোরের পত্র।

[লেখক—কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১২৮৭ সাল।)]

শ্রীচরণেষু—

দাদা মহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূর বিস্তৃত মাঠ এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া আমাদের সেই কলিকাতা সহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শত সহস্র মানুষকে একটা বড় খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি. আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছ পালা নহিলে আমি ত বাঁচি না—আমি ষোল আনা (Vegetarian) আমি কায়মনে উদ্ভিদ্ সেবন করিয়া থাকি। ইঁট কাঠ চুণ সুরকি মৃত্যু-ভারের মত আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড় বড় ইমারৎগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। আমি যেন আপনার গায়ে হাত বুলাইয়া আপনাকে খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে, চারিদিক হইতে প্রকৃতির জীবন্ত হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতে থাকি।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত মাইল দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্ত্তি

দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড় আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে তেল গাছে কাঁঠালের দেশ। যত-বড়-না-মুখ তত বড় কথার দেশ। পেটে পিলে কাণে কলম ও মাথায় শাম্‌লার দেশ। মনে হইত এখানে বিচি-গুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্রক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ মা হইয়া বসিয়াছেন—তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারি-দিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে যে নব জাতির জন্ম সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিম ঘাটগিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবল মাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্ত্তমান নহে, ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড় হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড় কথা সয় না। ছোট কথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে—সেটা ভাল নয়। যাই হৌক্ তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কি জান?—এতদিন বঙ্গদেশ সহরতলিতে পড়িয়াছিল এখন আমাদিগকে সহরভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে! ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানবসমাজ নামক বৃহৎ মিউনিসিপালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানীভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষ হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে

জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে, "সমস্ত 'একাকার' হইয়া গেল" কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙ্গালী হইব তখন একবার 'একাকার' হইবে, আর বাঙ্গালী যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাকার' হইবে। বিপুল মানবজাতি বাঙ্গালা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে? এ আমাদের সঙ্কীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার! আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙ্গালীদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংশ করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

৩ আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই ত চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি ত বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি ত সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব-প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ত বাঙ্গালা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন ত সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই; সকলেই আপনাপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কি করিয়া বাহির হইল—

"মার খেয়েছি না হয় আরো খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!"

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কি করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কি করিয়া? আপনাদের বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসাসিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? একদিন ত বাঙ্গালা দেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল? একজন বাঙ্গালী আসিয়া একদিন বাঙ্গালা দেশকে ত পথের বাহির করিয়াছিল? একজন বাঙ্গালী ত একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙ্গালীরা সেই ষড়যন্ত্রে ত যোগ দিয়াছিল! বাঙ্গালার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাঙ্গালা

স্বাধীনই থাকুক অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা বাঙ্গালায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার যো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন ত আর্য্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি ত বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্ক বিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপনাপন গর্ত্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বল।

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাঙ্গালা দেশের গানের সুর পর্য্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক-কণ্ঠ-বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্ত্তন বলিয়া এক নূতন কীর্ত্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠ-স্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি! বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে, আর একদিন হয় ত আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকখানার আস্‌বাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব। বৈঠকী ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্ত্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকারদিনের এই সকল সংবাদপত্রের মেকিসংগ্রাম, শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্ক বিতর্ক ঝগড়াঝাটি সমস্ত চুলায় যাইবে, আজিকারদিনের বড় বড় ছোটলোকদিগের নখে আঁকা গণ্ডী-গুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আর একদিন বাঙ্গালা একাকার হইবে!

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে,

এবং সে সূত্রেও যদি বাঙ্গালার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধূলার মত আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়লোক হইব তাহা নহে,পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়লোক হইব। আমার ত আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

সেবক—

শ্রীনবীন কিশোর শর্ম্মণঃ।

ঔরঙ্গজেবের উইল।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ইতিহাসে ক্রূরকর্ম্মা ও স্বার্থপর বলিয়াই বিদিত। বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃগণকে নির্য্যাতিত ও নিহত করিয়া তিনি জগৎ সম্মুখে কলুষিত মূর্ত্তিরই পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ের এমন একটী উজ্জ্বল অংশ ছিল, যাহার পরিচয় পাইলে তাঁহার মহত্ত্বে প্রকৃতই মুগ্ধ হইতে হয়।

সম্রাট্ মৃত্যুকালে একখানি উইল (will) রাখিয়া গিয়াছিলেন। "অর্ঘ্যে"র ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণের নিমিত্ত আমরা তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ স্বরূপ পরিস্ফুট হইবে।

উইলে লিখিত আছে ;—

"রিক্তহস্তে আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম এবং রিক্তহস্তেই এখান হইতে চলিলাম। আমার ভাগ্যবান্ বংশধরগণের মধ্যে যে এই সাম্রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে,—মহম্মদ কামবক্স * যদি নূতন সুবা দুইটী † লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে যেন কোন প্রকারে কষ্ট প্রদান না করে।"

---

* মহম্মদ কামবক্স সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র। আকবর নামে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিল, কিন্তু সে তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পিতার বিরাগভাজন হইয়া পারস্যে পলায়ন করিয়াছিল।

† বিজয়পুর ও হায়দরাবাদ।

§ ঔরঙ্গজেবের আর এক পুত্র।

"আমীর-উল-ওমরা অপেক্ষা বিচক্ষণ উজীর আর নাই।"

"সমস্ত রাজকর্মচারীই যেন মহম্মদ আজেম শার ‡ প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত থাকে।"

"যে সাম্রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবে, সে যেন আমার বংশোদ্ভব অথবা আশ্রিত কাহাকেও কোন প্রকার পীড়াদান না করে।"

"আমি যেরূপভাবে সমস্ত বিভাগ করিয়াছি, তাহা যদি আমার বংশধরগণের অভিমতানুযায়ী হয়, তাহা হইলে প্রভূত গণ্ডগোল ও রক্তপাত নিবারিত হইতে পারিবে।"

"সাম্রাজ্যের দুইটী রাজধানী আছে—আগরা ও দিল্লী। যে আগরা গ্রহণ করিবে সে তৎসঙ্গে দাক্ষিণাত্য, মালব এবং গুজরাটের অধিকার পাইবে, আর যে দিল্লীতে বাস করিবে, সে কাবুল ও অন্যান্য প্রদেশ পাইবে।"

"সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াই জগতে আসিয়াছিলাম এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গই যাইতেছি। আমার সমাধি-যাত্রাকালে, পতাকাদি অথবা কোন রাজকীয় আড়ম্বর যেন আমার অনুগমন না করে। বিশ্বস্ত হামিদউদ্দিন খাঁই যেন আমার মৃতদেহ সাহজেলালুদ্দিনের চত্বরে লইয়া যায় এবং দরবেশদিগের জন্য যে প্রণালী অবলম্বিত হয় সেই প্রণালীতে একটী কবর প্রস্তুত করে। আমার ভাগ্যবান পুত্রগণ যেন সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা না করে।"

"আমার গুপ্ত ধনাগারে ৫১৩৮২৲ টাকা সঞ্চিত আছে। আমার সমাধির সময়ে এক সহস্র টাকা যেন দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত হয়।"

উপযুক্ত বিবরণ হইতে ঔরঙ্গজেবের মহত্বের পরিচয় যথার্থই পাওয়া যায় কি না পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে সম্রাট দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ঔরঙ্গাবাদে বিনা আড়ম্বরে তাঁহার সমাধি হয়। কিন্তু তাঁহার চরম অভিপ্রায়ের সকলগুলি পালিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হইল, এবং বহু রক্তপাতের পর, ভ্রাতা ও আত্মীয়গণের শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া মোজম, "বাহাদুর শাহ" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসন অধিকার করে।

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

সপ্তদশ শতাব্দীর কেরাণী-চিত্র।

সিহাবুদ্দিন তালিস.—নবাব মীরজুমলা এবং সায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তিনি তদীয় "ফাত ইয়া-ই-ইব্রিইয়া" নামক অমূল্য গ্রন্থে বঙ্গের তদানীন্তন কেরাণী-কুলের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও সমসাময়িক ঐতিহাসিকের উক্তি নিতান্ত অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "তন্দ্রালস্য-পরায়ণ লিপিকর-সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সৈনিক পুরুষদিগকে অগ্নি-উপাসক ক্রীতদাস অপেক্ষাও হেয় এবং ইহুদীগণের সারমেয় হইতেও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা এবং অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। "তুমার" লিখিবার সময়ে সৈনিকগণের কষ্ট-লব্ধ অর্থের কিয়দংশ উহারা গ্রহণ না করিয়া পরিতৃপ্ত হইত না। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে "বৃত্তি" হইতে কিছু কর্ত্তন করা ব্যতীত উহাদিগের শ্রীমুখ হইতে অন্য কোনও প্রকারের বাক্যই নিঃসৃত হইত না। কেবলমাত্র রজত মুদ্রার সুমিষ্ট ঝনৎকারই তাহাদিগের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইত। জীবনব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ অর্থ হস্তগত করিতে হইলেও কেরাণীকুলের চিত্ত-বিনোদনার্থ যৎকিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা দক্ষিণান্ত না করিয়া গত্যন্তর ছিল না। এই দক্ষিণার ইতর-বিশেষের সহিত ফল-প্রাপ্তিরও নিকট সম্বন্ধ ছিল। অখণ্ড মণ্ডলাকারের মহীয়সী মহিমায় বশীভূত হইবার ফলে "ফর্দ্দ-ই-চেরা" লিখিত হইলেও "দাগ" চিহ্নিত করিবার সময়ে আবার নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইত। "দাগ" চিহ্নিত করিবার ভার অন্য লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। উহারা সময় বুঝিয়া "রোস্তমে"র উপযোগী অশ্বকে সামান্য ভারবাহী অশ্ব বলিয়া চিহ্নিত করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই অগ্নিপরীক্ষায় কোনও প্রকারে উত্তীর্ণ হইলেও "তাসিহা" করিবার সময়ে আবার গোলযোগ উপস্থিত হইত। "তাসিহা কারিগণ" হলচালনোপযোগী ধীর ও সবলকায় অশ্বকে গরু, ভীত-চকিত অশ্বকে সংশয়াম্বিত, এবং বিরল-কেশ অশ্বকে "তপলিবি" বলিয়া বর্ণনা করিত। "দায়ূদী" বর্ম্মকে সুতাতন্তু, এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণকে ক্ষৌমবস্ত্র-নির্ম্মিত পাগড়ী বলিয়া উল্লেখ করা উহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

তাহারা "রোস্তম"কে "জাল" এবং "জাল"কে নিতান্ত অর্ব্বাচীন বলিয়া বিবেচনা করিত। নোয়ার দীর্ঘ পরমায়ু, জোবের অসাধারণ ধীরতা ও স্থৈর্য্য, কোরার ধনরাশি এবং আসফান্দায়ারের অমানুষিক বীরত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই "তুমার" সেরেস্তার "হাফ্‌ৎ খানা" হইতে তদীয় "তসদিক্ ইয়াদ দাস্ত কবজ" এবং "বরাত" মঞ্জুর করাইতে সমর্থ হইত। খালসা কাছারীর কসাইখানায় বৃত্তিভুক্‌দিগের চর্ম্ম উৎপাটিত হইত। "দেওয়ানী-তন-তঙ্কা-দারের" সেরেস্তার কড়িকাঠে উহারা আত্মোৎসর্গ করিতে বাধ্য হইত। "মহাফেজ খানা"র প্রত্যেক সনাক্ত-চিঠিতে বিভিন্ন লিপিকরের লিপি-চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইত। চিঠির প্রত্যেক পংক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হইত। "বরাত চিঠি" দেওয়ার সময়ে প্রাপ্য তঙ্কার অঙ্ক হ্রাস করিয়া কর্ত্তিত অংশ বেশী করিয়া লিখা উহাদিগের মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। কবজে ভ্রমবশতঃ বাকী জায় লিখিত হইলে উহাই প্রকৃত দলিল বলিয়া গৃহীত হইত এবং ঐ অর্থ কেরাণীগণই আত্মসাৎ করিত। আদমাবাদ (depopulation) সরকারস্থ হয়রানপুর (City of desolation) পরগণায় রাজস্ব-প্রবঞ্চিত সৈনিকের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং "সৈনিকখানা খরাবি" (Rumid Soldier) জায়গীর-দারের নিকট হইতে বাকী রাজস্ব আদায় করিতে এই প্রকার মন্তব্য লিখিয়াও নিতান্ত অনুগ্রহ করা হইল বলিয়া উহারা মনে করিত। "তাসিহা"তে মাত্র এক দিবসের বেশ কম হইলেই এক বৎসরের বেতন কর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। ১লা "ফার-ওয়ার্দ্দিতে" কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পরবর্ত্তী "আসফান্দারে"র শেষভাগ হইতে তাহার তঙ্কা ধার্য্য হইত। তিন বৎসরের বেতন প্রাপ্য হইলে "বহু বৎসরের বাকী" এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে লিখিয়া অর্দ্ধেক তঙ্কামাত্র বাকী জায়ে লিখিত হইত। তোজীর লেখকদিগের উক্তি নিতান্ত অপ্রীতিকর ছিল। উহাদিগের মুখে হাস্যরেখা ফুটিত না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

প্রতীক্ষায়।

১

আর নহে ভুল।
সত্য ঐ চরণের ধ্বনি
পল্লবের সোপানে সোপানে
লঘুপদপরশন দিয়ে
মর্ম্মে মর্ম্মে রোমাঞ্চ যে আনে।
হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে লাস্য করে হর্ষ সমাকুল।
আর নহে ভুল।

২

একি ভ্রান্তি হয়?
গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে ঐ
যে আলোক দিল গো চমকি'
অন্তরের গুহ্যতম গুহা
বিদ্যুতে যে উঠিল ঝলকি'!
পরাণের নাট্যশালা সহসা যে হ'ল আলোময়,
একি ভ্রান্তি হয়?

৩

নিশ্চয় এবার!
মর্ম্মেঅনুরণিছে যে ঐ
দূর হতে ভূষণ-শিঞ্জন;
বাজাবে চাবির স্প্রিং ঠিক
এমনিটি বিশ্বে কোন্ জন!
কেন বাজে একসাথে প্রাণে বাঁশী মুরজ সতার
নিশ্চয় এবার।

৪

এ নহে বঞ্চনা,
দুয়ার যে কর-পরশনে
আনন্দের ছেড়েছে নিশ্বাস,
জড়গৃহ উঠেছে শিহরি—
কেমনে গো না করি বিশ্বাস?
মৃদু শব্দে খুলে দ্বার, উঠে পর্দ্দা, নাহিক বঞ্চনা
এ নহে বঞ্চনা।

শ্রীকালিদাস রায়।

পুস্তক-পরিচয়।

—*—

শ্রীদক্ষিণেশ্বর। প্রণেতা—শ্রীযুত প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়। মূল্য ।০ চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাব হইতে প্রকাশিত। ইহাতে পুণ্যস্মৃতি স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির ও তদীয় শ্বশ্রু-বংশের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত আছে এবং সেই সঙ্গে যে মহাপুরুষের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর গৌরবান্বিত, সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবেরও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার সমাবেশ আছে। পুস্তকখানির সাহিত্যিক মূল্য যত দূর থাকুক আর নাই থাকুক,—ভগবান রামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বর, কালীবাড়ী প্রভৃতির পবিত্র চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট পরম আদরণীয় বস্তু হইয়াছে।

বাঙ্গলার বেগম।—শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক,—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। নবাবী আমলে যে সকল বেগম পতিপরায়ণতা কিম্বা অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন পাইয়াছেন, গ্রন্থকার অতি মনোজ্ঞভাবে তাঁহাদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালার অদৃষ্টাকাশ যখন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হইতেছিল, তখন তাহার আঁধারময় রাজনীতিক্ষেত্র যে কেবল পুরুষেরই বিচরণ-ভূমি ছিল তাহা নহে, নবাবদের বেগমগণও কচিৎ কখনও তথায় পদসঞ্চার করিয়াছিলেন মাত্র। তবে "ইংলণ্ডের ইতিহাসে যেমন মেরী, এন, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিলে, ফরাসীর ইতিহাসে লুইসা, দেন্তেল, জেঁয়াদার্ক প্রভৃতিকে বাদ দিলে, রুসিয়ার ইতিহাসে পেট্রোণা, ক্যাথারীণ প্রভৃতির কথা বিশেষরূপে আলোচনা না করিলে যেমন ইংলণ্ড, ফরাসী ও রুসিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না", বাঙ্গালার ইতিহাস বেগম-বিবরণ-শূন্য হইলে উহার তেমন কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, ব্রজেন্দ্রবাবু বহু যত্নে নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বেগমদিগের বৃত্তান্তগুলিকে সম্পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় তিনি অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

অর্ঘ্য,

তৃতীয় কল্প, ১১শ খণ্ড।

গিরিশচন্দ্র।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইল, গিরিশচন্দ্র বঙ্গমাতার অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ বার্ষিক অধিবেশনের কোন আয়োজন করা আজিও কর্ত্তব্য বোধ করিল না। এমনই আমাদের প্রগাঢ় কর্ত্তব্যবুদ্ধি!—এমনই আমাদের কৃতজ্ঞতা! পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া জীবিত লোকের সম্বর্দ্ধনার জন্য আমরা ছুটাছুটি করিয়া থাকি,—আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে বলিয়া কালি-কলমে তাহা লিখিয়া, কাগজে ছাপাইয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। কিন্তু মৃত মনীষীদিগের প্রতি আমাদের যে আচরণ, তাহা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিষম সংশয় জন্মাইয়া দেয়। সে আচরণ মনুষ্যত্বের মস্তকে সজোরে পদাঘাত করে।

মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যুর সাংবৎসরিক সভার অনুষ্ঠান হয় বটে; কিন্তু তাহা নাম মাত্র। সাহিত্য-রথীদের সমাগম সেখানে বড় একটা হয় না। বঙ্কিমের স্মৃতি-সভা কোন বৎসরে হয়, কোন বৎসরে হয় না। নবীনেরও তথৈবচ। দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রের স্মৃতি-সভা কচিৎ কখনও হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণে তাহার বড় সংবাদ রাখে না। এমনই আমরা মানুষ! "সম্বন্ধ জীবনাবধি"—এই কথাটাই আমরা খুব জবর বুঝিয়াছি। জগতে এমন বুঝা, বোধ করি, আর কোন জাতি বুঝে নাই।

আসল কথা, আমাদের হৃদয় নাই। প্রতিভা কি, তাহাও অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না। মুখে আমরা 'ভাব-সম্পদ্' 'ভাব-সম্পদ্' করিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, কিন্তু ভাব জিনিষটাকে প্রকৃত সম্পদ বলিয়া এখনও ভাবিতে বা বুঝিতে শিখি নাই। মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনে, মনুষ্যত্বের পুষ্টিপ্রসাধনে, সংসারে ভাব জিনিষটার যে কত বেশী প্রয়োজন, একথা যদি হৃদয় দিয়া

বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে বঙ্কিম ও গিরিশ প্রভৃতির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনই আমাদের বিস্মৃতি ঘটিত না। বঙ্কিম ও গিরিশের ভাব-গঙ্গোদকে আমাদের মনের মলা-মলিনতা যে একটু একটু করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে, একথা এখনও বুঝাইয়া বলিতে হয়।

শুধু তাহাই নহে। বঙ্কিম ও গিরিশের ভাব-সম্পদকে আবার অনেকে অস্বীকারও করিয়া থাকেন। বঙ্কিমের বই পড়িয়া বাঙ্গালী বিগ্‌ড়াইতেছে, এমন অভিযোগও মাঝে মাঝে কানে আসিয়া পৌঁছে! গিরিশের নাটক-রাশি যে সাহিত্যাংশে নগণ্য,—নাট্যাংশে জঘন্য,—নেহাৎ খেলো কেতাব —যাত্রারও উপযোগী নহে, এমন কথাও কোন কোন শিক্ষিতের শ্রীমুখ দিয়া বহির্গত হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু এ সকল কথার উত্তর দিবার বা প্রতিবাদ করিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই,—প্রয়োজন বোধও করি না। কারণ, বঙ্কিম শিখাইয়া গিয়াছেন,—"জলে আলিপনা সম্ভবে না।"

গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়। তাঁহার কৃত নাট্যগ্রন্থ ও বর্ত্তমান নাট্যকলা, এই দুইটী জিনিষই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ঐ উভয়ের দ্বারাই বঙ্গদেশ প্রভূতপরিমাণে উপকৃত। একথা বঙ্গদেশ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে না চাহিলেও ইহা সত্য,—ইহা সাক্ষাৎ-দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত।

গিরিশচন্দ্রের যখন যুবাবস্থা, সেই সময়ে তিনি কতিপয় সহযোগীকে সঙ্গে লইয়া, বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থগুলিকেই প্রধান ভরসা করিয়া জাতীয় নাট্যশালা-সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই রঙ্গালয়-সংস্থাপন-ব্যাপারে গিরিশের বলিষ্ঠ হৃদয়ের স্বরূপ মূর্ত্তিই জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই। তিনি যে সময়ে রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট হয়েন, সে সময়ে আমাদের দেশে নট-জীবন জন-সাধারণের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও যে হয় না, তাহা নহে। তবে তুলনায় পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক কম। গিরিশচন্দ্র কিন্তু "পুরস্কার—তিরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার" জানিয়াও যে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায়। সমা-জের ভ্রূকুটী-ভঙ্গী তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রবল-স্রোতকে বিপরীত মুখে ফিরাইতে আদৌ সমর্থ হয় নাই। দেশের অনাদর ও অপমানের প্রকাণ্ড

বোঝা তাঁহার জীবন্ত মনুষ্যত্বের উন্নত মেরুদণ্ডকে একবিন্দুও নমিত করিতে পারে নাই। "লাজ, মান বা ভয়" এই তিনের শৃঙ্খলে যদি তাঁহার পুরুষত্ব আবদ্ধ হইত, যদি তিনি তখনকার সেই অপোগণ্ড নাট্যকলাকে কোলে-পীঠে করিয়া মানুষ করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার সৃষ্ট নাট্য-সাহিত্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিতাম না।

দীনবন্ধু ও বঙ্কিম প্রভৃতির গ্রন্থগুলি বারংবার অভিনয়ে দর্শকের নিকট যখন 'একঘেয়ে' হইয়া আসিতেছিল, গিরিশচন্দ্র তখন,—সেই শুভক্ষণে স্বয়ং দর্শকবৃন্দের বৈচিত্র্য-পিপাসা মিটাইবার আশায় সুধাভাণ্ড হস্তে করিয়া নাটক গড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার দামিনী-দীপ্তিতে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য অনুকরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে স্বাতন্ত্র্য আসিয়া প্রবেশ করিল। যাহা ত্রিবক্রা কুব্জা ছিল, তাহা গিরিশ-যাদুকরের কর-স্পর্শে পরম রূপবতী হইল। ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এই কয়টীতেই গিরিশ অপূর্ব্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াও সাধারণ কবির মত কখনও অসামাজিক ভাবের ফেরি করিয়া বেড়ান নাই। বিদেশীয় ভাবের বীজ লইয়া তিনি কখনও তাহা ঘরের বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহার চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ও বলিদান প্রভৃতি দেশের লোকের হৃদয়কে যেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে অন্য কোন আধুনিক বাঙ্গালা কবির কাব্যাদি পারে নাই। গিরিশের গ্রন্থ সমুদায় শিক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারে। 'সমাজই সাহিত্যের আধার।' গিরিশ নিজের সমাজ হইতে, নিজের গৃহ হইতেই তাঁহার সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট-সাহিত্য অনুচিকীর্ষার সাহিত্য নহে।

গিরিশচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ, এই দুইজনেই রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য। দুই জনেই প্রায় এক ভাবেরই ভাবুক। একই ধরণের ভাব-সম্পদ দুইজনেই দেশবাসীকে বিলাইয়া গিয়াছেন। শুধু বিলাইবার প্রণালী বিভিন্ন।

প্রবন্ধান্তরে কথাটা বুঝাইতে, প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব ;—এখানে তাহার কেবল ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

যাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে শুধু হাজ্‌লিট্‌ বা ড্রার্ভাইনাস্‌ পড়িয়াই গিরিশের নাট্য-সৌন্দর্য্যের বিচার করিতে বসেন, তাঁহারা গিরিশের উপর তত্টা প্রসন্ন নহেন। যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার নাটকের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও গিরিশকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু যাঁহারা দেশ ও কালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গিরিশের নাটক পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই কেবল গিরিশের প্রতিভালোকের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখেন। তাঁহারাই কেবলমাত্র বিপিন-চন্দ্রের ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন যে, "গিরিশচন্দ্র চাতক পক্ষী ছিলেন না, কেবল আকাশে থাকিয়া চাঁদিমা চুনিয়া, শিশির-কণা আহরণ করিয়া কবিতা লিখিতেন না ; তিনি পৃথিবীর ধূলামাটির উপর গড়াইয়া—লুটাইয়া, সেই রজোরাশি অঙ্গে মাখিয়া আকাশে উঠিতেন এবং স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে সে সকল ধূলিকণাকে কনক-কণায়—পারিজাত-পরাগে পরিণত করিতেন।" ইহাই গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। গিরিশচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালা-হিন্দু-কবি।

বিলাতী নাটকের ভাব-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে সকল সমালোচক বঙ্গভাষায় নাটক হইল না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র একদিন লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। দেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কত আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ-নামেই হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম, বিদেশীয় ভীষণ তরবারিধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে। সমালোচকেরাও কে কাকে কাটিল, কে কাকে মারিল, এইরূপ রচনা দ্বারা মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। তাহার পর মারা-কাটা লইয়া এমন কি নাটকে লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই। এখনও

পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়রকে আনিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে।"

"নাটকের কথা কহিতে হইলেই এই সকল নাটকবিদ্ লোক বিদেশীয় নাটক লইয়া তুলনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় নাট্যকারের ভিতর সেক্সপীয়ারের নাম জানেন। সেক্সপীয়ারের নাটক কি, ও সে সকল নাটক কি ভাবাপন্ন. তাহার পরিচয় যদি এই সমালোচকদের দিতে হয়, তাহা হইলে অনেককেই ভাবিতে হইবে সেক্সপীয়ারের নাম তুলিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি; সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি নাই, তাঁহার নাটক কি ভাবাপন্ন কিরূপে জানিব! এ সম্প্রদায়ের কথা এই পর্য্যন্ত। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও আছেন, তাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে Gervinus, Schiller, Goethe প্রভৃতির নানা ভাষার নাটক-সমালোচনা পড়িয়াছেন; কিন্তু সেই Schiller, Goethe-কৃত নাটকের উদার সমালোচনাতেও বুঝিতে বাকি আছে কি যে, জাতীয় উচ্চ নাটক, জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার আছে, তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন? ইংরাজের শ্রেষ্ঠ নাটককার যদি তিনি জর্ম্মাণ হইয়া জর্ম্মাণ ভাষায় সেই সকল নাটক লিখিতেন, তিনি জর্ম্মাণ-হৃদয়ে স্থান পাইতেন না; যথা—Schiller, Goetheএর দ্বারায় সেক্সপীয়ারের উচ্চ প্রশংসা সত্বেও, জর্ম্মাণ তাহাদের নাটককার সিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন. সিলারের কৃত Joan of Arcকে দেখাইয়া বলেন যে,সেক্সপীয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া নাটক-রচনা করেন। উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূল আকর্ষণে ধড়াস্ করিয়া (comes down with a thud) পৃথিবীতে পড়িয়া যান!"

তাই বলিতেছিলাম যে, গিরিশের ভাবসৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া চাই। নহিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। সমাজের সামগ্রী সমাজকে যে ভাবে যে পরিমাণে গিরিশচন্দ্র বিলাইয়া গিয়াছেন, তেমন ভাবে বিলাইতে আধুনিক কবিগণের মধ্যে আর কেহ পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যকাব্যগুলি বিলাসিতার পঙ্কিল রসে কলঙ্কিত নহে। তাঁহার মত মানুষের মনুষ্যের ছবি আমাদের দেশে আর কেহ আঁকিয়া

যাইতে পারে নাই। হিন্দুর সংসার যে গৃহিণীরই প্রেমের সংসার, এ চিত্র গিরিশই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া ফুটাইয়া বাঙ্গালীর নয়ন সমক্ষে ধরিয়াছেন। সূর্য্যমুখী, কমলমণি, ভ্রমর প্রভৃতি সকলেই স্বামীছাড়া সংসারে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই জানেন না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই যেন "বন্দে ষোড়শীং রূপসীং প্রেয়সীম্!" কিন্তু বিলাতী সাহিত্যের কুহকের মোহ গিরিশের প্রতিভাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। 'নরনারীর যৌন-সম্বন্ধ'ই যে বিপুল বিশ্বের একমাত্র চিত্র নহে, এ কথা আমাদের দেশে গিরিশের নাটকই সপ্রমাণ করিয়াছে।

হিন্দু রমণীর প্রেমপ্রবাহ স্বামীতে, দেবরে, ভাশুরে, শ্বশুরে, শাশুড়ীতে ও নিজ পুত্রকন্যায় প্রবাহিত। গিরিশের নাট্য-সাহিত্য এই ছবিরই বিরাট বিকাশ। জ্ঞানদা, প্রফুল্ল, উমাসুন্দরী, হৈমবতী, সুশীলা, সরস্বতী, পার্ব্বতী, নির্ম্মলা, ও বিরজা প্রভৃতি সকলই এই প্রেমের চিত্র। ইহা প্রেম-ভক্তিতে সমুন্নত এবং স্নেহরসে বিগলিত। বঙ্গসাহিত্যে এ চিত্র অতুলনীয় অপরাজেয়!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ভূষণ।

চেয়েছিলে ভূষণ প্রিয়ে ভূষণ সবি সঙ্গে আছে,
এখন সবি পরিয়ে দিলে তবে আমার প্রাণটা বাঁচে।
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে
আলতা দিব পরাইয়ে,
আদরে আজ দুলিয়ে দিব চুমার নোলক নাকের কাছে।
রচিব হার একটি করে
মেখলাটি অঙ্গে পরে
যাহার লাগি বৃথায় এ দান দোকান দোকান ঘুরিয়াছে।
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর,
বাজবে কিবা ঝুমুর ঝুমুর,
ভূষণ প'রে দেখবে বয়ান আমার দুটী নয়ন-কাচে।

শ্রীকালিদাস রায়।

হুগলী জেলার পল্লীকথা।

কোন্নগর।

—:*:—

শ্রীরামপুর সহর হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে এই গ্রাম অবস্থিত। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত কোন্নগর গ্রাম আয়তনে ও বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর বাস হেতু হুগলী জেলার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বঙ্গগৌরব রাজা দিগম্বর মিত্র, কোন্নগরের প্রাণস্বরূপ শিবচন্দ্র দে, প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সুলেখক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র, হাইকোর্টের বিচারপতি মহেন্দ্রনাথ বসু এবং পণ্ডিতপ্রবর ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ডি এল্ কোন্নগর অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

কোন্নগর গ্রামের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে একমত হইবার উপায় নাই। তবে এই গ্রাম যে অতি প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণ চাঁদ সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার কথায় কোন্নগরের স্পষ্টতঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে কোণার গুহবংশ অতি প্রাচীন বংশ, তাঁহারা এক সময়ে এই স্থানে বাস করিতেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যূন ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও কোন্নগরে লোকের বাস ছিল, তবে তৎকালীন অবস্থার কথা অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

কোন্নগরের সাহিত্য-সভার চেষ্টায় বন্ধুবর শ্রীযুত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য বি-এ, "আমার হুগলীর ইতিহাসের" জন্য কোন্নগর-সংক্রান্ত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "মুসলমান রাজত্বের অন্ততঃ উত্তরার্দ্ধে এই কোন্নগর গ্রাম একটি ঋদ্ধিযুক্ত স্থান ছিল।" ইহা নিতান্ত অনুমান নয়। কোন্নগরের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা যাইতে পারে যে, ইহার পল্লীগঠন, প্রাচীন দেবমন্দির এবং মৃত্তিকাপ্রোথিত বহু ভিত্তি এতদ্সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরের নিকট মুখোপাধ্যায়গণের একটি বাগানের মৃত্তিকা খননকালে একটি ভজনালয়ের ঐরূপ একটি ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন্নগর নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এইখানে

আমরা মাত্র দুইটীর উল্লেখ করিব। কথিত আছে, জনৈক রাজপুত্র রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় লন, এবং তাঁহারই সম্মানার্থ এই স্থান "কুমার নগর" নামে পরিচিত হয়। কুমার নগর ক্রমশঃ কোন্নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই প্রবাদের মূলে যে কোন সত্য আছে, আমাদিগের তাহা মনে হয় না। আমরা চেষ্টা করিয়াও উক্ত কুমারের নাম-ধাম সংগ্রহ করিতে বা তাঁহার বংশাদির সহিত পরিচিত হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় প্রবাদটী এই যে. কোন্নগরে কুম্ভকারগণ বহুদিনের অধিবাসী। কুম্ভকার শব্দের চলিত অভিধান"কুমোর"। উক্ত "কুমোর"গণ একসময়ে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং সেই হেতু এই গ্রাম কুমোর নগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কুমোর নগরই কালক্রমে কোন্নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কথাটার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। সেটী এই ;—বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে কোন্নগর নামে অভিহিত করি, তাহা কতিপয় পটীর সমষ্টিমাত্র। উক্ত পটীগুলির মধ্যে পটী আলিনগর, পটী শ্যামনগর, পটী শ্যামসুন্দর বাটী, পটী বিষ্ণুবাটী ও পটী কুমোরনগর সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। পটী আলিনগরে মুসলমানের বাস ছিল। কথিত আছে যে, বদরহাজি নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং তাহারই চেষ্টায় এই স্থান জনসমাগমে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে। উক্ত আলিনগর পটীর মধ্যে মুসলমান প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি অটুট রাখিবার জন্য হাজির পুকুর ও হাজির বেড় প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে। সে যাহা হউক আমার বোধ হয় যে উক্ত পটীসমূহ পূর্ব্বে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছিল ; পরে কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সে গুলিকে একীভূত করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সময়ে যে পটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল, তাহারই নামানুসারে পটী-সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত স্থান পরিচিত হইয়া উঠে। বোধ হয় পল্লীগঠনের সময়ে কুমোরনগর পটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য কুমোরনগর হইতেই কোন্নগর নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই আলিনগরে এক সময়ে মোগলদিগের কুঠী ছিল। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবদুল গফুর নামক একজন মোগল এই কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি পোত নির্ম্মাণ করাইবার জন্য একটী ডক্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বহু করাতিগণ এই সূত্রে এইস্থানে আসিয়া বাস করে। এই ডকের ভগ্নাবশেষ ও করাতিপাড়ার করাতিগণ আজিও এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

কোন্নগর কায়স্থ-প্রধান স্থান। কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র ও দে-পরিবারই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মিত্র-পরিবার পাঁচ ভাগে এবং বসু-বংশ দুই ভাগে বিভক্ত। সম্ভবতঃ মিত্রগণই কোন্নগরের প্রাচীনতম কায়স্থ অধিবাসী। তাঁহাদিগের প্রায় পঞ্চদশ পুরুষ কোন্নগরে কাটিয়া গিয়াছে। রায় মিত্রগণের একশাখা কোন্নগর হইতে চলিয়া গিয়া, কলিকাতার কুমারটুলিতে বাস করেন। কুলীন মিত্রগণ বঁড়িশা বেহালা হইতে আসিয়া কোন্নগরে বাস করেন। আন্দুলের রাজা নিঃসন্তান হইলে, কুলীন মিত্রবংশীয় ক্ষেত্র মোহন মিত্র মহাশয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। আঁটপুরের মিত্র এবং মেদিনীপুরের মিত্রগণ ইঁহাদিগেরই শাখা। এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণ ৺রামচন্দ্র মিত্র প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির বাড়ীর মিত্রগণ কর্ত্তৃক কোন্নগরে বহু দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুইটী শিবমন্দির ইঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির পাত্রলিপি হইতে জানা যায়, ঐ দুইটী যথাক্রমে ১৬৫৯ ও ১৬৬৭ শকে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত বহু কারুকার্য্যবিশিষ্ট কালীমন্দির অতি প্রাচীন ও দর্শনীয়. ইহা ১৬১৭ শকে নির্ম্মিত হয়। সুঁড়োর রাজবংশ এই বংশের শাখা এবং রাজা দিগম্বর মিত্র কোন্নগরের মিত্রবংশের সন্তান। এতদ্ব্যতীত মজুমদার মিত্র ও তেঁতুল বাড়ীর মিত্র-বংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

কুলীন মিত্রপরিবারে বিবাহ করিয়া ঘোষ-বংশীয় কায়স্থগণ কোন্নগরে আসিয়া বাস করেন। এই বংশের আদিপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ জীউর মন্দির আজিও অটুট রহিয়াছে। এই বংশের রামচন্দ্র ঘোষ নামক একব্যক্তি ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে চট্টগ্রামের দেওয়ানপদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারত-প্রসিদ্ধ অরবিন্দ ঘোষ এই বংশের সন্তান।

কোন্নগরের দে ও বসু-বংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দে-বংশে কোন্নগরের উজ্জ্বল রত্ন ৺ শিবচন্দ্র দে মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার কীর্ত্তি কোন্নগরের চারিদিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে

বর্ত্তমান কোন্নগরের প্রতিষ্ঠাপক শিবচন্দ্র দে। দুঃখের বিষয়, পুলিস-রিপোর্ট হইতে সঙ্কলিত হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়রে শিবচন্দ্র দে মহাশয়ের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। আমরা আবার এই সব গ্রন্থই অনুবাদ করিয়া জেলার ইতিহাস প্রকাশ করি। হায় দুর্ভাগ্য!

উক্ত কায়স্থগণ প্রকৃতপক্ষে কোন্নগর গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। কায়স্থগণের আগমনে কোন্নগরে ৩॥ ঘর ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। ঘটক, ডিংসাই ভট্টাচার্য্য ও ঘোষাল-বংশ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সমধিক প্রাচীন। ঘটকগণ রায় মিত্রগণের, ডিংসাইগণ মন্দির বাড়ী মিত্রগণের, ভট্টাচার্য্যগণ ঘোষগণের পৌরহিত্য করিতেন। ডিংসাইবংশের দয়াল শিরোমণি নামক জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বর্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্য-বংশ বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশের মথুরেশ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাশিক্ষা করেন।

যে সময়ে বঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়, প্রায় সেই সময়েই তাহার একটি ক্ষুদ্রতরঙ্গ কোন্নগর গ্রামে আসিয়া লাগিয়াছিল। সেই সময়েই কোন্নগরে ইংরাজী বিদ্যার সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান সময়ে কোন্নগরের ইংরাজী বিদ্যালয় হুগলী জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই বিদ্যালয়েই "সাহিত্য" প্রভৃতি মাসিক পত্রের লেখক ৺নৃত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার ছাত্রগণ-পরিচালিত কোন্নগরের "সাহিত্যসভা" কতিপয় শিক্ষিত যুবকগণের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়া, বঙ্গভাষার অনুশীলনের পক্ষে গ্রামবাসীদের সযেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

যোগেন্দ্র-কথা।

"বিপদি ধৈর্য্যম্ অভ্যুদয়ে ক্ষমা।" ইহা আমাদেরই কথা বটে, কিন্তু আমরা কয়জন জীবনে একথা খাটাইতে পারি? কেবল আমাদের কথা কেন, এ বিপুল পৃথিবীর মাঝে কোন্ দেশে কোন্ জাতির ভিতর কয়জনের জীবনে এ কথা খাটিতে দেখিতে পাই? কাহারও জীবনে যে একথা

খাটে না বা খাটে নাই, এমন কথা বলিলে নিশ্চিতই সত্য কথা বলা হয় না। আছে বৈ কি এমন মহাপুরুষ যে, তিনি সারাজীবনে এই কথা খাটাইবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

এমন মহাপুরুষ কে? যিনি বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি অন্তরাত্মায় পরমাত্মার সত্তানুভব করিতে পারেন। যিনি তাহা পারেন, তিনি মহাপুরুষ। আমরা এ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র-চন্দ্রকে মহাপুরুষ বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত বহুল; সকল দৃষ্টান্তের সমাবেশের পক্ষে "অর্ঘ্যে" স্থান সঙ্কুলান সম্ভবপর নহে। সুতরাং দুই চারিটী দৃষ্টান্তে আমাদের কথার সার্থকতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইব। দৃষ্টান্তের গুরুত্ব স্থান-সংক্ষেপের আক্ষেপে নিশ্চিতই লঘুত্ব ঘটাইতে পারে, আমরা এইরূপই বিশ্বাস করি।

রাজদ্রোহের অভিযোগে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমাদের পাঠকবর্গের অবশ্যই অনেকেরই স্মৃতি হইতে তাহা অপসারিত হয় নাই। "সহবাস সম্মতির আইনে"র প্রস্তাব-কালে সমগ্র ভারত-ভূমে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এ ভারতে ইংরাজ-শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জলদক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধুনা "অর্ঘ্যে" বিশদভাবে আলোচনা না করিলে বোধ হয়, এ সন্দর্ভের অঙ্গহানি হইবে না। এই আন্দোলনে "বঙ্গবাসী" প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রস্তাবের অনুকূল আন্দোলন যে হয় নাই, অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতেছি না। অনুকূল ও প্রতিকূল আন্দোলনের সংঘর্ষণ-তত্ত্বের আলোচনা করিলে বলিতে হয় যে, প্রতিকূল আলোচনার পক্ষপাতীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। সে আলোচনায় ন্যায়া-ন্যায়ের বিচার আমরা এখন করিতে প্রস্তুত নহি। প্রতিকূল মত বিপুল হইলেও তাহাদের আন্দোলনের ন্যায় দাবী বেশী কি কম, সে সম্বন্ধেও কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও এ প্রসঙ্গের অসঙ্গতি ঘটিবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, 'বঙ্গবাসী"র আলোচনায় একটা আন্তরিক মর্ম্মতাপের জ্বালাময়ী জ্বালার অনুভূতি অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হয় নাই। সে আন্দোলনে আন্তরিকতার অসদ্ভাব ছিল না। রাজপক্ষ "বঙ্গবাসী"র

আন্তরিকতাকে অবশ্য অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু সে আন্তরিকতার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। রাজপক্ষ প্রজার হিত-বিধান-কল্পে আত্মকর্ত্তব্য-বোধে সহবাস সম্মতি আইনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন।

কিছুদিন পরে "বঙ্গবাসী"র নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হয়। "বঙ্গবাসী"র স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বসু মহাশয় আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত হন। স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদক বলিয়া, শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দোপাধ্যায় কর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া এবং শ্রীযুক্ত অরুণোদয় রায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক বলিয়া অভিযোগের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত। পুলিশ সদলবলে "বঙ্গবাসী" অফিস ঘিরিয়াছে; পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ অফিসের ভিতরে গিয়া আসামীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন; সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান জন্য খাতা-পত্রের পরীক্ষা-পরিদর্শন চলিতেছে; উপস্থিত কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে কোন কোন বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহের জেরা চলিতেছে,—যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট এই সংবাদ গেল। তখন কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসাবাড়ী। এ আকস্মিক বিপদ-সংবাদে অবশ্য পরিবার-মণ্ডলীর মধ্যে একটা হাহাকার-আর্ত্তনাদ উঠিল। তখন যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বসু মহাশয় জীবিত। তিনিও সেই বাসাবাড়ীতে এই বিপদের সময়ে উপস্থিত। এ বিপদ-বার্ত্তা শুনিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তম পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিপদ-বার্ত্তায় চোখের জলে তিনি ভাসিয়া গেলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের জননীও তখন সেই বাসাবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার অবস্থার কথা কাহাকেও কি আর বলিতে হইবে! পত্নীর অবস্থা কি অন্যরূপ হইতে পারে? যোগেন্দ্রচন্দ্র কিন্তু অটল অচল। এই বিপদ-বার্ত্তায় কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া তিনি যেন ধ্যানমগ্ন মহাযোগী বিরাট বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ধ্যানস্তিমিতনেত্রে একটা সিদ্ধান্তের চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। তিনি নিরশ্রুনয়নে অম্লানবদনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"আপনি যদি চঞ্চল, হন, তাহা হইলে মাকে সান্ত্বনা দিব কি করিয়া? আপনি বিজ্ঞ, আপনি জ্ঞানী, আপনাকে আমি কি বলিব বা কি বুঝাইব? এ সংসারে

কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি. আপনার আশীর্ব্বাদে এতদিন সুশৃঙ্খলায় কর্ম্ম চালাইতেছি, আপনারই করুণায় যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছি, মনে পাপ নাই, তবে যদি বুদ্ধির দোষে এমন কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, এমন কোন কথা লিখিয়া থাকি, যে, তাহাতে রাজদণ্ড পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে তাহাই হইবে ; তাহার জন্য বিচলিত হইলে চলিবে কেন ?” যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতৃদেব তখন একটু শান্ত হইয়া বলিলেন,—“যাহা হইবার তাহা হইল, যাহা হইবার তাহা হইবে, বুঝিতেছি বিধাতার লিখন খণ্ডাইবার নহে। তবে তোমাকে আমার চক্ষুর সম্মুখে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, এই ভাবনাটা যেন বড় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যাহাতে সেটা না হইতে পারে, তাহার কি কোন উপায় করিতে পার না ?”

যোগেন্দ্র চন্দ্র বলিলেন,—“তাহার উপায় আমি একটা করিয়াছি। তবে আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমাকে কেহ মারিয়া ধরিয়া বা বাঁধিয়া লইয়া যাইবে না। ইংরাজ রাজত্বে তাহা হইবার যো নাই। আমার নামে এখন কেবল অভিযোগ বৈত নয় ; আমি দোষী কি নির্দ্দোষ বিচারে তাহা সাব্যস্ত হইবে। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ আমাকে কেহ ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে না। তবে আমাকে যাইতেই হইবে।”

যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতা বলিলেন,—“এখনই এই মুহূর্ত্তে পুলিশের সঙ্গে না যাইলে কি চলিতে পারিবে না ?” যোগেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন,—“আজ পুলিশের সঙ্গে যাইলে আমাকে হাজতে থাকিতে হইবে। আজ যদি আমি না যাইয়া এই সহরের অন্য কোনস্থানে থাকিতে পারি, আর কাল যদি আমার পক্ষীয় কোন উকীলের সহিত আমি গিয়া আদালতে হাজির হই, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না।”

যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতা বলিলেন,—“তোমাকে আর কোথায় কে এ বিপদে স্থান দিবে ?”

যোগেন্দ্রচন্দ্র এ সমূহ বিপদেও একটু মৃদু হাসিয়া পিতাকে বলিলেন,— “বাবা এতকাল “বঙ্গবাসী” এত লোকের সেবা করিয়া আসিল, আজ আমার এই দুর্দ্দিনে, আমার এই বিপদে এ সহরে এমন কি কেহই নাই যে, আজিকার রাত্রির জন্য আশ্রয় দিবে ?”

যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই কথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতৃদেব অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। ফলে, পুত্রের অচাঞ্চল্য-দর্শনে তাঁহার চাঞ্চল্যটুকু চলিয়া গেল। পিতা-পুত্রের এ অচাঞ্চল্য মুহূর্ত্তে সমগ্র পরিবার-মণ্ডলীর উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিল।

অতঃপর অচল বিরাট পুরুষ যোগেন্দ্রচন্দ্র একাকী একখানি গাড়ী করিয়া বাটীর বাহির হইলেন। তিনি সমস্ত সহর ঘুরিলেন; কোথাও তিনি আশ্রয় পাইলেন না। পূর্ব্বে এই সহরের অনেক বড়মানুষ—অনেক শক্তিশালী পুরুষ "বঙ্গবাসী"র আফিসে যাতায়াত করিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটু সৌহার্দ্দ্য-স্পর্শে আপনাদিগকে অনুগৃহীত মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে একটী রাত্রির জন্য আশ্রয় দিলেন না। ইহাতেও যোগেন্দ্রচন্দ্র বিচলিত হন নাই। তিনি স্থির করিলেন,—যদি কোন স্থলে আশ্রয় না পাই, তাহা হইলে আজই আমি আপনি গিয়া পুলিশে হাজির হইব। তিনি একবার চিন্তা করিয়া লইলেন, আর কোথাও আশ্রয় পাইবার স্থান আছে কি না? শেষ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—এই শেষ! একবার প্রিয় বন্ধু শ্রেষ্ঠ নটকবি গিরিশচন্দ্রের নিকট যাই। তিনি উদার। তিনি উন্মুক্ত-হৃদয়; তিনি পর-হিতৈষী; তিনি বন্ধু-বৎসল। তিনি নিশ্চিতই আজ আমায় আশ্রয় দিবেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র তখনই গিরিশচন্দ্রের বাটীতে যাইলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অবশ্য এ বিপদ-সংবাদ পান নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্র কখনও গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে যান নাই, বিশেষ অমন সময়ে। তখন অপরাহ্ণ। গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে "বঙ্গবাসী" অফিসে আসিতেন, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র যে তাঁহার বাড়ীতে সহসা যাইবেন,—একথা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাই তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর যোগেন্দ্রবাবু সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন,—"যোগেন বাবু বলিহারি! আপনার এই বিপদের কথা শুনিয়া সত্য সত্যই বলিতে কি আমি চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু আপনি যখন এইখানে

আসিয়া উপস্থিত হন, তখন একটুও ভাবি নাই যে আপনার এমন বিপদ উপস্থিত। অনেককেই বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বিপদে এমন অবিচলিত হইতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখি নাই। আপনার জননী রত্নগর্ভা।" যোগেন্দ্রচন্দ্র তখন বলিলেন, "ও সব কথা যাক। আপনি আজিকার রাত্রির জন্য আপনার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পারেন কি না?" ভাবা চিন্তা নাই,—গিরিশচন্দ্র অম্লানবদনে বলিলেন,—"যোগেনবাবু ও কি কথা বলিতেছেন? আপনি বিপদে ভয় পান নাই; এই ভাবের প্রভাব কি ব্যর্থ হইতে পারে? হয়ত ভয় পাইতাম, যদি আপনি পাইতেন। অধিক আর আর কি বলিব আপনি ঐরূপ ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাতেই আমি লজ্জিত।" যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই রাত্রিতে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতেই আশ্রয় পাইলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র মানুষ; গিরিশচন্দ্রও মানুষ। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত সুলেখক থাকিতে পারে, গিরিশচন্দ্রের মত কবিও থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মানুষ কয়জন? যোগেন্দ্রচন্দ্র চির আত্মনির্ভর; গিরিশচন্দ্রও চির আত্মনির্ভর। আত্মশক্তির উপর যে চির-নির্ভর, সে এমনই নির্ভীক হইয়া থাকে, আর সেই মানুষ। গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন,—'It is selt-help which makes man."

পরদিন প্রাতে যোগেন্দ্রচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের বাটী হইতে অন্য একটী বন্ধুর বড়ীতে যান। তিনিই তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া কোন উকীলের সহিত পুলিশে হাজির করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

জামিনের প্রার্থনা হইল; কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না। পুলিশ ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত অরুণোদয় রায়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত একই সময়ে পুলিশে হাজির হইয়াছিলেন। অবশ্য পুলিশ যে সময়ে "বঙ্গবাসী" অফিস ঘেরাও করেন, সেই সময়ে শ্রীযুত অরুণোদয় রায় অফিসে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই হাজতে রহিলেন। "বিপদি ধৈর্য্যম্।" যোগেন্দ্র-চন্দ্র তেমনই অচল অটল। পুলিশের বিচারে আসামীরা হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হন। সে বিচার অনেকেই দেখিয়াছেন। বিচারকালে যিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র.ক দেখিয়াছিলেন, তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র

সজীব সাকার "বিপদি ধৈর্য্যম্।" প্রসিদ্ধ শক্তিশালী ব্যারিষ্টার জ্যাক্‌সন সাহেব আসামীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। দায়রার বিচারে সকল আসামী জামিনে খালাস পা ইয়াছিলেন। পুলিশ আদালতে জামিনের জন্য প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। এই জামিনের ব্যাপারে কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন যে মনুষ্যত্ব-মহত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত অধুনা বিরল। অনেকেই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আশ্রয় দেন নাই এবং অনেকেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের জামিন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জামিন হইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্য, শ্রীযুত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য, শ্রীযুত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এবং বিখ্যাত অক্ষর-নির্ম্মাতা স্বর্গীয় যদুনাথ সান্ন্যাল মহাশয় শ্রীযুত অরুণোদয় রায়ের জামিন হন। এই মকদ্দমার সময়ে হাইকোর্টে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে লইয়া ব্যারিষ্টারে ব্যারিষ্টারে যে একটু রঙ্গ-রস হইয়াছিল, সেই রঙ্গ-রসে চিরগম্ভীর অটল অচল যোগেন্দ্রচন্দ্র সে বিপদের সময়েও তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু হাসি-টুকুও লুকাইতে পারেন নাই।

"বঙ্গবাসী"তে এইভাবে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল যে, আজকাল দুর্ম্মূল্যতার জন্য অনেকেই খাইতে পায় না। অবশ্য এই কথাটির জন্য অভিযোগ নহে; অভিযোগের কারণ,—আরও কয়েকটি প্রবন্ধ। কিন্তু ঐ কয়েকটি কথা-সম্পর্কে আদালতে একটু রঙ্গরসের অভিনয় হইয়াছিল। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার ইভান্স সাহেব যোগেন্দ্রচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—"যদি দেশের লোক খাইতে না পায়, তাহা হইলে উনি অমন গতর-ওয়ালা হইলেন কিসে?" যোগেন্দ্রচন্দ্র অবশ্য বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ স্থূলকায় ছিলেন। জ্যাকসন সাহেব ইভান্স সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"সকল সময়ে খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কি ঘটাইতে পারা যায়? চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ বলকারক দ্রব্য আহার করিয়াও যে অনেকে পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে হইয়া থাকেন, তাহা দেখা যায়। আমার বন্ধুবর ইভান্স সাহেবের আহারের কোন অভাবই নাই। তবে উনি অমন পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে কেন?"

বিচারে জুরীর ভিতর মতদ্বৈত হয়। ফলে পুনরায় জুরী গঠন করিয়া বিচার হইবার কথা হইয়াছিল। আর বিচার হয় নাই। আসামীরা দুঃখপ্রকাশ করিয়া এবং ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হন।

বন্ধনে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে যেমন দেখিয়াছিলাম, মুক্তিতেও তেমনই দেখিয়াছি। তিনি বন্ধনে চোখের জল ফেলেন নাই; মুক্তিতেও আনন্দে নৃত্য করেন নাই। তিনি পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। এ হেন প্রিয়তম জনের বিয়োগে তাঁহার বুকের ভিতরে কি হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু বাহ্যে বিষাদ-অবসাদ তিলমাত্র আত্মপ্রকাশ করে নাই। এক মুহূর্ত্ত ব্যতীত তিনি সারাজীবনে কখনও কোন কথায় শ্রান্তি-ক্লান্তি বোধ করিতেন কি না, তাহা বুঝিবার অবকাশ দেন নাই। তাঁহার জ্বর হইলে তিনি জ্বরের বেগে কোন যন্ত্রণার অনুভূতি কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না; তবে জ্বরের আবেগে তিনি কেবল ইংরাজী কবিতা, বাঙ্গালা কবিতা প্রভৃতির আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার জীবনাবসানের কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার জিহ্বায় ক্ষত হইয়াছিল; সে ক্ষত নিশ্চিতই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তিনি কোন দিন যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি কথা কহিতে পারিতেন না; যাহা কিছু তাঁহার বলিবার থাকিত, তাহা তিনি লিখিয়া দেখাইতেন। সে ক্ষতে অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অস্ত্র চলিতেছে; যোগেন্দ্রচন্দ্র অটল অচল। একটী দিন কেবল তাঁহার ক্লান্তি ও শ্রান্তির ভাব বুঝিবার অবকাশ ঘটিয়াছিল, সেই প্রথম ও সেই শেষ।

জীবনাবসানের কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার নিত্য জ্বর হইত। তিনি ঘাটশিলা, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন। ফলে তিনি কতকটা সুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু আবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। জ্বর কমিয়াছিল; কিন্তু আহারে রুচি ছিল না। আবার মধুপুরে স্থান পরিবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত হয়। মধুপুরে যাইবার দিনে সন্ধ্যার সময়ে বাহিরের ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে প্রেস, বাঙ্গালা বঙ্গবাসী, হিন্দী বঙ্গবাসী, টেলিগ্রাফ, পুস্তক-বিভাগ

প্রভৃতির কার্য্য-ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। যে যে বিভাগের যিনি যিনি কর্ত্তা, তাঁহাদের প্রত্যেককে ডাকাইয়া প্রত্যেক বিষয়ের ব্যবস্থা-পরামর্শ দেন। এই সময়ে শ্রীযুত বিহারিলাল সরকার যোগেন্দ্রচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি জ্বর হয়?" যোগেন্দ্রচন্দ্র যেন একটু ব্যাকুলভাবে বলিলেন,—"বিহারীবাবু জ্বরে ভয় করি না; কিছু যে খাইতে পারিতেছি না। এমন অরুচি ত আমার জীবনে হয় নাই।" এই কথার পর কর্ম্ম-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইয়াছিল। একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন। কেবল বিহারীবাবু ও আর দুই একজন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র একবার বলিয়া উঠিলেন,—"আর পারি না।" এই বলিয়া তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠার কাল হইতে আর মধুপুর যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই বিরাট স্থূলকায় পুরুষ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুপুর একটা পর্য্যন্ত নানা কাজ করিতেন, বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ছিল না, কার্য্য-পরিচালনের ব্যবস্থা, লিখিবার ও লিখাইবার ব্যবস্থা, একটা না একটা বিষয় লইয়াই থাকিতেন। কত লোকের সঙ্গে কত বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক-কালে কতই না কথা কহিতে হইত। বিরাট পুরুষ, বিরাট কাজ। মহাবীর মহাকর্ম্মী। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের মুখে কখনও কেহ "আর পারি না" কথা শুনে নাই। কিন্তু সেই একদিন কেবল একটীবার মাত্র তিনি বলিয়াছিলেন,—"আর পারি না।" বিহারীবাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রের ছায়াস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, কিন্তু তিনি কখনও এমন কথা শুনেন নাই, সেইদিনই শুনিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া বাস্তবিক বিহারীবাবু ভীত চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। আশু বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মনে একটা চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। যিনি জীবনে কখনও এমন কথা বলেন নাই, বুঝি বা তাঁহার জীবনাবসান আসন্ন। ফলে হইলও তাহাই। যোগেন্দ্রচন্দ্র মধুপুরে যাইলেন, তিনি সেই রুগ্ন অবস্থায় মধুপুরে কি অসাধারণ অধ্যবসায়ে, অসামান্য পরিশ্রমে কর্ম্ম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার পরিচয় দিয়াছি। দারুণ রোগের পেষণে এবং কর্ম্মের পীড়নে যোগেন্দ্রচন্দ্র তখনও আর বলেন নাই,—"আর পারি না"; কিন্তু সেই একটিবার "পারি না" কথাটি শুনিয়া বিহারীবাবু যে আশঙ্কায় বিহ্বল

হইয়াছিলেন, একমাস পরেই সে আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইল। যোগেন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বিপদে ধৈর্য্যের যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি মানুষ হইতে চাহেন, তিনি তাহা ভুলিবেন না। তাঁহার ধৈর্য্যের দৃষ্টান্তে প্রবন্ধ "অর্ঘ্যে"র মাপকাটি ছাড়াইয়া গেল, কাজেই অভ্যুদয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত আমরা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

সাগর-স্মরণে।

ভূপালী—একতালা।

কেন জাগে না জাগে না প্রাণ,
  হে সাগর গরীয়ান্!
জাগাইতে নিত্য সত্য
  তোমার জীবন-গান।
কি করুণ প্রাণে দিতে কত জ্ঞান,
জাগায়ে তুলিতে জননীর ধ্যান,
শিখাতে আদর্শে দম-দয়া-দান,
    কে পারে শিখাতে তোমার সমান।
যে বঙ্গ-সাহিত্যে, যে বঙ্গ-ভাষায়,
আজি মধ্যমণি উজলে বিভায়
তুমি না সৃজিলে কে সৃজিত তায়
    কে রাখিত বঙ্গজননীর মান।
হে দয়াল দাতা বিধাতা ভাষার,
স্মরণের দিন যাচি বার বার,
ভেঙ্গে যাক্ ভুল মোহের বিকার,
    বরিষ আশিষ, জগত-কল্যাণ॥

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্ত্তক।

——:•:——

গত বৈশাখের "প্রবাসী"তে শ্রীযুত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ" প্রবন্ধ-পাঠে এত শীঘ্র এ প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইল। বহুদিন হইতে অভিলাষ ছিল, যে সকল মহাত্মা বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ছন্দে অলঙ্কৃত করিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কাব্যের দোষগুণ-বিচার ও তাঁহারা এ ব্রতে কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃতছন্দে বাঙ্গলা কবিতা রচনা সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় কি না তাহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিব; কিন্তু এখন উপরোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের দুই একটী ভ্রম সংশোধন করিবার সুযোগে অনেক সুকবি ও বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দে কাব্যরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান, এবং তৎসহ তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ও তাঁহার ব্রতসাফল্যের কিঞ্চিৎ আভাসদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "কবি হেমচন্দ্র তদীয় মাইকেলের জীবনীর একস্থানে সংস্কৃতছন্দে রচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রন্থখানি দুর্লভ, আমার হস্তগত হয় নাই, এই পুস্তকের নাম "ছন্দঃকুসুম", রচয়িতা ভুবনমোহন "চৌধুরী"। একখানি আন্দাজ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পাণ্ডবচরিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে।"

প্রবন্ধ-লেখক কয়েকটি গুরুতর ভুল করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে তত দোষ দিতে পারি না। তাঁহার সিদ্ধান্ত ও উক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুমান-মূলক; কারণ গ্রন্থখানি অতিশয় দুর্লভ, দুই একখণ্ড ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন, 'রচয়িতা ভুবনমোহন "চৌধুরী"রচয়িতার উপাধি বস্তুতঃ চৌধুরী নহে, তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত টাকী-শ্রীপুর গ্রামের জমীদার সুপ্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশ-সম্ভূত, টাকীর স্বনামধন্য জমিদার, পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ইঁহার সমশ্রেণী। কবি ছন্দঃকুসুমের ছন্দোময়ী ভূমিকার উপসংহারে আত্মপরিচয়-প্রদানকালে বলিয়াছেন:—

(অনুষ্টুপ্ ছন্দ)

ভূমিকারূপকাভাসে, কহে ভুবনমোহন।
জাতি বঙ্গজ কায়স্থ, উপাধি রায়চৌধুরী॥

ইহা ১২৭০ সালে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়, ইহা বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ-প্রবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রথম প্রয়াসের ফল। প্রবন্ধলেখকের অন্য একটি গুরু ভ্রম এই যে, ছন্দঃকুসুম গ্রন্থে পাণ্ডব-চরিত বিবৃত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। পাণ্ডব-চরিত অপর একখানি কাব্যগ্রন্থ, ইহা ছন্দঃকুসুমের অঙ্গীভূত নহে। কবি নিজেই ছন্দঃকুসুমের বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

(অনুষ্টুপ ছন্দ)

আদৌ মঙ্গল আচারে ঈশ্বর স্তুতি বন্দনা,
কৃষ্ণরূপের সদ্ব্যাখ্যা, এবং দেবাদি বর্ণনা।

*　　*　　*　　*

পশ্চাতে কাব্য আরম্ভে সংক্ষেপে হরিবন্দনা।
তৎপরে কাব্য আকারে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা॥

কৃষ্ণ মানভিক্ষাচ্ছলে "ছদ্মবেশিনী" হইয়া রাধার নিকটে ভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, রাধাকৃষ্ণের সংযোগে যুগ্ম বিরহ বর্ণনা করিয়া বৃন্দারণ্যের সৌন্দর্য্যে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। তবে পাণ্ডব-চরিতের সহিত ছন্দঃকুসুমের যে একটু সম্বন্ধ আছে, তাহা সাহিত্যামোদীর প্রীতিকর হইবে,—এই আশা করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কবি হেমচন্দ্রের সহিত ভুবনবাবুর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল, উভয়ের মধ্যে কাব্যরচনাবিষয়ে সময়ে সময়ে বহু তর্ক উপস্থিত হইত। হেমবাবু যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা ভুবনবাবুকে না দেখাইলে যেন তৃপ্তিলাভ করিতেন না, এবং ভুবনবাবুর রচিত কবিতাও হেমবাবুর দৃষ্টির বাহিরে থাকিত না। বন্ধুত্ব যখন খুবই ঘনীভূত হইতে লাগিল, তখন হেমবাবু মাঝে মাঝে ভুবনবাবুর ভবানীপুরস্থ ভবনে পদার্পণ করিতেন, উনিও হেমবাবু কর্ত্তৃক অনেক সময় তদীয় গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন, উভয়ে এক ধ্যানে এক মনে মাতৃভাষার চরণে কবিতা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন, উভয়ে একই সাধনায়, একই ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পথের

বিভিন্নতা ও কালধর্ম্মের আনুকূল্যে একজন সিদ্ধির উচ্চচূড়ে আরোহণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণসিংহাসন পাতিয়াছিলেন ও অপর একজন সাময়িক লোকমতের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাৎকালিক বিদ্বজ্জন-সমাজে যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন ও একজন সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন মাত্র।

তখন অমর কবি মধুসূদনের মেঘ-মল্লার বঙ্গদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা রচনা ভুবনবাবুর ভাল লাগিল না। জননীর ভাণ্ডারের বহুবিধ মণিমুক্তা ত্যাগ করিয়া পরধনলোভে মত্ত হইবার প্রবৃত্তি জন্মিল না। তিনি মাতৃভাণ্ডার হইতে সঞ্চিত রত্নরাজি লইয়া মাতার কমকলেবর ভূষিত করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, তাঁহার অবিরাম পরিশ্রম, অসীম উদ্যম ছন্দঃকুসুমেই প্রকটিত। ভুবনবাবু ছন্দঃকুসুম প্রণয়ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত প্রত্যেক ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করা যাইতে পারে। তবে, কতকগুলি ছন্দ বাঙ্গালা কবিতার পক্ষে বড়ই অনুকূল।

ছন্দঃকুসুম রচিত হইল, ভুবনবাবু তাহা কবি হেমচন্দ্রকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না। হেমবাবু স্বগৃহে ভুবনবাবুর সাক্ষাতে ছন্দঃকুসুম পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কবি হেমচন্দ্র ছন্দঃকুসুম-প্রণেতার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অমানুষী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, আপনি প্রত্যেক ছন্দের উদাহরণস্বরূপ এক বা ততোধিক কবিতা বহু কষ্টে রচনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিক কবিতা রচনা করা দুঃসাধ্য। তদুত্তরে ভুবনবাবু বলিলেন যে, আমি প্রত্যেক ছন্দের ঐ দুই একটী কবিতার অনুরূপ বহু কবিতা রচনা করিয়া উহা যে দুঃসাধ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারি। কিন্তু তখন হয়ত আপনি বলিবেন যে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কবিতা লেখা অসম্ভব। তবে কিরূপে আপনার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? হেমবাবু বলেন যে, যদি আপনি এইরূপ সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে এক এক ছন্দে এক এক সর্গ নিবদ্ধ করিয়া বহু ছন্দে একখানি কাব্য লিখিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার আর কিছু বলিবার থাকে না। ভুবনবাবু প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহারই ফলে পাণ্ডব চরিত কাব্য রচিত হইল। ছন্দঃ-

কুসুমকে অধিকতর বিকসিত করিবার অভিপ্রায়েই পাণ্ডবচরিত বিরচিত হইল। তখন হেমবাবুর মুখে ভুবনবাবুর প্রশংসা ধরে না। তিনি গল্পচ্ছলে তাঁহার সুহৃদবর্গের নিকট ছন্দঃকুসুম ও পাণ্ডবচরিতের ভূয়সী প্রশংসা ও ভুবনবাবুর অদ্ভুত কবিত্বশক্তির জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। সেইদিন হইতে কবিযুগলের সখ্যভাব আরও ঘনীভূত হইতে আরম্ভ হইল। হেমবাবু তখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, "হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দ রচনা হইতে পারে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা বিরচিত হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই।" (মেঘনাদ বধের ভূমিকা)।

ছন্দঃকুসুম গ্রন্থখানি গঙ্গাদাস-বিরচিত ছন্দোমঞ্জরী ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য-প্রণীত বৃত্তরত্নাবলীকে ভিত্তি করিয়া লিখিত, ইহা একযোগে ছন্দ পুস্তক ও কাব্যগ্রন্থ। কিরূপে প্রকৃত সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা লিখিতে হইবে, তাহার লক্ষণ ছন্দে নির্দ্দেশ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কবিতাদ্বারা উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি ছন্দঃকুসুম নামকরণের হেতু নিজেই প্রদর্শন করিয়াছেন।

(অনুষ্টুপ্)

মাত্র সংস্কৃত ভাষাতে, সে ছন্দোমঞ্জরী ছিল।
সাধারণের বোদ্ধব্যা, ছিল না সেই কারণে॥
অনেকে বুঝিতে পারে, তার সৌরভ মাধুরী,
সুতরাং মঞ্জরী ভাবে, রহিয়াছে নিরন্তর।

*   *   *   *

অতএব পুরাকালে, যে ছন্দ ছিল মঞ্জরী
ইদানীং কুসুমাকারে সে হইল বিকাসিত॥

*   *   *   *

গ্রন্থের নাম এজন্যে, ছন্দঃকুসুম পুস্তক॥"

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে একদীর্ঘ ছন্দোময়ী ভূমিকা, তাহাতে সংস্কৃত ভাষাদেবীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা, প্রাকৃত ভাষার দুরবস্থা-খণ্ডনার্থ উপায়চিন্তা, সংস্কৃত কর্ত্তৃক দেশ-ভাষার দৈন্যখণ্ডন প্রভৃতি যথাক্রমে অনুষ্টুপ্ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিকার পর সর্ব্বপ্রথমে দীর্ঘ সারবতী ছন্দে দশাবতারের স্তব, পরে ভুজঙ্গ-

প্রয়াত ছন্দে ভগবানের স্তব ও সর্ব্বশেষে দ্রুতবিলম্বিতছন্দে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি কবিতা অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে, পদের লালিত্যে, অর্থগৌরবে, উপমাপ্রয়োগে এবং যতি ও মাত্রার অভ্রান্ত নির্দ্দেশে অতি উচ্চাঙ্গের ও লেখকের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। আমরা প্রত্যেক কবিতা হইতে দুই চারি চরণ করিয়া উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

দশাবতারের স্তব।

দীর্ঘ সারবতী।

১ ৪ ৭ ১০
উদ্ভব-পালন-নাশন-কারণ, মাধব কেশব পাতক বারণ।
কচ্ছপ মূর্ত্তি পিঠে ক্ষিতিধারণ, শূকর আকৃতি দৈত্যবিদারণ॥

ভগবানের স্তব।

ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ।

• ২ ৩ • ৫ ৬ ৮ ৯ • ১১ ১২
নমঃসৎ চিদানন্দ আনন্দদায়ী, মহাসিন্ধুশায়ী অনন্তাবলম্বে।
অ হে দীনবন্ধো পরিত্রাণ কর্ত্তা, কর ত্রাণ দীনেশ দীনে অপাঙ্গে॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা।

দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ

• • • ৪ • • ৭ ১০ • ১২
জলদ নীলিমরূপ মনোহর চরণকান্তি নবীন দিবাকর,
বসন পীত সুভঙ্গি কলেবর, কুসুম মাল্য গলে নবনাগর॥
শ্রবণ ভূষণ মাণিক কুণ্ডল, শিরসি শোভিত কুঞ্চিত কুন্তল।
শশিবিনিন্দিত তনুমুখমণ্ডল, দর্শনমৌক্তিক পংক্তি সুশৃঙ্খল॥

ইহা সহজ, শ্রুতিমধুর, অথচ সংস্কৃত ছন্দের রীতি সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া লিখিত।

ছন্দঃকুসুমের মধ্যে ১৮৩টি মূল সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় ছন্দঃ-আকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির একাধিক উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে। একাক্ষরা শ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পজ্ঝটিকা পর্য্যন্ত সমূহ ছন্দের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে ১৫টি পারসী ছন্দের লক্ষণ বলিয়া কবিতায় লিখিত হইয়াছে। পারসী ছন্দের যতি ও লক্ষণ ঠিক রাখিয়া সেগুলি বঙ্গভাষায়

প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ছন্দের দুই তিনটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পারসী ছন্দগুলির বাঙ্গালা নাম কবির স্বকপোল-কল্পিত, আমরা ক্রমে ক্রমে দুই চারিটির উদাহরণ প্রদান করিব।

একাক্ষরাবৃত্তি।

শ্রী—

১
শ্রী যে, মাসে।

দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি।

স্ত্রী।

১ ২
যোগী সর্ব্বে কৃষ্ণে বন্দে।

ত্র্যক্ষরা বৃত্তি।

নারী।

১ ২ ৪
মূঢ়েরা শ্রীকান্তে, চিন্তে না একান্তে॥

শশিবদনা।

০ ০ ০ ০ ৫ ৬
যদি কর পদ্মে, কর মতি দানে
কহি তব কাছে, মম মন বাঞ্ছা

সারবতী

১০ ০৪ ০০ ৭০ ০১০
প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা।
মান বশে হয় গর্ব্ব মনে ; গর্ব্বিত বঞ্চিত সখ্য সুখে।

প্রহরণ কলিকা—৭ যতি।

০ ০ ০ ৪ ০ ০ ৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৪
মুদিত কুমুদিনী বিকসিত নলিনী
অলিকুল বিহরে পিকবর কুহরে।
মলয়জ পবনে মৃদু মৃদু বহিছে,
সুকুম সুরভি প্রচারিত বিপিনে॥

এইরূপে একটির পর আর একটী কবিতা, কতই বা উদ্ধৃত করিব? কবিতা

গুলি আপনার ভাবে, ঝঙ্কারে, শব্দসম্পদে ছন্দঃকুসুমকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে, আমরা সংস্কৃত ছন্দ হইতে আর দুইটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পারসী ছন্দের পরিচয় প্রদান করিব।

মালিনী। ৮।৭ যতি

০০৭ ০০০ ৭৮ ৯০১১ ১২ ১৪ ১৫
জনন মরণ কিম্বা স্বপ্নমূর্চ্ছা প্রভাবে,
সকল ভুবন মাঝে অন্ধকারে প্রপূর্ণা।
বিফল করিনু চেষ্টা কৃষ্ণ না দেখিবারে
অবিচল নিরুপায়ে হৈল মিথ্যা প্রতিজ্ঞা॥

সুদনা ৭।৭।৩ যতি

১২৩ ৪০ ৬৭০০ ০০ ০০ ১৪ ১৫ ১৬ ০০০২০
কৃষ্ণাঙ্গে ভৃঙ্গ শোভাকর গুণু গুণু সঞ্চারে মন হরে
ভুঞ্জে কুঞ্জে নিকুঞ্জে বহুবিধ মধু সে গুঞ্জে মৃদুরবে।
সারগ্রাহী সমাজে মধুকর নিকরে প্রাধান্য গণনা,
সারাৎসারে করে সংগ্রহ গতরসাসারে রত নহে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গভাষায় পরিবর্ত্তিত দুই একটী পারসী ছন্দের উদাহরণ দিয়া ছন্দের পরিচয়কার্য্য সমাধা করিব।

সুমালী।

১ ২ ০ ০ ৫ ০৭০৯১০
সংযোগে সুখে নবানুরাগে, রাধা সহ সে মুরারি বৈসে।
সেবা করিছে ব্রজাঙ্গনারা, যোগী সকলে যথা মহেশে॥

নৃত্যকরী।

১০০৪৫ ০০৮ ৯০১১
পঞ্চমরাগে কুহরে কোকিলে, শাপিল্প তাহে পতিহীনা সতী
যে দিন সন্তাপ বিনা কারণে, সে সহিবে শুদ্ধ মনোবেদনা।

১০০ ৪৫০০ ৮৯০১১
কোকিল ডাকে কুহু শুনতে কুহু, সে কুহু না কুহুভাবে উহু।
মিষ্ট রবে যেমন হা হা হু হু, শব্দ করে কেবল উহু উহু॥

সর্ব্বশেষে করকাগতি ছন্দে সমাপ্ত হইয়াছে। করকাগতি,—"অষ্টৈস্থিত যতি হয় করকাগতি অষ্টাবিংশতিমাত্রা।"

হরি চরিত ভুবনমোহন রায় কহে কত ললিত রহস্তে
বহুবিধ নব নব পদ্য মনোহর রুচিকর বিজ্ঞ মনুষ্যে।
চলিত বচন অনুরোধ বিসর্জ্জন করিয়া অক্ষর পড়িলে,
শ্রাব্য মধুর হইবে পরমাদৃত উচিতোচ্চারণ করিলে।

উপরোক্ত ছন্দের নাম ও লক্ষণ নূতন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা যতির ব্যত্যয়ে এবং মধ্যে চমৎপ্রদ শব্দে রচনা করিলে নানা প্রকার সুশ্রাব্য ছন্দ গীতিস্বরূপে উৎপন্ন হয়, সংস্কৃত পদ্যে শ্রীজয়দেব-কৃত "গীত গোবিন্দে" যথা—

রজনিজনিত গুরু জাগর রাগকষায়িতমলসনিমেষং।
রহতি নয়নমন্ধ রাগমিব স্ফুট মুদিত রসাভিনিবেশং॥

কাব্যহিসাবে যদিও ছন্দঃকুসুম আধুনিক কাব্যশ্রেণীর সহিত 'খাপ' খায় না, তাহা হইলেও কাব্যচ্ছলে কৃষ্ণলীলা ও মানভিক্ষা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বহুবিধ রসাবতারণে, সুন্দর উপমা-প্রয়োগে, নূতন ভাবসম্পদে অতি উপাদেয় হইয়াছে। কোথাও কুরুচির লেশ মাত্র নাই। কোথাও জটিলতা বা কষ্টকল্পনার ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবিকই কবির "বহুবিধ নব নব পদ্যমনোহর রুচিকর বিজ্ঞ মনুষ্যে" উক্তি ফলবতী হইয়াছে। তাঁহার ছন্দঃকুসুম যে সে সময়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় ভুবনবাবুর রচিত পাণ্ডব চরিত কাব্যের ভুমিকা-পাঠে জানা যায় যে, তিনি ছন্দঃকুসুম-প্রণয়ণের জন্য তাঁহার সমসাময়িক সুধীবর্গের নিকট বহুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং আদৃত ও সুপরিচিত হইয়াছিলেন। কতিপয় বর্ষ মধ্যে দুইজন গ্রন্থকার প্রথমে ৺লালমোন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বরচিত "কাব্যনির্ণয়" নামক পুনর্মুদ্রিত ভাষা-অলঙ্কার-গ্রন্থমধ্যে উক্ত ছন্দঃকুসুমের কতিপয় শ্লোক উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদনন্তর সঙ্গীতাচার্য্য ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় স্বকৃত যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক গ্রন্থের মধ্যে উক্ত ছন্দঃকুসুমের দুইটী শ্লোক ব্যতীত প্রায় অর্দ্ধভাগের সমুদয় কবিতা যথাক্রমে অবিকল গ্রহণ ও সন্নিবেশিত করিয়া ভুবনবাবুকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় ঋণগ্রহণ স্বীকার করেন নাই বলিয়া

তাৎকালিক সমালোচকবর্গের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারেন নাই। ছন্দঃ-কুসুমের পর হেমবাবু-প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ বঙ্গভাষার সংস্কৃত-ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াও ভুবনবাবুর পুস্তককে পুরস্কৃত করিয়াছেন। ছন্দঃকুসুম-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ হইল। আগামী মাসের সংখ্যায় কবির পাণ্ডব রচিত কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিব।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।*

—:*:—

আমরা যে এই শোক-সভায় সমবেত হইয়াছি,—ইহা শোকপ্রকাশের জন্য নয়। শোকাতুর তাঁহার পরিবার—সে শোকের আঘাত, আমাদের হৃদয়ে বাজে না,—বাজিতে পারে না। তাহা যদি বাজিত, তাহা হইলে এই সমবেত, জনবৃন্দ, "বিপিনবাবু বক্তৃতা করুন" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতেন না। তবে আমরা কিসের জন্য এখানে আসিয়াছি? মৃত কবির তর্পণের জন্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল কত বড় কবি ছিলেন, এস্থান তাহার বিচারক্ষেত্র নয়। সে বিচারের কাল এখনও আসে নাই; সে বিচার এখন আমরা করিতে পারিব না। সে বিচার করিবে ভবিষ্যৎ। এখনও আমাদের প্রাণে তাঁহার তপ্ত মূর্ত্তি জাগ্রৎ, এখনও তাঁহার বিয়োগযন্ত্রণায় আমাদের হস্ত কম্পিত, এই হস্তে 'ওজনদাঁড়ী' ধরিবার শক্তি কোথায়? আমরা তাঁহার কাব্য বিচার করিব না, আমাদের পরে যাহারা আসিবেন, তাঁহারা সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমরা তাঁহার জন্য শোক করিব না, শুধু তাঁহার তর্পণ করিব। আমরা এখানে কাঁদিতে আসি নাই—আমাদের চোখে তাঁহার জন্য অশ্রু আসিবে না।

আমার ত মনে হয়, কবি—ঋষি। তাঁহার সাধন ফলে জগৎ উন্নত হয়। আমাদের সাধারণ সংসার, সাধারণ সমাজ, আমাদের চরিত্র, আমাদের

---

* সাহিত্যপরিষদ এবং টাউন হলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সম্মানার্থ দুইটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই দুইটী সভাতেই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার।

কার্য্য—এইরূপ শতবিধ ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া কবি কাব্যরচনা করেন। কিন্তু সেই কাব্য কখনও বিশ্বের ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ থাকে না—কবির মহাসাধনায় বিন্দু ক্রমে সিন্ধুতে পরিণত হয়, কবির কবিত্বগুণে জীবের মধ্যে শিবের ছায়া পতিত হয়। কবি, আমাদের মত সাধারণ মানবমাত্র নহেন, তিনি মনীষী, তিনি ঋষি।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে সাধনালব্ধ ফল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মধ্যে কাহারও আনন্দলাভ হয়, কাহারও শিক্ষালাভ হয় এবং কাহারও বুঝি বা—একটু হিংসাও হয়। কিন্তু কবি যে চক্ষে এই দৃশ্য এবং এই বিশ্বদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমরা কি ঠিক তেমন ভাবে তাহা দেখিতে পারি?

কবি এক অসাধারণ দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎকে দর্শন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি ছিল। এদেশের এই শারদীয় পৌর্ণমাসী আমরা সকলেই দেখিয়াছি, এই প্রত্যহের সূর্য্যোদয়, এই বিশাল শ্যামলতার রাজ্য আমাদের সকলেরই চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত, এই বিবিধ দৃশ্য দর্শন করিয়া, সেই দৃশ্য-বৈচিত্র্যের খণ্ডাংশগুলিকে একত্র করিয়া আর কে এমন মাতৃমূর্ত্তি রচনা করিতে পারিয়াছে? এমনভাবে আর কাহার মনে হইয়াছে, এদেশ "সকল দেশের সেরা।" "ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ইহা একটী মহান্ সঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে—ইহা কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া রচিত নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া কেবল আমি মুগ্ধ হই না, তুমি মুগ্ধ হও না—আমি যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী হইয়া না জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও এই সঙ্গীত আমার ভাবের সাগরে ঢেউ তুলিত। এই গানকে ইংরাজীতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে, আমাদের দেশ-মাতাকে পরের মা বলিবা ঘৃণা করিবে না। এই গানকে রুষিয়ার ভাষায় তর্জ্জমা কর, যদি তাহা এমনি সুন্দর ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদিত হয়,—তাহা হইলে রুসিয়ানেরাও এই নামকীর্ত্তনে বিগলিতপ্রাণে যোগদান করিবে। কবির কাব্যের এমনই শক্তি—তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতা এমনই অপূর্ব্ব। তিনি কখনও ক্ষুদ্রতার ভিতরে, সসীমের ভিতরে, সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে বদ্ধ থাকেন না। ইংরাজ কবি বাইরণ গ্রীসের উপরে একটী চমৎকার কবিতা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু

কোথায় গ্রীস, আর কোথায় বঙ্গ! তথাপি আমরা সে সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে আমাদের হৃদয়ের আভাস অনুভব করি। তাই শ্যামলা বঙ্গজননীর রূপে ইংরাজও আপনার মাতৃরূপ দর্শন করিতে পারিবে। হয়ত এমন নির্ম্মল চন্দ্রোদয় সে দেশে নাই—হয়ত সে দেশের আকাশ কুয়াশায় ভরা। হউক কুয়াশা—তা বলিয়া আমার দেশ কি আমার মাতৃভূমি নয়? এই সাগর-ঘেরা, কুয়াশা-ভরা, তুষার-ঢাকা ক্ষুদ্র দ্বীপই আমার স্বর্গ। কালো ছেলে বলিয়া কি জননী ভুলিয়া থাকেন? তোমার নিকটে যেমন তোমার দেশ বড়, আমার নিকটে তেমনি আমার দেশও শ্রেষ্ঠ। মূর্ত্তিভেদ হইলেও, কবিসৃষ্ট রসের রূপে সারাজগৎ সাড়া দেয়। এই "আমার জন্মভূমি" নামক সঙ্গীতটী নিরাকার বিশ্বপ্রেম।

"আমার দেশে" কবি দেশ-মাতৃকার এক ভাস্বর মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরং"মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশে" তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে।

"আমার দেশে" আমাদের স্বদেশের অতীত মূর্ত্তি, অতীত ইতিহাস অতীত গৌরব গাথা আছে। "আমার দেশ" বলিয়া আমার জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ নয়—আমরা বটে দীন হীন, আমরা বটে দুর্ব্বল—কিন্তু "আমার দেশের" কিসে দুঃখ, কিসের ক্লেশ, কিসের দৈন্য?"

এখানে 'বুদ্ধ আত্মা' উদিয়াছে, তাই "আমার দেশ শ্রেষ্ঠ; এখানে "ন্যায়ের বিধান দিলা রঘুমণি" তাই আমার দেশ শ্রেষ্ঠ; এখানে "বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়" তাই আমার দেশ শ্রেষ্ঠ। আমরা হইতে পারি দীনহীন, আমরা হইতে পারি দুর্ব্বল, কিন্তু আমার দেশ ত' তাহা নয়. এখানে ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমাদের স্বদেশের প্রাণবন্ত সত্যোপেত হইয়া উঠিয়াছে।

* * * * * *

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ প্রেম যেন বিষ।" এ বিষ একবার দেহমধ্যে প্রবেশলাভ করিলে আর রক্ষা নাই। স্বদেশপ্রেমও তেমনি বিষ। এ বিষের আস্বাদ যে একবার পায়, সে কি আর পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে? দ্বিজেন্দ্রলালও এমনই বিষধর ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে অনেকে হাসির গান বলিয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, তাহা পরিহাসের গান। তাঁহার এই পরিহাসের গানে দেশের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে।

আমরা যখন কোন অন্যায় কাজ করি, তখন যদি কেহ আমাকে বাবু বাছা বলিয়া বুঝান, তাহা হইলে হয়ত' আমি বুঝি না। যদি কেহ গালি-গালাজ দিয়া আমাকে বুঝাইতে আসেন, তাহা হইলে আমার মন তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি কেহ হাসিয়া, ব্যঙ্গের সহিত পরিহাস করিয়া আমার প্রকৃত মূর্ত্তিটী আমারই চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলেন, তাহা হইলে, আমি অনেক সময়ে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিলেও করিতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই করিয়াছেন। তিনি পরিহাসের সহিত ব্যঙ্গবাণে আমাদের প্রকৃত মর্ম্মস্থানটী স্পর্শ করিয়াছেন।

"আমরা, বিলাতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা, সাহেব সেজেছি সবাই"—

কিন্তু আজ এ দুটি ভাইকে চিনিবার উপায় নাই। এ কেবল দ্বিজেন্দ্র লালের ক্ষমতাগুণে।

"নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ।
স্বদেশের তরে যা করেই হোক্ রাখিবে সে সে জীবন।"

দেশের ভিতরে অনেক নন্দলাল আছেন, তাঁহারা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের চোখ খুলিয়া দিলেন। কিন্তু, সত্য সত্য এমন নন্দলাল কি আমাদের মধ্যে আছেন? আমার ত' তা মনে হয় না। এখানে কবি অত্যুক্তি করিয়াছেন। তা করুন, কিন্তু "একটু একটু নন্দলাল" বুঝি আমরা সকলেই!

যখন আমরা ক্রুদ্ধ হই,—তখন যদি কেহ আমাকে ক্রোধনিবৃত্তির পরামর্শ দেন, তবে বোধ হয় আমরা সে কথায় কর্ণপাত করি না। কিন্তু যদি কেহ আমার ক্রোধের বিকৃত মূর্ত্তিটী অতিরঞ্জিত করিয়া আমাকে দেখান, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হই।

এইজন্য, সময়ে সময়ে অতিরঞ্জন বহু সুফলপ্রসব করে। তাই অতিরঞ্জিত বলিয়াই 'নন্দলাল'কে দেখিয়া আমরা শিক্ষালাভ করি।

* * * * *

জ্ঞান ও ভক্তি।

(টেনিসন হইতে)

বাড়িছে জ্ঞান-নদী,—বাড়ুক নিরবধি,
হৃদয়ে থাকে যদি
ভকতি;
মানস-হৃদি-দ্বয়ে তুলুক এক হ'য়ে
মহতি।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

বাদলে।

মেঘটা গলে জলের ধারা
প'ড়ছে ঝুম্‌ঝুম্‌,
চোখের পাতে আলস সাথে
ঘনিয়ে আসে ঘুম!

বাজাও তোমার সারং এবার
বাজাও সখি. বীণ্‌;
খোল পরাণ গাও তবে গান,
আজ বাদলের দিন!

মেঘের মাঝে ঘুমিয়ে আছে,
চাঁদ তারকা সবি;
মধুর রাতি নিবাও বাতি
দেখি আঁধারের ছবি!

ভুঁই চাঁপাটী পরিপাটী
শান্ত মধুর হাস,
বাতাস বলে "আজ বাদলে
দাও গো তারি বাস।"

আজ তা হ'লে বর্ষা জলে
ধুয়ে দে' যাক্‌ সৃষ্টি;
এম্‌নি ধারা আপ্‌নাহারা
পড়ুক তবে বৃষ্টি!

মনে পড়ে ছেলে বেলার
বর্ষা সে ঝুম্‌ঝুম্‌,
"ঠাকুরমা"এর কোলের মাঝে
ভাই বোনের সে ঘুম!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

মনীষা-মন্দিরে।

—:*:—

আমার সৌভাগ্যবশতঃ সাহিত্য-বীর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত অনেকবার সাক্ষাতের সুযোগলাভ করিয়াছি। কতবার তাঁর কাছে গিয়াছি,—কিন্তু কোনওবারেই রিক্তপ্রাণে ফিরি নাই—একটা নূতন শিক্ষা পাইয়াছি। আজ তিনি নাই। কিন্তু তাঁর রত্নবৎ মূল্যবান বাক্যাবলী আমার চিত্তভাণ্ডারে 'পুঁজি' করা আছে। একটী কথাও ভুলি নাই।

শেষ যে দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেদিন তাঁর কাছে কোন মাসিকপত্রের জন্ত প্রবন্ধ চাহিতে গিয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি আপনাদের লেখা দেব; কিন্তু, সে জন্তে বেশী তাড়া দেবেন না যেন। লেখকের পক্ষে সেটা ভারী মারাত্মক। আজকালকার মাসিক কাগজ-গুলির লেখা যে তেমন যুৎসই হয় না, সম্পাদকদের তাগাদা হচ্ছে তার অন্ত কারণ।

"ধরুন, আপনার তাগাদার চোটে বাধ্য হয়ে আমি কলম ধর্‌লুম,—একটা কিছু লিখ্‌তেই হবে! লিখ্‌তে ত হবে, কিন্তু লিখ্‌ব কি? ভাবের ঝুলি যে ফোকা খালি! এমন অবস্থায় কলমের মুখ দিয়ে খালি প্রলাপ বেরোয়। সে প্রলাপে সম্পাদক তুষ্ট হন,—কিন্তু পাঠক-সমাজ লেখকের প্রতি রুষ্ট হন। একে বলে, ভাবের পিঠে লগুড়াঘাত। এতে ভাব একেবারে মুষড়ে পড়ে। এ রকম ভাবে কলম-চালানো, আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমাকে ভাব্‌তে দিন। যেদিন বল্‌বার কিছু পাব,—অবশ্য বল্‌ব।

"দেখুন, নামজাদা লেখকের উপরে বেশী ভরসা রাখবেন না। মনে রাখ্‌বেন, কাগজ নামের জোরে চলে না। নতুন লেখক তৈরি করুন। তাঁরা যত্ন ক'রে লিখ্‌বেন। কাগজও ভাল হবে।"

তার পর, তাঁহার নাটকের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, "আপনি কি ঐতিহাসিক নাটক লেখা ছেড়ে দিলেন?"

"না, ছাড়্‌ব কেন, লিখ্‌ছি বৈ কি। কিন্তু ডাক্তার, বেশী মানসিক শ্রম কর্‌তে মানা করেছেন। তাই ভাব্‌চি, একবার বরিশালের দিকে গিয়ে শরীরটা আগে শুধ্‌রে আস্‌ব।

"আপনি রামলালবাবুর নাটক পড়েছেন? তিনি একজন ভাল নাট্যকার।"

আমি বলিলাম, "তাঁর কাল-পরিণয়ের দুএকটা দৃশ্য ইংরাজী থেকে নেওয়া নয় কি?"

"হাঁ। তা হ'লেও তাঁর নাটকে touches আছে। সেগুলি খুব শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু কাল-পরিণয়ের দু'একটা যায়গায় আমার প্রবল আপত্তি আছে। ধরুন, হিন্দুর ঘরের কুলবধূর মদ্যপান। স্থলবিশেষে এটা স্বাভাবিক হ'তে পারে, কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। স্বাভাবিক হ'লেই শিল্পের শিল্পত্ব বজায় থাকে না। পুরীষও স্বাভাবিক। তা' ব'লে সেটা কি দশজনের সামনে এনে রাখা চলে? সাহিত্য একটা সৌন্দর্য্য, একটা পবিত্রতার আধার। স্বাভাবিকতাই শিল্পীর কাছে বড় নয়। আমি ত' এইটুকু বুঝি।"

আমি। আপনার মতে আপনার কোন্ নাটক উৎকৃষ্ট?

"এ বড় বিষম প্রশ্ন! লেখকমাত্রেরই একটা দুর্ব্বলতা আছে। নিজের নতুন লেখাই তাঁর ভাল লাগে। তাই 'পরপারে'র কথাই এখন বিশেষ আমার মনে জাগ্‌চে। হয়ত' এটা আমার নূতনত্বের মোহ!"

"সাজাহানে আমি স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রকৃতি আঁক্‌বার চেষ্টা করেছি। মানুষের মনের ভিতরে একটা যে প্রকাণ্ড রাজ্য আছে, তার মনোবৃত্তির যে বিরাট বৈচিত্র্য এবং অতুল ঘাতপ্রতিঘাত, সাজাহানে আমি তাই ফুটিয়ে তোল্‌বার বিশেষ চেষ্টা করেছি। আমার এ ধরণের নাটক লেখা সুরু হয় নূরজাহান থেকে।"

আর একদিনের কথা। ভর্‌পুর মজলিশ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, সুকবি শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে সে দিন সুরধামে গিয়াছিলাম।

কথায় কথায় অক্ষয়বাবু বলিলেন, "যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ হ'ত, তখন পাঠকসমাজের যে রকম আগ্রহ আর প্রাণ ছিল, এখন তার কিছুই দেখি না। আর তখনকার মাসিকের প্রবন্ধ প'ড়ে যে সুখ পাওয়া যেত, এখন তাও নেই। আজকাল সুধু গল্পেরই আদর। আগেকার 'সাহিত্য' পেলে, আমরা আগে আদর ক'রে উমেশ বটব্যালের প্রবন্ধগুলি পড়্‌তুম।" দ্বিজেনবাবু এখানে বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি 'সাহিত্য' পেলে আগে পড়্‌তুম, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, তারপর কবিতা, তারপর গল্প, তার পর অন্য লেখা। সবাই বলেন, কবিতার ব্যঙ্গে আমার কিছু কিছু হাত আছে; কিন্তু গদ্যের ব্যঙ্গে সুরেশবাবু একজন ওস্তাদ লোক।"

ব্রাউনিংএর কথা উঠিল। দ্বিজেনবাবু বলিলেন, "প্রথম যখন ব্রাউনিং পড়ি, তখন কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। তাই, ব্রাউনিংএর ভিতরে যে কিছু পদার্থ আছে, তাও ভাব্‌তাম না। তারপর একটী পণ্ডিত লোক পেলুম,— তিনি আমার চোখ খুলে দিলেন। তখন বুঝ্‌লেম, ব্রাউনিং কত বড় কবি, আর তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য্য কি অসীম, তার রস কি গাঢ়!"

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের কথা পড়িল। উপস্থিত একজনকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, "আপনি গিরিশবাবুর 'করুণাময়ে'র পার্ট বুঝি দেখেন নি?—দেখ্‌বেন।"

"বাস্তবিক, অভিনয়ে গিরিশবাবুর আশ্চর্য্য দক্ষতা। 'করুণাময়ে'র সেই মুখচোখের ভঙ্গী, কথা বল্‌বার কায়দা একটা দেখবার মত জিনিষ বটে। সে অভিনয়ের কল্পনা করে উঠ্‌তে পারি না। আমি বিলাতের বড় বড় অভিনেতার অভিনয় দেখেছি, কিন্তু গিরিশবাবু তাঁদের কাছে একেবারেই খাটো নন। গিরিশবাবু আজ যদি এদেশে না জন্মে, বিলাতে জন্মাতেন, তাহ'লে সকলে তাঁকে মাথায় তুল্‌ত।"

আর একদিনের কাব্য-কথা মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতে ছিলেন, "কল্‌কাতায় কখন যে বসন্ত আসে, আর কখন যে চলে যায়, তা'ত 'এত্তনাগৎ' বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। আমার মনে হয়, এখানে বসন্ত আসে না। কেন জানেন? নবীন বাঙ্গালী কবিদের কলমের খোঁচার ভয়ে। বেচারি বসন্ত!" * * * *

"প্রথম জীবনে আমার উপরে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অনেক কষ্টে তাঁর কাব্যের রূপের ফাঁদ থেকে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছি।

* * অনেকে ভাবেন, আমি রবিবাবুর নিন্দুক। না; আমি রবিবাবুর নিন্দুক বা গোঁড়া নই। যা কর্ত্তব্য ভেবেচি, করেছি। কর্ত্তব্যের জন্যে তাঁর প্রতিবাদ করেছি,—এবার তাঁর উপরে আর একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব। তাতে তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য্য কোথায় তাই দেখাব।" (ইহার কয়েকমাস পরে, 'বাণী'তে দ্বিজেন্দ্রলাল-লিখিত রবীন্দ্রনাথের গোরার সমালোচনা বাহির হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনা বোধ করি, আর ঘটিয়া উঠে নাই।)"

সুকবি করুণানিধানের কথায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, "উনি একজন খুব ভাল কবি,—ওঁর ভিতরে বেশ শক্তি আছে। অমন গ্রাম্য ছবি এখনকার আর কোন নবীন কবি আঁকৃতে পারেন না। কিন্তু দেখ্‌ছি, উনি আপনার নিজস্ব ছেড়ে ভিন্ন দিকে যাচ্ছেন।"

তাঁর 'হাসির গানে'র কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "হাসির গান লিখ্‌তে আর মন যায় না। যখন বয়স ছিল, সময় ছিল, তখন হাস্‌তে ও হাসাতে সাধ যেত। এখন আর হাসি নয়, এখন চাই কর্ম্মকোলাহল, চাই জীবনের আদর্শ।"

"কি বল্‌ছেন? হাসির গানে উপকার আছে? সে কথা আমি জানি বলেই ত লিখেছি।"

"হ্যাঁ, নন্দলাল আর চণ্ডীচরণে দেশের ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের ছায়া আছে। ছায়ামাত্র। দেখুন, চাবুক না খেলে ভণ্ডদের চোখ খোলে না। ব্যঙ্গের এই একটা মস্ত গুণ যে, সে লোকের গাত্রদাহ কর্‌তে পারে। মিষ্ট কথায় গাধার চৈতন্যোদয় হয় না। আচ্ছা ক'রে চাব্‌কে দাও, সে চল্‌তে সুরু কর্‌বে। সংসারে, সমাজে যেখানে ভাঁড়ামির মুখোষ দেখ্‌বেন, সেখানেই ব্যঙ্গের চাবুক হচ্ছে, ব্রহ্মাস্ত্র। এই ব্যঙ্গের জন্যে আমি অনেক শত্রুসৃষ্টি করেছি। 'ভারতী'তে একবার কোন বিলাতফেরৎ আমার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তারপর, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ভাবেও আমাকে মুখনাড়া সহ্য কর্‌তে হয়েচে। কিন্তু মূর্খদের মুখনাড়াকে আমি

'কল্লিনূশালে'ও আমোল দিই নি—দেবেও না। ল্যাজে পা পড়্‌লে কুকুরেও চ্যাচায়,—আর ওরা ত' মানুষ! একটু মাথানাড়া দিয়ে চ্যাচাবে না? বেচারীরা!"

"আপনারা সবে লিখ্‌তে সুরু করেচেন,—বেশ করেচেন! কিন্তু একটা গোড়ার কথা ভুল্‌বেন না। সেটা হচ্ছে—(বেশ মনে পড়েছে। এইটুকু বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল এক গ্লাশ জলপান করিয়া. একটা সিগারেট ধরাইলেন) সেটা হচ্ছে, সৎসাহস। মুখের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌বেন। ভণ্ড দেখ্‌লেই গলা টিপে ধর্‌বেন। এতে শত্রু হয়.—হোক্। নাম না হয়,—ব'য়ে গেল! অন্যায়ের চোখরাঙ্গানী আর কাঁদুনি—দুই-ই ক্ষমাযোগ্য নয়। মনে রাখ্‌বেন, এ কথা! (বলিতে বলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের চক্ষুঃ ঈষৎ দীপ্ত হইল। তিনি চেয়ারে হেলান্ দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ছিলেন,—এখন গ্রীবা উন্নত করিয়া, সোজা হইয়া বসিলেন) মনে রাখ্‌বেন, এ কথা! দুর্ব্বলের জন্যে সাহিত্য নয়; সবল যে, ন্যায়বান্ যে, সদাচারী যে,—সাহিত্য তার। মনে মুখে যারা এক নয়.—তারা হচ্ছে দুমুখো সাপ্। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন সাপ আমি ঢের দেখেছি, কিন্তু কখনও তাদের ছায়া মাড়াইনি। সাহিত্যক্ষেত্রে যদি নাম কিন্‌তে চান, তাহ'লে মনে যা ভাববেন, মুখে তাই বল্‌বেন, কাজে তাই কর্‌বেন। এতে শুধু নাম কেনা নয়—দেশের উপকার হবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল স্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অঙ্গনের মুক্ত দুর্ব্বাক্ষেত্রের উপরে কয়েকটী বালক টেনিস খেলিতেছিল, তিনি একমনে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে কোটপ্যাণ্টপরা একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁকে দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে বলিলেন "ডাক্তারে আমাকে একটু একটু অঙ্গচালনা কর্‌তে বলে গিয়েছেন। আমি তাই প্রত্যহ খানিক বেড়িয়ে আসি আর বিলিয়ার্ড খেলি। এখন একটু খেল্‌ব।"

"আপনি তবে খেলুন, আমি বিদায় হই।"

তাঁর শেষকালের যে উপদেশ উপরে দিলাম,—এতদিন তাহা আমার প্রাণের সঙ্গে গাঁথা ছিল, কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু, সাহিত্যকে তিনি

কিরূপ চোখে দেখিতেন, ঐ কথাগুলি হইতে তা বোঝা যায় এবং ঐ উপদেশ অনেকের সুপথ্যের কাজ করিবে, তাই ভাবিয়া আজ তাহা খুলিয়া লিখিলাম। যাদের ভাবের ঘরে 'হাতটানে'র অভ্যাস আছে, নীল চশমায় যারা অন্ধ চক্ষুঃ ঢাকিতে চান, যাদের প্রাণে হাসি, মুখে কান্না'—তাঁরা স্বর্গগত মনীষার ঐ মহতী বাণী শুনুন,—এবং পারেন ত'—বুঝুন আর ভাবুন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্রাট হউন, আর ভিখারী হউন—ক্ষতি নাই; কিন্তু দোহাই তোমাদের—"যা হও, তা হও, যেন ছমুখো সাপ হয়ো না।"

এখানে আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীনেরা বলেন, আমরা একালের 'নব্য ছোক্‌রারা' দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াছি। কথাটা খাঁটি কি না, জানি না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মরণে আমি ত' ভগবানের শুভ হস্ত দেখিতে পাইতেছি। কবির সাধ, ভগবান কেমন পূর্ণ করিয়াছেন, দেখুন।

অনেক দিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন :—

"তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন;
খুলে দিও দ্বার!—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস আর আকাশের আলো;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদিগে বসিয়াছি ভালো;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলি গন্ধ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে;
হয় যদি জ্যোৎস্নারাত্রি;—আমি ওপারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে!"

আশ্চর্য্য! মৃত্যুকালে কবির সাধ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁর পুত্রকন্যাগণ এবং স্নেহবান বন্ধুগণ ছিলেন এবং খোলা জানালা দিয়া "নির্ম্মুক্ত বাতাস আর আকাশের আলো" আসিতেছিল।

সেদিনও অমনি জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল! ছিলেন না কেবল স্বামীসোহাগিনী। কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ঐ উজল চাঁদের আলোয়, ছায়াপথ দিয়া নামিয়া আসিয়া, পতিপ্রাণা সতী, হাসিমুখে স্বামীর হাত ধরিয়া, চিরজ্যোৎস্না পাগল কবিকে লইয়া "পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে" গেলেন।

আকাশের জ্যোৎস্নায় সাহিত্যের জ্যোৎস্না মিশিল! আকাশের জ্যোৎস্নার রূপার আঁচল আবার দুলিবে, কিন্তু সাহিত্যের চন্দ্রিকা আর দেখিব কি? সত্য, ভোরের 'রবি' আছেন, কিন্তু রাতের চাঁদ কৈ?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্ত্তক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "ছন্দঃকুসুম"কে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার জন্য, ইহার মৃদু সৌরভ লোক-প্রীতিকর ও দীর্ঘকালস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে "পাণ্ডবচরিত কাব্য" প্রণীত হয়; কিন্তু তাহা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সমাদৃত হইবে কি না এই আশঙ্কায় ভুবনবাবু প্রথমে তাহা প্রকাশিত করিতে সাহসী হন নাই। তৎপরে ভারত-গৌরব স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "পাণ্ডবচরিত কাব্য"খানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন ও তৎ-প্রকাশে ভুবনবাবুকে সাতিশয় উৎসাহিত করেন। কবি হেমচন্দ্রও এবিষয়ে ভুবন বাবুকে যথেষ্ট সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমরা 'ছন্দঃকুসুমে'র সমালোচনায় কবির ছন্দঃ-কৌশলের যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এখন কাব্যকলা, কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের অবাধ স্ফুরণ, ভাষার সহজ ও স্বাভাবিক প্রবাহ ও রচনার গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির একটু পরিচয় প্রদান করিব।

এই "পাণ্ডব চরিত-কাব্য"খানিও ১২৮৩ সালে চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত, প্রত্যেক সর্গ এক বা তদধিক ছন্দে বিরচিত; ছন্দের নাম ও সঙ্কেত প্রত্যেক সর্গের প্রথমে লিখিত। সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি

গ্রন্থের প্রথমে যেমন দেবতার বন্দনা দৃষ্ট হয়, পাণ্ডবচরিতকাব্যের প্রথমেও তদ্রূপ বিশ্বেশ্বরের স্তব, তৎপরে গ্রন্থারম্ভ, পাণ্ডবদের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া খাণ্ডব-দাহন পর্য্যন্ত কাব্যাকারে অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় বিবৃত। কবি সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিয়াছেন—

শ্রীবিশ্বেশ্বর দেব পরাৎপর বিরূপাক্ষ মদনারি,
কাল কপালী পাবকভালী কঙ্কালী ত্রিপুরারি।
ভূতনাথ ভব ভীষণ ভৈরব ভদ্রদ ভবভয়হারী
ব্যোমকেশ বিভু বেতাল-প্রভু দক্ষযজ্ঞ-হতকারী।

উল্লিখিত কবিতাটি হ্রস্ব-দীর্ঘ-বর্ণভেদে পাঠ করিলে গম্ভীর জলদ-নির্ঘোষের ন্যায় শব্দিত হইবে। নিয়মিতরূপে উচ্চারিত হইলে মনে হয় যেন কোন গুরু-গম্ভীর ছন্দে গ্রথিত সংস্কৃত কবিতা। তা' ছাড়া তৃতীয় চরণটিতে অনুপ্রাসের সুন্দর বিকাশ।

প্রথম সর্গে পাণ্ডবগণের জন্মবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সর্গে বনগমন ও পাণ্ডুরাজের স্বর্গারোহণ করকা গতি ছন্দে রচিত। আমরা বন-বর্ণনার হৃদয়গ্রাহী চিত্রটি পাঠকবর্গকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

করকা গতি ছন্দ, ৮ যতি।

কানন সুন্দর দরশন সুখকর খর দিনকর কর ঢাকে,
বিমল ধরাতল তরুতল শীতল অবিরাম নবদল পাকে।
শ্যামল-নীলিম-পীত-হরিৎ-সিত-শোভিত বহুবিধ বর্ণে,
তরুণ অরুণ সম কত নব পল্লব কত কত মরকত বর্ণে॥
চম্পক কেতক কুটজ সরল বক কুরুবক কুসুম-বিকাশে,
স্তোকে স্তোকে ফুল্ল আশোকে শোভিত পদ্ম পলাশে।
সাল তমালে উন্নত ডালে সুষম কুসুম কত সাজে,
করি তরু আশ্রয় বিবিধ লতাচয় জয় জয় কয় ঋতুরাজে।
চূত বকুলকুল মুকুল বিকাশিল অলিকুল আকুল গন্ধে,
চূত রস চুষিল কুহরিল কোকিল রসিল বসিল তরু স্কন্ধে।
শুক পিক চাতক জীবঞ্জীবক গাইল সুমধুর তানে,
খঞ্জন ফিঙ্গক শিখিগণ নর্ত্তক নাচিল বহুতর ভানে॥

ক্রমাগত এইরূপ কবিতা চলিয়াছে। কতই উদ্ধৃত করিব। সমস্তই সরস, সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ। যিনি নিয়মবদ্ধ ভাষায় এতাদৃশ উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবি-প্রতিভায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

তৃতীয় সর্গে পতিবিয়োগবিধুরা মাদ্রী ও কুন্তীর বিলাপ-বর্ণনা। পাণ্ডুরাজের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইলে পতিব্রতা মাদ্রী জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। পতিহীনার জীবনে আর কি সুখ, তাই কুন্তীকে বলিতেছেন,—

"হে কুন্তী সে প্রিয় পতিবিনা বাঁচিতে নাহি বাঞ্ছা।
ভর্ত্তাভাবে কখন রমণী আর না পায় শোভা॥"

মাদ্রী শশধরের জ্যোৎস্নার ন্যায়, পাদপে শোভাযুক্তা তরুলতার ন্যায়, জলদের কোলে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় শোভিতা ছিলেন। ভর্তৃহীনার কনককান্তি আজ অনলসংস্পর্শশূন্য কাষ্ঠের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে; তাই আজ তিনি মৃত্যুকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। কুন্তী মাদ্রী-সুতদ্বয়ের ও নিজ পুত্রত্রয়ের মুখ চাহিয়া আত্মনাশে সমর্থ হইলেন না। সুত-স্নেহের প্রবল আকর্ষণ তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে টানিয়া আনিল। কাব্যে মাদ্রী-চরিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অতি অল্প কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি মহাভারতীয় চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

একাদশ সর্গে দ্রৌপদীর জন্ম, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর হোমশিখার মধ্য হইতে "নবঘন তনু আভা শ্যামবর্ণা কুমারী" আবির্ভূতা হইল। তাহার "অতুল অখিল বিশ্বে রূপলাবণ্য-শোভা," সে "তিলফুলভুল নাসা চারুহাসা, "মৃগাক্ষী," তাহার "কর-পদতল-ওষ্ঠে রক্তপদ্মের শোভা," তাহার "কুটিল চিকুর রাজি নীলবর্ণে সুদীর্ঘ।"

'ত্রিভুবন মনোলোভা মোহিনী সেই মূর্ত্তি" দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন, শূন্যমার্গে গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল,—"নৃপ তব নব কন্যা সাধিবে দেবকার্য্য।"

ঊনবিংশ সর্গে পাঞ্চাল সভায় অতুলনীয় শোভা, দ্রৌপদীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশি ও অর্জ্জুনের অপ্রত্যাশিত লক্ষ্যভেদ তোটক ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

"তথি মার্জ্জিত নির্ম্মল ভূমিতলে
পরিষিক্ত সুবাসিত গন্ধজলে।

মণি কাঞ্চন হীরক রত্ন দিয়া,
কত উচ্চ মনোহর মঞ্চ রচা—"

পাণ্ডবেরা বিপ্রদলের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। সভাস্থল গীত-বাদ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। নূপুর-সিঞ্জীচরণা, রক্তবসনা দ্রৌপদী সিতচন্দনসিক্ত মাল্যহস্তে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইস্থানে ভাষার লীলাময়ী গতি, ছন্দের অবাধ প্রবাহ, ভাবের অদ্ভুত বিকাশ ও সুন্দর সুন্দর উপমাবলীর ঘন-সন্নিবেশে মুগ্ধ হইতে হয়। দ্রৌপদীর

ঘন অঞ্জন গঞ্জন বর্ণ তনু

* * *

মণি-কুণ্ডল মণ্ডিত—গণ্ডযুগে
শ্রুতি শোভিত মাণিক কর্ণফুলে

* * *

হর কার্ম্মুক ভাঙ্গিল দাশরথী,
বুঝি সেই শরাসন যুগ্মভুরু।

আমরা কাব্যের কত উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া, পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তবে আর একটি মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাণ্ডব-চরিতের বক্তব্য শেষ করিব। ছন্দের যতি ও মাত্রার প্রয়োগ-কৌশলে ভীষণ সমর-চিত্রটি কিরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা-পাঠে বেশ উপলব্ধি হইবে ঃ—

মন্দাক্রান্তা ছন্দ ; ৪।৬।৭ যতি।

হৈ হৈ ভৈ ভৈ রব করি মুখে উগ্র অট্টাট্ট হাসে,
দংষ্ট্রা ওষ্ঠে ধরি কত জনে ভক্ষিছে বক্ষঃ রক্ষে।
হু হুঙ্কারে হত কত তনু চট্ চটাচট পট চপেটে,
রুদ্ধশ্বাসে ধড়ফড় করে বজ্রমুষ্টি প্রহারে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠন ঠন রণে তাড়িছে বক্ষ বক্ষে,
নিঃশ্বাসেতে পবন বহিছে ঘোর ঝঞ্ঝাস্বরূপে॥
ডাকে স্বন্ স্বন্ ঝকমক করে আতপে চন্দ্র হাসে,
ক্রোধে বিদ্যুৎপ্রতিম বহুধা শস্ত্র চালে সবেগে॥

পৃথ্বীপৃষ্ঠে নিয়ত পড়িছে রক্ত মাংসাস্থি মেদ
খণ্ডে খণ্ডে শ্রুতি রদনসা ছিন্ন মুণ্ডাদি তুণ্ড॥

উপরের উদ্ধৃত অংশটি নিয়মিতরূপে পঠিত হইলে যেন একটি ভীষণ যুদ্ধের স্পষ্ট চিত্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

কাব্য-পরিচয় এইখানে শেষ করিয়া ছন্দ-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কে কিরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন ও কাহার পুস্তক কতদূর প্রীতিকর হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কবি হেমচন্দ্র ভুবনবাবুর অনুকরণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তিনি যে সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই তাঁহার রচনা-পাঠে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি সর্ব্বত্র হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ ঠিক রাখিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে তাঁহার হ্রস্বকে দীর্ঘ বর্ণের ন্যায় ও দীর্ঘকে হ্রস্ব বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ করিতে হয়। দশমহাবিদ্যায় এরূপ স্থলের অভাব নাই, একস্থানে যে অক্ষরটি হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হইল, অন্যত্র তাহাকে ছন্দের অনুরোধে গুরুবর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে, নতুবা মাত্রা ঠিক রাখা যায় না ও ছন্দ ভঙ্গ হয়। লঘুগুরু বর্ণ-উচ্চারণের একটা সাধারণ নিয়ম থাকা উচিত, নতুবা উচ্চারণ ও অর্থবোধ সুগম ও সুকর হয় না। যদি প্রকৃত লঘুবর্ণের উচ্চারণ একস্থলে লঘু ও অন্যত্র গুরুবর্ণের হয়, তাহা হইলে পাঠকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়, তবে যে হেমচন্দ্রের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত কবিতাগুলি বেশ শ্রুতিমধুর তাহার অন্য কারণ আছে, ভুবনবাবু যে হেমবাবুকে এ বিষয়ে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা যাহারা ছন্দঃকুসুম ও পাণ্ডবচরিত কাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে খাঁটি সংস্কৃত ছন্দে শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয়ের "দশাননবধ কাব্য" রচিত। "দশানন বধ কাব্য"-প্রণেতা গুরুবর্ণের সহজ উচ্চারণ জন্য অধিকতর সংযুক্তবর্ণ ব্যবহার করিয়া আপনার কবিতাকে বড়ই কর্কশ করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি মাত্রা যতি রক্ষা করিয়া কবিতাগুলি অধিকতর মধুর করিবার জন্য ও বাঙ্গালার ধাতুর সহিত মিলাইবার জন্য

চরণ-শেষে মিল করিয়াছেন, কিন্তু সেইজন্য ও দীর্ঘ বর্ণের সহজ উচ্চারণের জন্য মিলন-ঘটিত চরণগুলির শেষাংশ শ্রুতিমধুর হইলেও উৎকট আভিধানিক শব্দপ্রয়োগে ও ভাবের বক্রতা নিবন্ধন তাঁহার কাব্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। ভুবনবাবু স্বরচিত কবিতাগুলির চরণশেষে মিল রাখেন নাই। তিনি যে দুই চারিটি ছন্দের মিল করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে যে তাঁহার শক্তির অভাব ছিল তাহা বলা চলে না। তবে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে. খাঁটি সংস্কৃত ছন্দেও বাঙ্গালা কবিতা রচিত হইতে পারে। তাঁহার বহু ছন্দে রচিত কবিতার মিলনাভাব ইচ্ছাকৃত, শক্তির অভাবহেতু নহে। নিম্নোক্ত চরণ-দুইটী হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, মিলন-সংসাধনের জন্য তাঁহার রচনার লালিত্যকে বলি দিতে হয় নাই:—

করকা গতি ছন্দ।

মদন-সদন কত ছিল নব বিরচিত সুরভি-কুসুম-যুত কুঞ্জে
হর্ষে অবিরত মত্ত মধুব্রত কত শত কুঞ্জে গুঞ্জে।

আমরা এক্ষণে হরগোবিন্দবাবুর ও ভুবনবাবুর কাব্য হইতে একই ছন্দে বিরচিত কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, ভুবনবাবুর কবিতাতে চরণ-শেষে মিল না থাকিলেও তাহা অনেকাংশে শ্রুতিমধুর, সহজবোধ্য ও কবিত্বপূর্ণ।

দশাননবধকাব্য (৩৭৬ পৃষ্ঠা)

ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ।

স্মরি শ্রান্তি সঙ্গে গত ক্লান্তি অঙ্গ
মহদ্ বহ্নি চিত্তে পুনর্দীপ্ত সদ্যঃ।
সদা বাঞ্ছি সম্যক্ তবদ্বেষ্য বর্গে,
বৃহদ্ব্যাঘ্রতুল্য প্রচর্ব্বি সগর্ব্বে।

ছন্দঃকুসুম (৩ পৃষ্ঠা)

দিবা রাত্রি সন্ধি প্রভাত প্রদোষে
ক্রমে সূর্য্য চন্দ্রে নিয়োগী বিয়োগী,
নভোমণ্ডলে তারকা জ্যোতি-দাতা.
কর ত্রাণ দীনেশ দীনে অপাঙ্গে।

দশানন বধ (৮৯ পৃষ্ঠা)

তোটক ছন্দঃ।

পণ সম্প্রতি রাক্ষস দুর্গবরে,
রিপু বংশ গুরু প্রতিমূর্ত্তি ধ'রে,
তুমি উৎসম মূর্ত্তি পরিগ্রহণে,
লভিবে স্থির অস্ত্র অমূল্য ধনে।

পাণ্ডবচরিত কাব্য (১০০ পৃষ্ঠা)

দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা।

অতসী কুসুমদ্যুতি নীল নিভা
ঘন অঞ্জন গঞ্জন বর্ণতনু,
নলিনীভব সৌরভ তায় ছুটে,
মৃদু গন্ধবহে তদনুগন্ধ বহে।

দশানন বধ।

দ্রুত বিলম্বিত ছন্দঃ। (৭৭ পৃষ্ঠা)

তব উদগ্র বিপৎ শুনি সত্বরে
উদিত দুঃখ মম স্থির অন্তরে।
নিরখি বীর্য্য, অধৃষ্য নরেশ্বরে,
কুহক শক্র বিসর্পিল সঙ্গ রে।

ছন্দঃকুসুম। (৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা।

জলদ-নীলিম রূপ মনোহর
চরণ-কান্তি নবীন দিবাকর।
বসন পীত সুভঙ্গি কলেবর,
কুসুমমালা গলে নব নাগর।

দশানন বধ (২৪৫ পৃষ্ঠা)

সারবতী ছন্দঃ।

তুচ্ছি পিতাস্তর বাক্য সবে,
ঘৃণ্য নিতান্ত বিচিন্তি ভবে;
ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট কুকর্ম্ম তরে,
যোগ্য কি কুম্ভক বিশ্ব' পরে?

ছন্দঃকুসুম (২৩ পৃষ্ঠা)

প্রেম যথা অধিকার করে,
মান কি গৌরব তুচ্ছ তথা
মান বশে হয় গর্ব্ব মনে,
গর্ব্বিত বঞ্চিত সখ্য সুখে,।

আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। ভুবনবাবুর কাব্যের যে কোন পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা যাক্ না কেন, তাহা "দশানন বধ কাব্য" অপেক্ষা অনেকাংশে সরল, সহজ, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। ভুবনবাবুর কাব্য-পাঠে স্ফূর্ত্তি জন্মে, কৌতূহল বর্দ্ধিত হয়, হরগোবিন্দ বাবুর পুস্তকখানি ভক্তিমিশ্রিত দুঃখের সহিত পুস্তকাধারে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে; ভাষার পাষাণময় দুর্গপ্রাকার বহুকষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির নিশ্চিত সম্ভাবনা, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। হরগোবিন্দবাবু দশানন বধ কাব্যে যে লিপি-কৌশল (mechanism) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তবে তাহা পাঠকের বিন্দুমাত্র প্রীতি-উৎপাদন করিতে বা কৌতূহল বর্দ্ধন করিতে সমর্থ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সমালোচকরথী জন্‌সন্ (Johnson) ইংরাজ কবি কলিন্সের (Collins) কবিতা সমালোচনা-কালে বলিয়াছিলেন, "As men are often esteemed who cannot be loved, so the poetry of Collins may sometimes extort praise when it gives little pleasure." হরগোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে।

অন্য একটি বিষয়ে আমরা ভুবনবাবুকে উচ্চস্থান প্রদান করিতে বাধ্য,

তিনি একে ত হরগোবিন্দবাবুর বহু পূর্ব্বে এরূপ মনোহর কবিতা কুসুম গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, তদুপরি তিনি ১৮৫টি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া দেখাইয়াছেন ও বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত ১৫টি পারসী ছন্দের নামকরণ ও তাহাতে সুমধুর কবিতা রচনা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। দশানন বধে এতগুলি ছন্দের সমাবেশ নাই।

এখন কথা হইতেছে যে, সংস্কৃতছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করা বাঞ্ছনীয় কি না। আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কি লেখায় কি কথোপথনে কুত্রাপি সেরূপ নিয়ম ও গুরু লঘুবর্ণের উচ্চারণের তেমন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় শ, ষ, স এর পৃথক উচ্চারণ নাই। ন ও ণ একই রূপে উচ্চারিত হয়। ই, ঈ বা উ, ঊর মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। ভাষায় ইহাদের স্বতন্ত্র কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন কতকগুলি শব্দ যথা কুল, সুত, দিন, চির, শিত এইগুলি কূল, সূত, দীন, চীর, শীত হইলে অর্থ ভিন্ন হইয়া যায়; সুতরাং ইহাদের পৃথগর্থতা রক্ষা করিবার জন্য উচ্চারণ-বৈষম্য থাকা উচিত, নতুবা অনেক সময় ভুল হওয়া সম্ভব। ইংরাজিতে Still, Steel, Steal এই শব্দত্রয়ের বানানের পার্থক্যহেতু উচ্চারণের পার্থক্য আছে; সেইজন্য অর্থবোধে গোলমাল হয় না। আমরা এমন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ ও উপাধিধারী পণ্ডিত দেখিয়াছি যাহারা ভালরূপে সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে পারেন না। স্কুল, কলেজের ছাত্রদের বোধ হয় অধিকাংশ সুন্দররূপে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের নিয়ম রক্ষা করিয়া সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন না। বস্তুতই ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইলে অর্থবোধে খুবই সাহায্য পাওয়া যায়, তবে সংস্কৃত সকল ছন্দ বাঙ্গালায় খাপ খায় না এবং সে সকল ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া সাফল্য লাভ করা বা পাঠকের প্রীতি উৎপাদন করা সুদূর পরাহত, এমন কি অনেক সংস্কৃত কবিতা ছন্দের মাধুর্য্য অভাবে শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে। যে সকল ছন্দ বাঙ্গালা কবিতার অনুকূল তাহাতে বাঙ্গালা কবিতা লেখা যে বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিতে পারে না, তাহাতে সুধু যে ছন্দঃ-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এমন নয়, উচ্চারণও শুদ্ধ হইয়া যায় ও —— বাঙ্গালা

ছন্দের খিচুড়ী প্রস্তুত করিতে পারেন না। তাই বলিয়া সংস্কৃত ছন্দ ব্যতীত যে কবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষিত হয় না এমন নহে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অনেকগুলি ছন্দ সম্পূর্ণ নূতন, তবুও তিনি সে সকল ছন্দে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন সেরূপ কবিতা ছন্দের নিয়ম রক্ষা করিয়া কয়জন রচনা করিতে পারিয়াছেন? তা ছাড়া রবিবাবুর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ত কথাই নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, খাঁটী সংস্কৃত ছন্দের সমূহ নিয়ম রক্ষা করিয়া বাঙ্গালাতে কবিতা লেখা কষ্টকর ও তাহাতে সাফল্যলাভ বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে কতকগুলি ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা বেশ রচিত হইতে পারে। খাঁটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত কবিতা সকলের পক্ষে সুখকর বা সহজ-বোধ্য হয় না। এমন কি ভুবনবাবুও স্বরচিত পাণ্ডবচরিত কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মদ্রচিত সেই ছন্দঃকুসুম এবং এই পাণ্ডবচরিত কাব্য উভয় গ্রন্থই কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন অথবা হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের কালতালজ্ঞ সু-সাধু-ভাষানুরাগী মহাত্মাগণের পাঠ্য ভিন্ন অপর সাধারণের পাঠ্য বা গ্রাহ্য হইবেক না।" যদি এরূপ কবিতার প্রসার কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কাব্যের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি? তাহা হইলে সে কাব্য কেবল জনকয়েকের সম্পত্তি হইয়া যায়। সর্ব্বসাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে যে ছন্দগুলি সকলের বোধগম্য ও সুশ্রাব্য তাহাতে কবিতা-রচনার যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

ঐতিহাসিক সমস্যা।

আজকাল একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কেহই দ্বিধা বোধ করিবেন না যে, খৃষ্টজন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনির জন্ম হয় এবং তৎ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। যখন বৈদিক ধর্ম্মানুমোদিত যজ্ঞধূমে আকাশ আচ্ছন্ন ও পশুরক্তে পৃথিবী

কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠে, তখন আর্ত্তের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য ভগবান নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঘাতকের উদ্যত খড়্গকে অহিংসা মন্ত্রে নিবৃত্ত করিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই মতের বিরুদ্ধে কোন কথাই আজকাল বলিবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক বহু নজীর দেখাইয়া, ঐতিহাসিকগণ ইহাকে পরীক্ষিত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এইজন্যই রামায়ণের একস্থানে বুদ্ধের নাম দেখিয়া, আমি পূর্ব্বপ্রকাশিত একটী প্রবন্ধে উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা করিলে মনে স্বভাবতঃই কয়েকটী প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। সে কয়টীর মধ্যে দুইটী প্রধান—শাক্যমুনি বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভাবক না একজন বিশিষ্ট প্রচারক; এবং বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার সুপ্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে যে মত দেখা যায়, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে কি না?

বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যমুনির পূর্ব্বে আরও কতিপয় বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের সংখ্যা লইয়া, মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা যে অতি প্রাচীন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই। ব্রাহ্মণদিগের পুরাণে যেমন বর্ত্তমান পৃথিবীর অবস্থানের বহু পূর্ব্বকালকে কল্প নামে অভিহিত করা হয়, বৌদ্ধদিগেরও সেইরূপ কল্প আছে। উহাদিগের মতে বর্ত্তমান পৃথিবীর অবস্থান মহাভদ্র কল্প। এই মহাভদ্র কল্পের অগ্রে প্রতিকল্পেই উহাদিগের বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাভদ্র কল্পেই গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে তিনজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। এইমত নিতান্ত আধুনিক সময়ে কোন চতুর ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রচারিত বা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণও আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ভর্হুতের শিলাস্তূপে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধত্রয়ের নাম-সম্বলিত বোধিবৃক্ষ ও তাহার অর্চ্চনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থ ছাড়িয়া, ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থ আলোচনা করিলে, রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে বুদ্ধের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের একস্থলে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, শৈবধর্ম্ম আমি প্রচার করি, বৈশেষিক ন্যায় এবং সাংখ্য আমার শক্তিতে শক্তিমান সাধুগণ প্রচার করেন, জৈমিনি মীমাংসা রচনা করেন, বৃহস্পতি

চার্ব্বাক মত প্রচার করেন, আর বিষ্ণুই দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিবার জন্যই স্বয়ং বুদ্ধমূর্ত্তিতে মিথ্যা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, আমিই কলিযুগে বেদান্ত প্রচার করিয়াছি।" ইহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রাচীনত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহা যে বেদান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও স্পষ্ট স্বীকার করা হইতেছে। সুতরাং আমরা কোন্ বিশিষ্ট প্রমাণের বলে, এতগুলি প্রমাণ উড়াইয়া দিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মকে গৌতমবুদ্ধদেবের সমকালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করি? ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমরা বৌদ্ধধর্ম্মকে গৌতম-বুদ্ধের সম-কাল অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী ও গৌতম-বুদ্ধকে বৌদ্ধধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট প্রচারক বলিয়া মানিয়া লই, তবে সকল দিক রক্ষা হয় না?

পদ্মপুরাণের যে স্থানের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, সে স্থানে লিখিত আছে যে, দৈত্যগণের বিনাশের জন্য মিথ্যা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার। সহজ অর্থ এই যে, দৈত্যগণ মিথ্যা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে দৈত্যগণই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিতে যাইয়া দৈত্য শব্দ লইয়াও মহা গোলে পড়িতে হয়। দৈত্য শব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বলা সহজ নয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করিয়া কাজ নাই। তবে দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি শব্দ একই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকিবে। দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ আর্য্যগণের ন্যায় মহা পরাক্রমশালী। অনেক স্থলে তাহারা আর্য্যগণ অপেক্ষাও ক্ষমতাবান্। তাহাদিগের সভ্যতা আর্য্যসভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু নিকৃষ্ট কি না বলা সহজ নহে। অযোধ্যা ও লঙ্কার বর্ণনা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে সহজে বলিতে পারা যায় না, কোন্ চিত্রটী উজ্জ্বলতর। এইরূপ সুসভ্য ক্ষমতাদীপ্ত দৈত্যগণের সহিত আর্য্যগণের বিরোধ হইত। এই বিরোধের হেতু কি? দৈত্যগণ যদি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়, তবে বেদের মর্য্যাদা-রক্ষণশীল আর্য্যগণের সহিত ধর্ম্মমত লইয়া ইঁহাদিগের বিবাদ হইত কি না, কে বলিবে? ভারতবর্ষ ধর্ম্মভূমি, ধর্ম্মের জন্য এই বিবাদ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল কি না জানিবার উপায় নাই। জরাসিন্ধু, কর্ণ, রাবণ, পরশুরাম প্রভৃতি যে সকল নাম আমরা হিন্দুগ্রন্থে দেখিতে পাই, তাহাদিগের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, এবং সেজন্য তাঁহা-

দিগের-বিরুদ্ধে বেদের মতাবলম্বিগণকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল, কিনা, ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে তৎসম্বন্ধে কোন উত্তর পাইবারই আশা নাই।

আর্য্যগণ যে সময়ে পঞ্চনদের উপকূলে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐতিহাসিক যুগে শকগণের ন্যায় কোন বিদেশীয় জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে দৈত্য, অসুর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বিদেশীয় কর্ত্তৃক অতি প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম-রূপ নবধর্ম্মমত ভারতে প্রচারিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তার পর কত শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম ভারতে পাশাপাশি হয়ত প্রচলিত ছিল। কখন বৈদিক ধর্ম্ম প্রবল আবার কখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল; অবশেষে গৌতমবুদ্ধ কর্ত্তৃক ইহা নবভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া, অভিনব উপায়ে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। খৃষ্ট যেমন প্রাচীন য়ুহেদী ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়াও, একটি নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপে গৌতমবুদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন ভাবে প্রচারিত করিতে গিয়া, আপনিই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভাবক বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোনরূপ সত্য থাকিতে পারে কি না ঐতিহাসিকগণের নিকট তাহার উত্তর পাইবার জন্যও আমার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেই আমি এই কয়েকটি কথা প্রকাশ করিতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের কথা একেবারে বেদবাক্যরূপে গ্রহণ না করিয়া, সত্য-প্রচারের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণের অনুসন্ধান করিলে, হয়ত একদিন প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে, আর সেদিন বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রচারিত মতগুলি ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

রূপহীনা।

[আল্‌ফন্‌সো দদের ফরাসী গল্প হইতে]

শনিবারের সন্ধ্যা। দিন ফুরাইয়াছে, সে সপ্তাহও শেষ হইয়াছে। মনে হইতেছে যেন ইহার মধ্যেই রবিবার আসিয়া পড়িয়াছে। আজ মাহিনা পা'বার দিন। সহরতলীর চারিদিকে চীৎকার, কোলাহল ও মদের দোকানের কপাট খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ। ছোট ছোট গলিগুলি মজুরের দলে ভরিয়া গিয়াছে। এই ভিড় ক্রমে চওড়া বড় রাস্তাতে আসিয়া পড়িতেছে। তাহাদের বিপরীত দিকে একটি ছোট ছায়ার ন্যায় ক্ষীণকায়া রমণীমূর্ত্তি লুকাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার দেহ একখানি শালে ঢাকা। অনেক দিনের ব্যবহারে তাহা পাতলা ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার মাথায় যে টুপী ছিল, তাহা তাহার মাথার চেয়ে অনেক বড়। সে যেন লজ্জা ও দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি। তাহার কি উৎকণ্ঠা!

সে কোথায় চলিয়াছে? তাহার উদ্দেশ্য কি? তাহার দ্রুত পদবিক্ষেপ ও স্থির দৃষ্টিতে বোধ হইতেছে যেন সে দ্বিগুণতরবেগে ধাবিত হইতেছে। তাহার গতি ও দৃষ্টি যেন তাহার মনের এই কথাগুলি প্রকাশ করিতেছে— "কেবল যদি ঠিক সময়টিতে পৌঁছিতে পারি।" সে যখন অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহার চারিদিকে মজুরের দল তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। এই মজুরেরা সকলেই তাহাকে চিনে। সে কুৎসিতা বলিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া একটী নূতন নাম দিয়াছে। বলিতে লাগিল, "দেখ্, দেখ্, বাঁদরী— ভ্যালেন্তিনের বাঁদরী—ঐ তার স্বামীকে আন্‌তে যাচ্ছে।" তাহারা এইরূপে তাহাকে আরও তাড়া দিতে লাগিল। সে তাহার গতি আরও বর্দ্ধিত করিল।

"ইস্, ইস্! হয়ত সে সেখানেই আছে! কি হয়ত নাই।" কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল।

কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে চলিল। রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিল। যে রাস্তা ধরিয়া সে সহরের ফটকে পৌঁছিবে, তাহা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে উঠিতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল।

অবশেষে সে তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল। সহরতলী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা

উচ্চ স্থলে, বাহিরের রাস্তাগুলি যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেইখানে—একটি বড় কারখানা। কিন্তু তাহারা এই মাত্র ফটক বন্ধ করিতেছে। কল থামিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর বাষ্পনির্গমের শব্দের ন্যায় ইঞ্জিন হইতে হুস্ হুস্ করিয়া বাষ্প বাহির হইয়া যাইতেছে। উঁচু চিমনিগুলি হইতে এখনও একটু একটু ধোঁয়া উড়িতেছে। খাটুনি থামিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনী-শক্তি জনহীন কারখানাটির চারিদিকের উত্তাপে সূচিত হইতেছে। সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল একতালার গরাদে ঘেরা একটি ছোট জানালার ভিতর দিয়া একটি ক্ষীণ আলোক তখনও দেখা যাইতেছিল। কেশিয়ারের সেই দীপটি যেমন ঐ রমণী তথায় উপনীত হইল, অমনি নিভিয়া গেল। তাহার দেরী হইয়া গিয়াছে!

সকল মজুরেরা মাহিনা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে এখন কি করিবে? কোথায় তাহার স্বামীকে পাইবে? তাহার এক সপ্তাহের সংসার-খরচ এইবেলা না লইলে ত' সমস্তই মদের দোকানে যাইবে।

বাড়ীতে টাকার এত দরকার! ছেলেদের মোজা নাই। রুটিওয়ালার পাওনা.................. ।

সে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার নড়িবার আর ক্ষমতা ছিল না। শূন্যদৃষ্টিতে রজনীর অন্ধকার-পানে চাহিয়া রহিল।

সহরতলীর মদের দোকানগুলি আলোকময়; সেখানে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কারখানাগুলি সব নীরব। কিন্তু কারখানার জীবন এখন এই মদের দোকানে স্পন্দিত হইতেছে। এই গহ্বর-সদৃশ সুরার দোকানগুলি মজুরে ভরা। জানালার কাচগুলি দাগ ধরিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরে রঙ্গিন বোতলে বিবিধ মদ। সবুজ, লাল বা সোণালি রং! পথ হইতে চীৎকার, গান, মদের গেলাসের টুং টাং শব্দ, জুয়াখেলায় কলঙ্কিত কর হইতে নিক্ষিপ্ত মুদ্রারাশির ঝনৎকার শোনা যাইতেছে। টেবিলের উপর পরিশ্রান্ত কর ভর দিয়াছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে হাতগুলি অসাড়। এই ঘরগুলির অস্বাস্থ্যকর উত্তাপের মাঝে বসিয়া হতভাগ্যেরা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের ঘরে এই শীতে আগুন জ্বলে নাই; তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা শীতে কাঁপিতেছে।

এই সকল মদের দোকানের নীচু জানালাগুলির ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। অপরাপর বাড়ীর জানালা অন্ধকার। পথ জনহীন।

এই জানালাগুলির সামনে একটি ছোট ছায়ামূর্ত্তি ভয়ে ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আহা কুৎসিতা! খোঁজ, খোঁজ। এক মদের দোকান হইতে সে অপর দোকানে যাইতেছে। তাহার শাল দিয়া কাচের জানালার এক কোণ মুছিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছে, আবার চলিতেছে। শান্তিহীন নিদারুণ উদ্বেগ!

হঠাৎ সে কাঁপিয়া উঠিল।

ঐ যে তাহার স্বামী ভ্যালেন্তিন। বিশালকায় একটি সাদা কোর্ত্তা পরা। কোঁকড়ান চুল ও বলিষ্ঠ দেহের গর্ব্বে উদ্ধত। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তাহার কথা শুনিতেছে। সে এমন সুন্দর কথা কয় আর তার পর আবার সকলের পাওনা সে নিজে মিটাইয়া দেয়!

অভাগিনী কুৎসিতা "বাঁদরী" বাহিরে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছিল। সে জানালার উপর মুখ চাপিয়া দেখিতে লাগিল। উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে কাঁচের ভিতর দিয়া সে তাহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সম্মুখে টেবিল ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মদের বোতল ও গেলাসের ভারে টেবিল যেন অবনত। তাহার চারিদিকে সুরাপান-রক্তিম বদনগুলি।

কাচে প্রতিফলিত হইয়া রমণী যেন তাহাদের মাঝে বসিয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। এই পান-রত দুরাচারগণের মাঝে তাহার মূর্ত্তি—যেন তিরস্কারের, যেন অনুতাপের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু ভ্যালেন্তিন তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে তখন মদের দোকানের অফুরন্ত তর্কে মাতোয়ারা। প্রতি গেলাসে সে তর্কের আরম্ভ। মিশ্রিত সুরার ন্যায় সে তর্ক মানবের হিতাহিত-জ্ঞানের সাঙ্ঘাতিক শত্রু। ভ্যালেন্তিন দেখিতে পাইল না যে, জানালার বাহির হইতে ছোট ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি তাহাকে ডাকিতেছে; দেখিতে পাইল না যে, বিষাদময় দুটি আঁখি তাহার আঁখির সহিত মিলিত হইবার জন্য ঔৎসুক্য ও অপেক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

রমণী ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না। সঙ্গীদিগের সহিত তাহার স্বামী বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে সে প্রবেশ করিলে তাহার স্বামীর অবমাননা করা হইবে।

আহা, সে যদি সুন্দরী হইত! কি কুৎসিতা সে! যখন তাহার স্বামীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে আজ দশ বৎসরের কথা। তখন সে কত সুন্দরী ছিল। রোজ সকালবেলা, ভ্যালেন্তিন যখন কাজ করিতে যাইত, তখন সেও তাহার নিজ কাজে যাইত। ভ্যালেন্তিন তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইত। সে গরীব তবু তাহার অবস্থামত পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইবার চেষ্টা করিত। প্যারীনগরীর দ্বারের ছায়ায় যে ফুল ও ফিতা বিক্রয় হয়, তাহাতেই সজ্জিতা হইত। প্যারীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যকলায় সে অনভিজ্ঞা ছিল না। প্রথম দর্শনেই উভয়ের প্রেমের সঞ্চার। কিন্তু উভয়েই অর্থহীন। বিবাহের জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। শেষে যুবকের মাতা একটি শয্যা দিল, যুবতীর মাতাও আর একটি শয্যা দিল। যুবতী সকলের প্রিয় ছিল। সে যে দোকানে কাজ করিত, সেখানে তাহার জন্য চাঁদা উঠিল। বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ হইয়া গেল।

একজন বন্ধু বিবাহ-পরিচ্ছদ ধার দিলেন। 'ক'নের ঘোমটাটিও ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল। এইরূপ সকল যোগাড় হইলে একদিন প্রভাতকালে উভয়ে পদব্রজে বিবাহ করিতে বাহির হইল। গির্জ্জায় গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। গরীবের বিবাহ! আগে সৎকার-অনুষ্ঠানগুলিও হইয়া গেল। তাহার পর তাদের বিবাহ। সরকারী আফিসে আগে ধনীদের বিবাহ খাতায় লিপিবদ্ধ হইল। তাহার পর তাহাদের বিবাহও লিপিবদ্ধ হইয়া গেল।

নববিবাহিত দম্পতী সহরতলীর এক বাড়ীর উপরতলার এক কক্ষে বিবাহিত জীবনযাপন করিতে গেল। টালির ছাদ, ছোট অপরিষ্কার ঘরখানি। লম্বা একসার ঘরের শেষ ঘর। অপর ঘরগুলিতে গোলমাল, কলহের কলরব। সংসার আরম্ভ হইল। প্রথম হইতেই বিরক্তির সূত্রপাত। তাহাদের সুখ বড় অধিকদিন স্থায়ী হইল না। মাতালের সহিত বাস করিতে করিতে ভ্যালেন্তিন মদ্যপান করিতে শিখিল। হতভাগিনী অন্য নারীগণকে কাঁদিতে দেখিয়া সাহস হারাইল, তাহার স্বামী যখন মদের দোকানে, সে তখন প্রতিবেশিনীদের সহিত সময় কাটাইতে লাগিল। তাহার অন্যমনস্ক, হীনভাব। কোলে একটি ছোট ছেলে। বিরক্তির সহিত তাহাকে দোল

দিতে দিতে সে প্রতিবেশিনীদের গল্পে যোগদান করিত। তাহার রূপ গেল। দোকানে দোকানে সে কুৎসিতা বলিয়া পরিচিতা হইল। তাহার নাম হইল "বাঁদরী।"

এখনও ছোট মূর্ত্তিটি সেখানে রহিয়াছে। জানালার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ছোট গলির আবর্জ্জনারাশির উপর তাহার মৃদু পদশব্দ ধ্বনিত হইতেছে। বারি বর্ষণ হইতেছে, শীতের হাওয়া কাঁপাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাশি আসিতেছে। কতক্ষণ আরও কতকক্ষণ সে অপেক্ষা করিবে? দুই তিনবার সে কবাটের উপর হাত দিল, কিন্তু খুলিতে সাহস করিল না। শেষে তাহার মনে পড়িল, তাহার সন্তানেরা অনাহারে। এই চিন্তা তাহাকে সাহস দিল। সে ঘরে প্রবেশ করিল।

কিন্তু সে চৌকাটও পার হয় নাই, এমন সময় এক বিকট হাসির শব্দে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। "ভ্যালেন্তিন! দেখ্, দেখ্, বাঁদরী এসেছে।"

সত্যই সে রূপহীনা। তাহার অলকগুচ্ছ হইতে বারিবিন্দু ঝরিতেছে। দীর্ঘকাল উপেক্ষায় তাহার বদন পাণ্ডুর, গণ্ডদ্বয় পাংশুবর্ণ। সত্যই সে কুরূপা!

"ভ্যালেন্তিন্! দেখ, দেখ। বাঁদরী এসেছে।" কাঁপিতে কাঁপিতে লজ্জায় হতভাগিনী নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্যালেন্তিন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া লাফাইয়া উঠিল। "কি? এত বড় তাহার আস্পর্দ্ধা? আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে? আবার বন্ধুদের সামনে আমার মাথা হেঁট করাইতে আসিয়াছে? আচ্ছা! দাঁড়া, দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!" দেখিতে ভয় হয়, ভ্যালেন্তিন ঘুসি তুলিয়া সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। হতভাগিনী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মজুরেরা ব্যঙ্গ ও উপহাসের উচ্চ ধ্বনি তুলিয়া টিট্‌কারি দিতে লাগিল। ভ্যালেন্তিন তাহার পিছনে ছুটিল, দুই পা গিয়াই রাস্তার মোড়ে তাহাকে ধরিল।

চতুর্দ্দিক অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই। হায়, হতভাগিনী!

না—না। সঙ্গীদের সঙ্গ ছাড়িয়া প্যারীনগরীর মজুর দুর্বৃত্তের ভাব প্রকাশ করিল না। একবার তাহার সামনাসামনি দাঁড়াইতেই তাহার বল বিলুপ্ত হইল। সে কি দুর্ব্বল! রমণীর নিকট সে বশীভূত, অনুতপ্ত। এইবার

দুজনে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিল। রমণীকণ্ঠ নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি কোমল, বিষাদময়, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অস্পষ্ট। "বাঁদরী" বীরকে জয় করিয়াছে। বীর এখন রমণীর চেয়েও দুর্ব্বল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সাব্‌লিমিটি।

—:*:—

সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে রস আটটী—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। কেহ কেহ আবার শান্তরসকে ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রস নয়প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে একটীও ইংরাজী 'সাব্লাইম্' (Sublime) রসের প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। অথচ, আজকালকার ইঙ্গ-বঙ্গ সাহিত্যে বহু কাব্যনাটকাদি 'সাব্লাইম্' ভাবাশ্রিত বলিয়া সমালোচিত হইতেছে। আমরা একণে, ইংরাজী আলঙ্কারিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই নূতন রসের স্বরূপ-নির্ণয়ে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, 'সাব্লাইম্' অর্থে কি বুঝায়। আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজী সাহিত্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিশেষত্ব ধরিয়া শ্রেণীবিভাগ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অত কড়া-ক্রান্তি বা পল-অনুপলের হিসাব নাই। সেইরূপ, অলঙ্কারশাস্ত্রেও অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ব্বক কাব্যের সৌন্দর্য্যকে বিভাগ করা হয় নাই। ইংরাজীতে, প্রধানতঃ, কাব্যের দুইটী বিশেষত্ব ধরা হইয়াছে—১ম সৌন্দর্য্য (beauty) ও ২য় সাব্লাইমত্ব (Sublimity) এই সৌন্দর্য্য ও সাব্লাইমত্বের প্রভেদ বুঝিলেই সাব্লাইমের প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

যদি কোনও পদার্থ-স্মরণে আমাদিগের চিত্তে এক অপূর্ব্ব প্রসাদ-ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সেই পদার্থকে সুন্দর ও তাহারই গুণকে সৌন্দর্য্য (beauty) বুঝিতে হইবে। এই প্রসাদ ভাবের স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত।

ক্ষুধার সময় উদর পূরিয়া খাইলে হৃদয়ে যে আনন্দময় অনুভূতি হয়, তাহাই প্রসাদ ভাব। এই প্রসাদ ভাবই ন্যূনাধিকপরিমাণে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের সহিত যেন একসূত্রে গ্রথিত। উদরপূর্ত্তিতে যে সুখ, একটী সুন্দর গোলাপ-দর্শনেও যে সেই সুখ, তাহা-ঔদরিক ভিন্ন সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এখন, এই সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত যদি ভয় ও বিস্ময় এককালে হৃদয়কে অভিভূত করে, তাহা হইলেই 'সাব্লাইম্' হইল। প্রকৃত সাব্লাইম্ হইলে অনেক স্থলে শ্রদ্ধার ভাবও আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রধানতঃ সৌন্দর্য্য, ভীতি ও বিস্ময় এই তিনটী সাব্লাইমত্বের উপাদান। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। কলনাদিনী ক্ষুদ্রা গিরিনদী পর্ব্বতের সানুদেশ বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। দূর হইতে যেন একছড়া রূপার হারের ন্যায় বোধ হইতেছে। এস্থলে, ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণীর ক্ষিপ্রগতি, শুভ্র প্রবাহ, ও চতুঃপার্শ্বিক মনোরম দৃশ্যাবলী একযোগে মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়া এক অপরূপ স্নিগ্ধ ভাবের উদ্রেক করে। ইহাই সৌন্দর্য্য। পক্ষান্তরে, এই নদীরই জলপ্রপাত কল্পনা করুন। ফেনিল জলরাশি উদ্দাম বেগে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিহত হইয়া বজ্রগর্জ্জনে নিম্নভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও চূর্ণীকৃত তরঙ্গরাজি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নীলধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে, এদৃশ্য বিরাট্ ও মনোরম। সেই গভীর নিনাদ ও উন্মত্ত প্রলম্ফনে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় ও সহজ শীতল নদীস্রোতের এই তাণ্ডব নৃত্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইহাই 'সাব্লাইম্'। এস্থলে ভয় ও বিস্ময়ের সহিত যেন শ্রদ্ধারও আবির্ভাব হয়, প্রকৃতিপালিত সরল অরণ্যাচারী এই জলপ্রপাতকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে।

সৌন্দর্য্যদর্শনে হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা সুনির্ম্মল উৎস-স্বরূপ, স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে তর্ তর্ বেগে বহিতে থাকে। "সুড়সুড়ী" দিলে যেরূপ সুখকর চাঞ্চল্য হয়—ইহাও কতকটা সেইরূপ। পক্ষান্তরে, সাব্লাইম্ পদার্থ-দর্শনে যে চাঞ্চল্য তাহা বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করে ও মনোবেগকে বহু উচ্চস্তরে লইয়া যায়। সেরূপ চাঞ্চল্য আমরা 'ডন্ বৈঠকী' করিলে অনুভব করি।

প্রকৃতির রাজ্যে অনেক সাব্লাইম্ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। যে যে কারণে সেগুলি সাব্লাইম্-পদবাচ্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে,—

(১) অগাধ বিস্তৃতিই সাব্লাইমত্বের প্রথম কারণ। সুদূর-প্রসারী প্রান্তর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, বিস্তৃতি সাব্লাইমের গৌণ কারণ মাত্র। ইহা অপেক্ষা—

(২) উচ্চতা অধিকতর সাব্লাইম্ ভাবের সঞ্চার করে। মুক্তবক্ষ প্রান্তর অপেক্ষা গগনস্পর্শী গিরিতুঙ্গ বেশী সাব্লাইম্। আমার মনে হয়, আকাশের সাব্লাইমত্ব বিস্তারে নয়—উচ্চতায়। তবে, বিস্তার-বিহীন উচ্চতায় কিছুমাত্র সাব্লাইম নাই। নচেৎ, মনুমেণ্ট কিংবা টেলিগ্রাফ্ পোষ্টও সাব্লাইম হইত!

(৩) অস্পষ্টতা। গূঢ়, অস্পষ্ট বিষয়গুলি চিরকালই মানবে-চিত্তে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। সুপ্রকাশ অপেক্ষা অপ্রকাশের ভীতিপূর্ণ বর্ণনা হৃদয়কে অধিকতর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। এইজন্যই মিণ্টনের chaos-বর্ণন এত সাব্লাইম, বলিয়া প্রখ্যাত। এই কারণেই রাত্রি, দিন অপেক্ষা অধিকতর সাব্লাইম। দিবসের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সৌন্দর্য্যপূর্ণ, কিন্তু রাত্রির ছায়াময়ী অস্ফুট বিভা ও হীরকখচিত কৃষ্ণ নভোমণ্ডল সাব্লাইম ভাবাপন্ন।

(৪) অসমতা। সমতা শৃঙ্খলা—সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান। কতকগুলা পাথর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলে, অতি কুৎসিৎ দেখায়। কিন্তু ঐগুলিই যদি শৃঙ্খলার সহিত সুদৃঢ়ভাবে সজ্জিত হয়, তাহা হইলে সুন্দর অট্টালিকার সৃষ্টি হইবে। সাব্লাইমত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পদার্থের বিক্ষিপ্ত ভাব মনোমধ্যে ধারণার সুখকর বিশৃঙ্খলা ও উদ্বেলন সৃষ্টি করে, সুতরাং সাব্লাইম্ ভাবের বিশেষ অনুকূল হয়। পর্ব্বতের গাত্র বন্ধুর না হইয়া যদি সমতল হইত, তাহা হইলে উহা এত সাব্লাইম হইত না। সমুদ্র যে এত সাব্লাইম্ তাহার গৌণ কারণ তাহার আনভোবিস্তারী পরিসর বটে, কিন্তু মুখ্য কারণ হইতেছে, তাহার উৎক্ষিপ্ত বীচিমালার নিরন্তর উত্থান ও পতন। এই অবিরাম শ্রান্তি-রহিত তরঙ্গসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত-সম্ভূত কল-কল্লোল, এবং ইহার বিশালতা হৃদয়ে যে গম্ভীর ভাবের সঞ্চার করে, তাহা 'সাব্লাইম'। সমুদ্র এবং আকাশ দেখিয়াই তো আমরা সৃষ্টির বিরাটত্ব ও বিশালত্ব বুঝিতে পারি এবং এই ভাবের উপলব্ধি যখনই মনোমধ্যে উদিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, 'সাব্লিমিটি'র সঞ্চার হইয়াছে।

(৫) শব্দ এবং গতি অনেক সময়ে সাব্লাইমত্বের সৃষ্টি করে। জলপ্রপাতের সাব্লাইমত্বের অন্যতম কারণ উহার গর্জ্জন। সমুদ্র না দেখিয়া উহার মৃদুমন্দ নিনাদ-শ্রবণেও সাব্লাইম ভাব আসে। গতি সৌন্দর্য্যেরও পরিপুষ্টি সাধন করে। নিশ্চল তড়াগ অপেক্ষা গতিশীল নির্ঝরিণী অধিকতর মনোহর। স্থির শশাঙ্ক অপেক্ষা চঞ্চল বিজলী অধিক সুন্দর। এই গতি যখন প্রবল বেগ ধারণ করে, তখন সাব্লাইম ভাবের উদ্ভব হয়।

(৬) আর এক প্রকার সাব্লাইমত্ব আছে তাহা বাহ্যজগতের অন্তর্গত নহে। সেটী চরিত্রগত সাব্লাইমত্ব। উচ্চ পুরুষকার কিংবা অসামান্য আত্ম-ত্যাগ দেখিলে হৃদয় উচ্চতর সাব্লাইম রসে পরিপ্লুত হয়। এই 'রামায়ণ' মহাভারতের দেশে বোধ করি, ইহা আর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে না।

প্রকৃতিতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য কাব্যের সৃষ্টি। সুতরাং, বহু কবি এই প্রাকৃতিক সাব্লাইমত্বকে ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইবার, এই সাহিত্যিক সাব্লাইমত্বের আলোচনা অসঙ্গত হইবে না

প্রকৃতির সাব্লাইমত্বকে ভাষার ছাঁচে ফেলিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, সাব্লাইমত্ব ভাষাগত নহে,—ভাবগত। কোনও সাব্লাইম্‌ বিষয়ের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমরা ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখি না, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি চিত্তনিবেশ করি। যাহাতে ভাষার দোষে সাব্লাইম্‌ ভাবটী নষ্ট না হইয়া যায়, তাহাই কবির প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত। ভাষা অনাবশ্যক ভাবে অলঙ্কৃত করিলে, ভাষার দিকেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং কবি ব্যর্থ প্রয়াস হ'ন। সাব্লাইম্‌-রসাত্মক বর্ণনাগুলি যথাসম্ভব সরল হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, সাব্লাইম ভাবটী অতি উচ্চস্তরের বলিয়া, আমাদিগের চিত্ত বহুক্ষণ অত উর্দ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না,—সুতরাং ভাষার অল্প ব্যতিক্রম হইলেই পূর্ব্বস্তরে আসিয়া পড়ে। সাব্লাইম্‌ ভাব যথাসম্ভব অল্প বাগাড়ম্বরের সহিত প্রকাশ করা উচিত।

বাইবেলের Genesis অধ্যায়ে—"God said, let there be light; And there was light," এই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে যেরূপ সাব্লিমিটী বর্ত্তমান, সেরূপ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উহাই যদি ভগবানের সর্ব্বক্ষমত্ব প্রকাশ

করিবার জন্ম নানাবিধ বিশেষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইত, তাহা হইলে কিছুমাত্র সাব্লিমিটী থাকিত না। এইরূপ সর্ব্বত্র।

সুতরাং দেখা গেল যে, সাব্লাইম্ রচনায় পদবিন্যাস বিশেষ দুরূহ। সাব্লাইম রচনা সতেজ, সরল ও অনতিদীর্ঘ হওয়া উচিত। এইরূপ না হইলে রচনা হাস্যকর হইয়া পড়িবে।

সাব্লাইমের বিষয়-নির্ব্বাচনও দুরূহ। বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যতীত কাহারও সাব্লাইম্ রচনায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রমেও রচনা হাস্যকর হইয়া পড়ে।

ইংরাজী আলঙ্কারিকের মতে ইহাই সাব্লাইম্ রসসংক্রান্ত মোটামুটী জানিবার বিষয়।

শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।

বরষায়।

১

জানালা খুলিয়া দাও! আসুক্ ভিতরে
বাদ্‌লার মিটে ছাট্ ঝুরু ঝুরু ক'রে।
ও তোর বিউনি দুটি
হাওয়াতে লুটোপুটি ;—
আজ্‌কে মনের ছুটি! প্রেমের পিয়ালা
ভাতল অধরে মোর, তুলে ধর্ বালা!

২

ছাইমাখা মেঘ থেকে বাজ্ খ'সে পড়ে,
নড়্‌নোড়ে বাঁশ্‌গুলো দুড়্‌দুড়ে ঝড়ে
ও পারের বন-রেখা।
যেন মসী-ঘন-লেখা—
দূর মাঠে ডাঙ্গাচোরা কুড়ে টল্‌মল্—
ধান্-ক্ষেতে কাদা-ঘোলা হাটু-ভোর জল।

৩

আড়ি ক'রে সাড়ীখানি টেনে তাড়াতাড়ি—
বিরাট ঘোম্‌টা এযে, ভারী বাড়াবাড়ি!
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
অমনি দুষ্টামি সুরু!
মানময়ি, কাছে ব'স—মিছে আজ মান,
একটী চুম্বনে সখি, মূর্চ্ছা যাবে প্রাণ!

৪

বসন্তে যাহার খুসি বাঁধুক্ কুটীর,—
আমি গিয়ে সেখানেতে বাড়াব না ভিড়!
ঘোমটাটি তুলে ধর,
রবীন্দ্রের কাব্য পড়—!
এই বর্ষা, এই কাব্য,—ওই কালো চোখ,
মোর থাক্; দুনিয়াটা যা'র হয় হোক্!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

—:০:—

যোগেন্দ্র-স্মরণে। *

—:০:—

খাম্বাজ মিশ্র—যৎ।

হে সখে! মরণ-শোকে
এ কি মধুর মিলন!
জীবন জাগায়ে তুলে
তব স্মৃতি-জাগরণ॥
কালের অকাল রুদ্র আহ্বান,
ক'রে দে'হে স্তব্ধ জীবনের গান,

* বিগত ২রা ভাদ্র সোমবার কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নবম বার্ষিক স্মৃতি-সভায় গীত।

কালই বিধাতা কালের বিধান,
কে পারে রোধিতে করিতে খণ্ডন।
গেছ বটে চ'লে কোন্ দূর লোকে,
রেখে গেছ কীর্ত্তি স্মৃতি শান্তি শোকে,
পূর্ণ প্রতিভার চিন্ময় আলোকে,
মৃণ্ময়ী প্রতিমা মাত্র বিসর্জ্জন—
রসে বা গম্ভীরে নিত্য রচনায়,
সম-কীর্ত্তিমান কেবা তুলনায়,
চির আয়ুষ্মান সাহিত্যে ভাষায়,
কে বলে তোমার হ'য়েছে মরণ॥

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

পুস্তক-পরিচয়।

ঢাকার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬ নং সাগর ধরের লেন হইতে শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩॥০ টাকা মাত্র।

প্রথমেই "দরশন ডালি"—এ হিসাবে বলিতে পারি "ঢাকার ইতিহাসে"র ছাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাইও সুন্দর এবং ইহা প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত পুস্তকে পাঁচখানি মানচিত্র এবং ৪০ খানা হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

সমালোচ্য 'ঢাকার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডই একখানি বৃহৎ পুস্তক; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ হইলে যে অতীব প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ঢাকা-সম্বন্ধে ছোট বা বড় কোন প্রকার ইতিহাসই ছিল না। এরূপ অবস্থায় যতীন্দ্রবাবুর এই পুস্তক পাইয়া আমরা যে কতদূর আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এই বৃহৎ পুস্তকখানি রচনা করিতে গ্রন্থকারকে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন বাঙ্গালা মাসিক

পত্র-পত্রিকাদিতে ইতিপূর্ব্বে ঢাকা-সম্বন্ধে যে কোন প্রকার প্রবন্ধাদি বাহির হয় নাই, এমন নহে; এবং সে সকল প্রবন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং সঙ্কলন-কৌশলের অভাবও ছিল না। কিন্তু সে সকল ত বিক্ষিপ্ত রচনা; তাহাতে ঢাকা-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অপূর্ণ। যতীন্দ্রনাথ যে সে সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধরাজির সহায়তা অল্প বিস্তর গ্রহণ করেন নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার কৃতিত্ব,—তিনি ঢাকার একখানি শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস রচনা করিয়া সেই খণ্ড-জ্ঞানকে পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্কলন-নৈপুণ্য অসাধারণ এবং তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার শক্তিও যথেষ্ট। যিনি ঐতিহাসিক তাঁহাকে সংগ্রহ-সঙ্কলনের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। এই সঙ্কলন-ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথ ঢাকা-বিষয়ক তাবৎ গ্রন্থ হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ঢাকা-সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ যতীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে কতকগুলি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট নহে। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের রচনাগুলিই তাঁহাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তদ্ব্যতীত যতীন্দ্রবাবু মৌলিক অনুসন্ধান এবং গবেষণাও স্থানে স্থানে বড় অল্প করেন নাই। এ পক্ষে তাঁহাকে ঢাকা জেলার প্রচলিত বহু কিম্বদন্তী ও প্রবাদ-বাক্য-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সত্যাবিষ্কার করিতে হইয়াছে। অনেক ঐতিহাসিকই কিম্বদন্তী ও প্রবাদ-বাক্যকে উড়াইয়া দেন; যতীন্দ্রনাথ কিন্তু সেইগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন,—"শুধু কিম্বদন্তী ও প্রচলনের উপরে ইতিহাসের ভিত্তি গ্রথিত করিতে যাওয়া নিতান্ত উপহসনীয় হইলেও উহা একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না।" তার পর নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি সযত্নে তাহাদের 'পাঠ' হইতেও ঐতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

২৪টি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিভক্ত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত পরিশিষ্ট আছে। প্রথম অধ্যায়ে—উপক্রমণিকা; ইহাতে ঢাকা জেলার সীমা, আয়তন, অবস্থান, প্রাকৃতিক বিভাগ, প্রাকৃতিক বিবরণ, প্রভৃতি; দ্বিতীয় অধ্যায়ে উৎস ও নদনদী; তৃতীয় অধ্যায়ে নদ নদীর গতিপরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও তাহার কারণ-নির্দ্দেশ; চতুর্থ অধ্যায়ে খাল; পঞ্চম অধ্যায়ে

বিল ও ঝিল; ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ নদ; সপ্তম অধ্যায়ে বন; অষ্টম অধ্যায়ে পরগণা ও তপ্পা, থানা, গ্রাম, মহকুমা প্রভৃতি; নবম অধ্যায়ে কৃষি; দশম অধ্যায়ে ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, ফলবৃক্ষাদি; একাদশ অধ্যায় মৎস্য, জন্তু, পক্ষী প্রভৃতি; দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিল্প; চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য; পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাণিজ্য বন্দর ও ওজন; ষোড়শ অধ্যায়ে মেলা; সপ্তদশ অধ্যায়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু; অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিপ্লব; উনবিংশ অধ্যায়ে—মিউসিপ্যালিটী, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, জেলা বোর্ড, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি; বিংশ অধ্যায়ে জমি ও জমা; একবিংশ অধ্যায়ে তীর্থস্থান; দ্বাবিংশ অধ্যায়ে প্রাচীন কীর্ত্তি; ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান প্রভৃতি এবং চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এদেশে অধুনা ইতিহাস-চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুর্শিদাবাদ, বিক্রমপুর, নদীয়া ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। ঢাকা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু ঢাকার ইতিহাস এতদিন রচিত হয় নাই। এই ইতিহাস-আলোচনার যুগে যতীন্দ্রবাবু আমাদের সে অভাব দূর করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গী যেমন প্রশংসনীয়; সঙ্কলন-পদ্ধতিও তেমনই উচ্চাঙ্গের। বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথ যেরূপ অধ্যবসায় পরিশ্রম, গবেষণার সাহায্যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইতিহাস পাঠক-সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।